আল-কুর'আনে সামাজিক আইন : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

(THE SOCIAL LAWS IN AL-QURAN : AN ANALYTICAL STUDY)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. শেখ মোঃ ইউসুফ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোঃ রাশেদুল হাসান
রেজিঃ নং ৪৯/২০১৫-২০১৬ (পুনঃ)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর-২০১৯

উৎসর্গ

নানা প্রতিকূলতাও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যাদের অফুরন্ত উৎসাহ আর নিঃস্বার্থ দোয়ার বরকতে এ পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন মুর্শিদ কেবলা, আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি।

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছি যে, 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইন : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' (THE SOCIAL LAWS IN AL-QURAN: AN ANALYTICAL STUDY) শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ ইউসুফ স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ, ঢাকা

৬ অক্টোবর ২০১৯

মোঃ রাশেদুল হাসান
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং ৪৯/২০১৫-২০১৬ (পুনঃ)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০,৬৩০৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২
ওয়েব: http://www.univdhaka.edu

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Phone:9661920-73/6290,6306
Fax: 880-2-9667222
Web: http://www.univdhaka.edu

সূত্র: তারিখ: ৬ অক্টোবর ২০১৯

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোঃ রাশেদুল হাসান কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইন : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' (THE SOCIAL LAWS IN AL-QURAN : AN ANALYTICAL STUDY) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণা কর্ম, কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমাদের জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমরা এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ড. শেখ মোঃ ইউসুফ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্ব প্রথম আমি বিশ্বচরাচর ও জগৎসমূহের একমাত্র মালিক, স্রষ্টা, নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শাহান শাহী দরবারে অকুণ্ঠচিত্তে বিনয়াবনত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যার অসীম দয়া করুণা ও মেহেরবানিতে নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইন: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আজ আমি সম্পন্ন করতে পেরেছি। অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, মানবতার মুক্তির একমাত্র দিশারী, মহান শিক্ষক রাসূলে করিম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) ও তাঁর সম্মানিত পবিত্র আহলে বায়াতদের প্রতি, সাহাবীগণের প্রতি, যার আদর্শ, সুমহান চরিত্র ও ব্যবহারিক শিক্ষা আমাদের সকলের ইহকাল ও পরকালের একমাত্র পাথেয়।

এ গবেষণা কর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি এবং যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ ইউসুফ স্যারের প্রতি, যারা অত্র গবেষণা কর্মের শুরু থেকে করে শেষ পর্যন্ত নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা, এ অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তারা অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অত্র অভিসন্দর্ভটির গঠন কাঠামো ও সৌষ্ঠব- সৌকর্য ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ বর্তমান প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত হতে নিরলস সহায়তা করেছেন। তাদের নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিসন্দর্ভটি মান সম্পন্ন হয়েছে। আমি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এ মুহূর্তে আমার মাথার তাজ, পরম শ্রদ্ধেয় দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির দিশারী হযরত শাহ্ সূফী কমর উদ্দিন আহমেদ (র.) প্রাক্তন পোস্ট মাস্টার জেনারেল, ঢাকা বিভাগ, জি.পি.ও বাংলাদেশকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। যিনি একজন সুমহান পথ প্রদর্শক হিসেবে আমার জীবনের চলার পথে অবিরত দিক-নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। আমি আরো গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় মাতা খায়রুন নেছা ও পিতা এ. কে.এম. আবুল হাশেম মিঞা এবং আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক ক্যাপ্টেন আবুল বাসার পাটোয়ারীকে। তাদের দোয়া, অনুপ্রেরণা, বুদ্ধি, পরামর্শ, সাহায্য -সহযোগিতা আমার জীবন চলার প্রতিমহূর্তে, প্রতিটি বাঁকে অফুরন্ত শক্তি যুগিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই অনাবিল স্নেহ, নিঃসীম

মায়া-মমতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলশ্রুতিতেই আজ আমি এতদূর পথ অতিক্রম করতে পেরেছি। তাদের অনুপম আদর ও স্নেহপূর্ণ অভিভাবকত্বের সুশীতল ছায়া আজও আমাকে গভীর মমতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট আমি তাদের সর্বোচ্চ সম্মান ও নৈকট্য বৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রাজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম স্যারকে যিনি অত্র অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রভূত সাহায্য-সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। আমি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান দুই চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ ও অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিক আহমেদকে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, পপুলেশন স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর ড. মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামকে তাদের আন্তরিক শুভ কামনা, উৎসাহ ও বিভিন্নমুখী সহযোগিতা আমাকে গবেষণা চালিয়ে যেতে অবিরত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক দোয়া রইল।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব হুমায়ুন আহমেদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং জোনাল হেড, ময়মনসিংহ অঞ্চল, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব শাহ আলম খান, প্রাক্তন সি. এ. ও, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শাহজাহান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান, সি.আই.বি ডিপার্টমেন্ট আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বন্ধুবর জনাব আবুল বাশার, ডিজিএম, এ.কে.এইচ. গ্রুপ হেমায়েতপুর, সাভার,ঢাকা, ছোট ভাই আবুল খায়ের সাবু ও মোঃ রনি আহমেদ, বন্ধুবর আব্দুল কাদের রাব্বানিকে যাদের সার্বক্ষণিক আন্তরিক সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মের দীর্ঘ চলার পথের বাঁকে বাঁকে মিশে আছে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রিয় সহধর্মিনী জান্নাতুল ফেরদৌস ও আমার বড় কন্যা রাহিমা হাসানকে যাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার এবং নিবিড় সহযোগিতা আমার গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার পথে উদ্দীপনা যুগিয়েছে।

বিভাগীয় সেমিনার আয়োজনের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আমাকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও ঐকান্তিক সহযোগিতা দিয়েছেন। তারা সেমিনারে সারগর্ভ আলোচনা পেশ এবং থিসিসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা করে যেভাবে আমাকে কৃতার্থ করেছেন তা অত্র গবেষণা কর্মটি সুন্দররূপে সম্পাদন করতে অনেক উপকারে এসেছে। এসব মহান মনীষীগণের এতসব অবদানের কথা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

অফিসিয়াল জরুরি কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং পিএইচ.ডি. শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ আমাকে গবেষণা কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। জ্ঞানের বিকাশে তাদের এ অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা করছি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, ডিভিশন (এইচআরডি)। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ও সদ্ভাব আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ ও প্রীত করেছে। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন তাঁর এ অধম বান্দার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং জীবনের সবটুকু সাধ্য, মেধা ও মনন দিয়ে তাঁর দ্বীনের পথে জ্ঞান সাধনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌র খিদমত করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

মোঃ রাশেদুল হাসান

গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন (الحروف الهجائية العربية)

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
وُ	উ	◌َ	া	ض	দ/জ্ব	اَ	অ
وُو	ঊ	◌ِ	ি	ط	ত	ب	ব
وِى	বি/ভী	◌ُ	ু	ظ	য	ت	ত
ىَ	ইয়া	اَ	া	ع	‘	ث	স
ىِ	ডয়	يِ	ী	غ	গ	ج	জ
ى ىِ	ঊী	وُ	ূ	ف	ফ	ح	হ
ىُ	উ	اَ	আ	ق	ক্ব/ক	خ	খ
يُو	ইউ	أ	আ	ل	ল	د	দ
عَ	‘আ/য়া‘	اِ	ই	م	ম	ذ	য
عَا	‘আ/য়া‘	اِي	য়ি	ن	ন	ر	র
عِ	ই	اُ	উ	و	ও	ز	য
عِي	ঈ	أو	ঊ	◌ْ	হ	س	স
عُ	উ/য়ু	وَ/وَا	ওয়া	ء	’	ش	শ
عُوْ	ঊ	وِ	বি	ي	য়	ص	ছ

দ্রষ্টব্য: ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে ◌ْ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন, مؤمن = মু’মিন, কুর’আন

ع সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

جامع = জামি‘, তা‘য়ালা ইত্যাদি

উল্লেখ্য, বহুল প্রচলিত বাংলা বানানসমূহ অনেক স্থানে একইভাবে রাখা হয়েছে। যেমন: আইন, আদালত, হাকিম ইত্যাদি।

সংকেত সূচি

স.	: ছাল্লাল্লাহু আইলাহি ওয়া সাল্লাম
রা.	: রাদিআল্লাহু তা'আলা 'আনহু/'আনহা
র./রহ.	: রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
দঃ/দ.	: দরুদ
আ.	: 'আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম
আঃ	: আয়াত
হি.	: হিজরী সাল
খৃ.	: খৃষ্টপূর্ব/খ্রিষ্টাব্দ
খৃ. পূ.	: খৃষ্টপূর্ব
ড.	: ডক্টর (পিএইচ.ডি./Doctor of Philosophy)
পৃ.	: পৃষ্ঠা
সং	: সংস্করণ
অনুঃ	: অনুবাদ
অনূঃ	: অনূবাদ
ই.ফা.বা.	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রাগুক্ত	: পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
১ম	: প্রথম
২য়	: দ্বিতীয়
৩য়	: তৃতীয়
বি.	: বিশেষ
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
তা.বি.	: তারিখ বিহীন
পরি.	: পরিশিষ্ট
মৃ.	: মৃত্যু
সং	: সংস্করণ
P.	: Page
P P.	: Pages
v.	: Volume

সূচিপত্র

- ❑ উৎসর্গ ii
- ❑ ঘোষণা পত্র iii
- ❑ প্রত্যয়ন পত্র iv
- ❑ কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- ❑ প্রতিবর্ণায়ন viii
- ❑ সংকেত সূচি ix
- ❑ সূচিপত্র x

প্রথম অধ্যায় ১-১৮

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- ◊ গবেষণা প্রস্তাবনা ২
- ◊ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৪
- ◊ গবেষণার উদ্দেশ্য ৭
- ◊ গবেষণার পদ্ধতি ১০
- ◊ গবেষণার পরিধি ১০
- ◊ উপাত্ত বিশ্লেষণ ১১
- ◊ গবেষণার উৎস ১১
- ◊ গবেষণার সময় পরিধি ১২
- ◊ গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ১৩
- ◊ তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ১৩
- ◊ গবেষণা প্রকল্পের গঠন পরিকল্পনা ১৫
- ◊ উপসংহার ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯-৯৫

পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে পরিবার ২০

◊ পরিবার ও সমাজের বিকাশ ২০
◊ মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব ২৬
◊ সমাজ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের মত ও আল-কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি ৩০
◊ খিলাফতের দায়িত্ব পালনে মানব পরিবার ৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে বিবাহ ৩৫

◊ বিবাহের আইনগত সংজ্ঞা ৩৯
◊ আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবন ৪০
◊ আল-কুর'আনে দাম্পত্য জীবনের রূপরেখা ৪১
◊ বিবাহের উদ্দেশ্য ৪৭
◊ বিবাহের গুরুত্ব ৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনে একাধিক বিবাহ ৫৭

◊ যুগে যুগে বহু বিবাহ ৫৭
◊ একাধিক বিবাহ আইনের প্রেক্ষাপট ৫৮
◊ চারজন স্ত্রী একসাথে রাখার বৈধতা ৬১
◊ একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমতা বিধান ৬৪
◊ একাধিক বিবাহের স্বীকৃতির অন্তর্দর্শন ৬৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুহাররমাত ৭৬

◊ মুহাররমাতের সংজ্ঞা ৭৬
◊ আল-কুর'আনে মুহাররমাত ৭৭
◊ রক্ত সম্বন্ধীয় মুহাররমাত ৮০
◊ বৈবাহিক সম্বন্ধীয় মুহাররমাত ৮৩
◊ দুগ্ধপান সম্বন্ধীয় মুহাররমাত ৮৪
◊ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন ৯০

তৃতীয় অধ্যায় ৯৬-১৫৫

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও তালাক আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ৯৭

◊ স্বামী স্ত্রীর যৌথ অধিকারসমূহ ৯৮

◊ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ৯৯

◊ দেনমোহরের অধিকার ১০০

◊ ভরণ-পোষণের অধিকার ১১০

◊ স্ত্রীর প্রাপ্য নৈতিক অধিকারসমূহ ১১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনে তালাক আইন **১২২**

◊ তালাকের সংজ্ঞা ১২২

◊ আল-কুর'আনে বিবাহ ভঙ্গের পূর্ব শর্ত ১২৫

◊ তালাক সম্পর্কে আল-কুর'আন ১২৭

◊ তালাকের প্রকারভেদ ১২৮

◊ ইদ্দত আইনের সংক্ষিপ্ত সার ১৩৭

◊ আল-কুর'আনে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ব্যবস্থাপত্র ও পুনর্বাসন পদ্ধতি ১৪৪

চতুর্থ অধ্যায় ১৫৬-১৮৫

মিরাস আইন ও অছিয়ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : মিরাস আইন **১৫৭**

◊ ফারায়েযের সংজ্ঞা ১৫৭

◊ মিরাস আইনের গুরুত্ব ১৫৮

◊ মিরাস আইনের নীতিমালা ১৬০

◊ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারসমূহ ১৬১

◊ মিরাসের প্রাপ্যতা ১৬৪

◊ মৃতের যেসব আত্মীয় ওয়ারিশ হয় ১৬৭
◊ আল-কুর'আনে মিরাস আইনের বৈশিষ্ট্য ১৬৯
◊ আল-কুর'আনে মিরাস আইনের বিধিমালা ১৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অছিয়ত আইন ১৮০

◊ অছিয়তের সংজ্ঞা ১৮০
◊ আল-কুর'আনে অছিয়তের বিধানের ক্রমবিবর্তন ১৮২
◊ অছিয়ত ফরজ হওয়া প্রসঙ্গে আল-হাদীস ১৮৩
◊ অছিয়তের বিধান ১৮৪
◊ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অছিয়ত সম্পর্কে বিধান ১৮৫

পঞ্চম অধ্যায় ১৮৬-২১৭

দাস প্রথা ও দত্তক প্রথা সম্পর্কিত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : দাস প্রথা আইন ১৮৭

◊ দাস প্রথার পরিচিতি ১৮৭
◊ বিভিন্ন যুগে দাস প্রথা ১৮৮
◊ দাস প্রথা উচ্ছেদে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ ১৯০
◊ আল-কুর'আনে ক্রীতদাস মুক্ত করার উপায়সমূহ ১৯২
◊ আল-হাদীসে ক্রীতদাস মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ১৯৬
◊ দাস প্রথা সম্পর্কে অমুসলিম লেখকগণের সমালোচনা ও জবাব ২০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দত্তক প্রথা আইন ২০৪

◊ প্রাক-ইসলামী যুগে দত্তক প্রথা ২০৪
◊ আল-কুর'আন দত্তক প্রথার বিধান ২০৪
◊ দত্তক প্রথার রহিতকরণে আল-কুর'আনের প্রায়োগিক নির্দেশনা ২০৭

◇ দত্তক প্রথা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি অমুসলিম লেখকদের মনগড়া উক্তি ও এর জবাব ২০৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ২১৮-২৭৪

ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যভিচার সংক্রান্ত আইন ২১৯

◇ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারের শাস্তি ২১৯
◇ পাশ্চাত্য আইনে ব্যভিচারের স্বরূপ ২২৩
◇ মাক্কী সূরাসমূহে ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশাবলী ২২৩
◇ বিধি-বিধান প্রণয়নে আল-কুর'আনের অভিনব রীতি-পদ্ধতি ২৩২
◇ আল-কুর'আনে ব্যভিচারের শাস্তি ২৩৩
◇ হদ ও তাজীর এর পরিচয় ২৩৩
◇ অবিবাহিতদের ব্যভিচারের চূড়ান্ত শাস্তি ২৪২
◇ বিবাহিতদের ব্যভিচারের শাস্তি ২৪৩
◇ ব্যভিচারের আইনগত সংজ্ঞা ২৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন ২৬৯

◇ ব্যভিচারের অপবাদের দণ্ড ২৬৯
◇ অপবাদ আরোপ হারাম ২৭১
◇ অপবাদ আরোপকারীর ইহকালীন শাস্তি ২৭২
◇ অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখান ২৭২
◇ অপবাদ আইনের দর্শন ২৭৩

সপ্তম অধ্যায় ২৭৫-৩১৬

নর হত্যা ও চুরি সংক্রান্ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : নর হত্যা সংক্রান্ত আইন	২৭৬
◊ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নর হত্যা ও নর হত্যার বিধান	২৭৬
◊ আল-কুর'আনে নর হত্যা সম্পর্কিত বিধান	২৭৮
◊ নর হত্যা সম্পর্কিত আয়াত সমূহের তাৎপর্য	২৭৮
◊ ন্যায় সঙ্গত ও সুবিচারমূলক হত্যা	২৮৫
◊ নর হত্যা ও এর প্রকারভেদ	২৯০
◊ কিসাসের সংজ্ঞা	২৯২
◊ ইচ্ছাকৃত নর হত্যার শাস্তি কিসাস	২৯৪
◊ কিসাস আইনের যৌক্তিকতা	২৯৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চুরি সংক্রান্ত আইন	৩০৩
◊ চুরির সংজ্ঞা	৩০৩
◊ চুরির শাস্তি	৩০৪
◊ চুরির হদ প্রয়োগের শর্তাবলী	৩০৫
◊ বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে চুরির সংজ্ঞা	৩০৭
◊ চুরির শাস্তির আইনের দর্শন	৩০৯
◊ চুরি সম্পর্কে রবার্ট রবার্টস কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি ও এর জবাব	৩১১
উপসংহার	৩১৭-৩২৪
গ্রন্থপঞ্জি	৩২৫-৩২৯

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

◊ গবেষণা প্রস্তাবনা
◊ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
◊ গবেষণার উদ্দেশ্য
◊ গবেষণার পদ্ধতি
◊ গবেষণার পরিধি
◊ উপাত্ত বিশ্লেষণ
◊ গবেষণার উৎস
◊ গবেষণার সময় পরিধি
◊ গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা
◊ তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা
◊ গবেষণা প্রকল্পের গঠন পরিকল্পনা
◊ উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

গবেষণা প্রস্তাবনা (**Research Proposal**)

সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর পবিত্র আল-কুর'আন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। মহানবি (স.) এর নবুওয়্যাতের জীবনে দীর্ঘ তেইশ বছর (অর্থাৎ ৬১০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ধরে আল-কুর'আন নাযিল হয়। আল-কুর'আন যে ভাষায় নাযিল হয় ঠিক সেই ভাষায়ই অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং থাকবে। কারণ এর হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কুর'আন নাযিল করেছি এবং আমিই তা হিফাযতকারী'।[১]

আল-কুর'আন বিশ্ব মানবের ইহকাল ও পরকালের সামগ্রিক কল্যাণের পথ প্রদর্শক একটি সর্বজনীন, শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, বিচারিক এক কথায় জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পবিত্র আল কুর'আনে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এ প্রসঙ্গে Dr. Maurice Bucaille বলেন,

> 'The Quran may well be regarded as an academy of science for the scientists, a lexicon for etymologists, a grammar for grammarians, a book of prosody for poets and an encyclopedia of laws and legislation. Indeed, no other book anterior to the Quran could be held equal to a single chapter there of.'

'আল-কুর'আন বিজ্ঞানীদের জন্য বিজ্ঞান একাডেমী, ভাষাবিজ্ঞানীদের জন্য একটি শব্দকোষ, ব্যাকরণবিদদের একটি ব্যাকরণ বা কবিদের জন্য ছন্দশাস্ত্র এবং আইন বিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ। প্রকৃতপক্ষে, আল-কুর'আনের পূর্ববর্তী কোনও গ্রন্থ এর একক কোন অধ্যায়ের সমান হতে পারে না'। পবিত্র আল-কুর'আন হচ্ছে ইসলামী আইনের মূল উৎস। আল-কুর'আনে সামাজিক আইনসমূহ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মানুষ সামাজিক জীব। মূলত মানুষের একের প্রতি অন্যের পারস্পরিক কতগুলো দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিপালনের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য

---

১ আল-কুর'আন, আল-হিজর, ১৫ : ৯

মানুষ কতিপয় সামাজিক রীতি-নীতি, রেওয়াজ, প্রথা-অনুষ্ঠান, আদর্শ-মূল্যবোধ, আইন-কানুন ও লোকাচার তৈরি করে নেয় যা সামাজিক আইন হিসেবে বিবেচিত। আমরা জানি, কুর'আন নাযিলের অব্যবহিত পূর্বের সময়ে গোটা আরব দেশে চলছিল 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত' বা তথা অন্ধকার যুগ। সে সময় আরব ভূমিতে রাষ্ট্র কাঠামোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পারিবারিক ও সামাজিক পরিকাঠামো ছিল ঠুনকো, নড়বড়ে, ক্ষয়িষ্ণু ও অপসৃয়মান। সে সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের ছিল না কোন প্রতিষ্ঠিত রীতি। নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে ছিল অবাধ যৌনাচার ও অজাচার। একজন পুরুষ নিয়ন্ত্রণহীন অসংখ্য বিবাহ করতে পারত। তুচ্ছ কারণে নারীদের উপর পুরুষরা অমানবিক নির্যাতন করত-যা প্রায়শ বিবাহ বিচ্ছেদে রূপ নিত। বিচ্ছেদী নারীদের স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেয়া হত না। আবার চূড়ান্তভাবে তাদের তালাক দেয়াও হত না। বরং তাদেরকে ঝুলিয়ে রেখে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে বাধার সৃষ্টি করত। বিধবা নারীদের ছিল না কোন সামাজিক অধিকার। বিধবা নারীদের পুনঃ বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। কৌলিন্য প্রথা, নারীত্ব হরণ, এতিমের সম্পদ লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ছিল সেই সময়ের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিচার ব্যবস্থা ছিল একান্তই পক্ষপাতদুষ্ট। ঠিক এ সময়ে পবিত্র আল-কুর'আনের বাণী গোটা আরব সমাজে এক বৈপ্লবিক সংস্কারের সূচনা করে। জঘন্য নীতি-নৈতিকতা বিগর্হিত আচরণগুলোকে বিলুপ্ত করে তদস্থলে সাম্য, মৈত্রি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আল-কুর'আনে সামাজিক আইনসমূহের চুম্বকস্পর্শী অবদান অনস্বীকার্য।

প্রাক-ইসলামী যুগের সামাজিক প্রথাসমূহ পরিবর্তন, পরিবর্ধণ, সংযোজন, বিয়োজন, সংমিশ্রণ ও আত্মীকরণের মাধ্যমে আল কুর'আনে সামাজিক আইনসমূহ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিধিবদ্ধ হয়। স্মতর্ব্য যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি, বিবাহিত ও অবিবাহিত নর-নারী পরস্পরের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি সম্পর্কিত অপরাধের চূড়ান্ত দণ্ডবিধি আল-কুর'আনে বিধিবদ্ধ হয়েছে পর্যায়ক্রমিকভাবে। প্রথমে এ সকল অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব পারিবারিক ও সমাজিক জীবনে নিরূপণ করে মহানবি (স.) এর মাক্কী জীবনে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। শিক্ষা ও উপদেশের আদলে একাধিক আয়াতে পর্যায়ক্রমিকভাবে হত্যা এবং যিনার অপরাধ সমূহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তৎকালীন মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহবান করা হয়েছে। ফলে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনসমূহের কাঠামো সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও দার্শনিক শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত আল-কুর'আনে বর্ণিত এ সকল সামাজিক আইনসমূহ হতে উৎসারিত হয়েছে সামাজিক আচরণ (social behaviour) যা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ইবাদত তুল্য। আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুবাদী পাশ্চাত্য ভোগ-বিলাস সর্বস্ব নাস্তিকতাবাদ ও পুঁজিবাদের বিপরীতে 'আদল ও ইনসাফভিত্তিক শোষণমুক্ত ধনী-গরীব পাহাড়সম বৈষম্যের অবলোপন ও সৃষ্টিকুলের প্রতি প্রেম ভালবাসায় সিক্ত অতি সমুন্নত ইহ-জাগতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, পাশাপাশি পারলৌকিক মুক্তি।

মহানবি (স.) তাঁর গোটা জীবনে আল-কুর'আনে সামাজিক আইনসূহের বাস্তব রূপায়ন ঘটিয়ে আরব ভূমিতে এমন একদল সমাজমনষ্ক মানবমণ্ডলী রেখে গিয়েছিলেন যাদের আত্মা ছিল পার্থিব কলুষমুক্ত ও পরিশুদ্ধ, আল্লাহ-ভীতিতে সিক্ত, যাদের নৈতিক আদর্শ পরবর্তীতে জয় করে নিয়েছিল অর্ধ-পৃথিবী। কিন্তু আজ মুসলিম জাতির তিলকে দূর্ভাগ্য, হতাশা ও অপমানের টীকা দেখা যাচ্ছে। গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ পশ্চিমা বিশ্ব ও ইহুদিদের আগ্রাসনের শিকার। কারণ মুসলিমগণ আজ আল-কুর'আনের অনুশাসন মেনে চলছেন না। তারা ভুলে গেছেন তাদের সোনালী অতীত। ঠিক এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনগুলোর ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে মুসলিম সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো অতীব প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় এ সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা খুবই অপ্রতুল বিধায় বিষয়টি নিঃসন্দেহাতীতভাবে গুরুত্বের দাবিদার। প্রাসঙ্গিকভাবে 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইন: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' (The Social Laws In Al-Quran: An Analytical Study) অভিসন্দর্ভের উপর পিএইচ.ডি. গবেষণার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ বিষয়ের উপর যথাযথ আলোকপাত গবেষনা, তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষনা ফলাফল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে আল-কুর'আনের সামাজিক আইন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ, অনুধাবন ও অনুসন্ধিৎসা নিবারণে প্রভূত ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি এ গবেষণা মুসলিম উম্মার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনে শক্তিশালী অবদান রাখবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of Research)

মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে 'আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামী আইন সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। সভ্য সমাজ গঠন ও উন্নততর মানব সভ্যতার উন্মেষে 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মূলত আল-কুর'আনে সামাজিক আইন ইসলামী শরি'য়ত থেকে ভিন্ন কোন আইন নয়। ইসলামী শরি'য়তের মূল উৎস চারটি। যথা আল-কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিন্তু সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মৌলিক উৎস হচ্ছে আল-কুর'আন। আল-কুর'আনের সামাজিক আইনসমূহ মানব জাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং স্বার্থপরতা, ধ্বংস, পতন ও ক্ষতির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে। এই আইন মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক। সর্বোপরি এই আইন নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনা থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে। বস্তুত 'আল-কুর'আনের সামাজিক আইন অনুসরণ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। এই আইন মেনে চলার এবং তার বিপরীত আইন বর্জন করার জন্য কুর'আন মাজীদের বহু জায়গায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন বা জীবন বিধান, যার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না।[২] শরি'য়ার পরিভাষাটি গ্রহণ করা হয়েছে মূলত এই আয়াত থেকেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'অতঃপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না।[৩]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের একটি আইন কাঠামো দান করেছেন, কেবল তারই অনুসরণ করতে হবে এবং মানব রচিত আইনের অনুসরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এর পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, অপর কোন সত্তাকে তিনি আইন প্রণয়নের এখতিয়ার দান করেন নি। এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে কখনও তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য ইসলামী আইন ব্যতীত মানব রচিত আইন কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করার সুযোগ নেই। যদি সে আল্লাহর বিধানমত ফয়সালা না করে তবে সে কাফির (অবিশ্বাসী)[৫], যালিম (অত্যাচারী)[৬] ও ফাসিক (পাপিষ্ঠ)[৭] অভিধায় আখ্যায়িত হবে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন,

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।[৮]

আইনের আরবি প্রতিশব্দ আত্-তাশরী। আত্-তাশরী শব্দটি থেকে শরি'য়ত শব্দটির উৎপত্তি। তাই

---

২ আল-কুর'আন, আশ-শুরা, ৪২ : ১৩
৩ আল-কুর'আন, আল-জাসিয়া, ৪৫ : ১৮
৪ আল-কুর'আন, আল-ইমরান, ৩ : ৮৫
৫ আল-কুর'আন, আল-মায়েদা, ৫ : ৪৪
৬ আল-কুর'আন, আল-মায়েদা, ৫ : ৪৫
৭ আল-কুর'আন, আল-মায়েদা, ৫ : ৪৭
৮ আল-কুর'আন, আল-আ'রাফ, ৭ : ৩

আইনকে আরবি পরিভাষায় শরি'য়ত বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে আত্-তাশরী বলা হয় আরোপিত কর্ম সম্পর্কিত বিধানাবলী, যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রয়োগ করেন। যাতে তারা কর্মশীল মুমিন বান্দা হতে পারে। যা পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে সুভাগ্য বয়ে আনবে। তেমনিভাবে এটা এমন জীবন বিধান, সংবিধান এবং আইন কানুন-যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূলগণ মানব জাতিকে হেদায়েতের জন্য এবং স্বচ্ছ বিশ্বাস তথা ইমানের দিকে ধাবিত করার জন্য ঐশীসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন; যা আচরণ-মুয়ামেলাত, আমল আখলাক ও কল্যাণের ভিত্তি। যার দ্বারা মানব জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান হয়-যা মুসলিম ভাইয়ের সাথে, মানব জাতির সাথে, সৃষ্টি ও জীবনের সাথে জড়িত। অনুরূপভাবে যাতে আল্লাহ্র হকসমূহ, বান্দাদের হকসমূহ ও আত্মার হকসমূহকে সুস্পষ্ট করে। সুতরাং এটা হলো শরীর ও আত্মা সমূহের জীবনী শক্তি, অস্তিত্বের পবিত্রতা ও সুভাগ্যের চাবিকাঠি।[৯] যে আইন একটি সমাজে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা নির্ণয় করে, পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা স্থির করে, সমাজদেহকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সচল রাখে তাই সামাজিক আইন।

অতএব আল-কুর'আনের সামাজিক আইন মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা এবং বিভিন্ন দণ্ডবিধি তথা কিসাস ও হুদুদকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা সনদ রচনার মাধ্যমে মদিনাতে যে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রের সংবিধান ছিল আল-কুর'আন। বস্তুত রাসূল পাক (স.) মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই রাষ্ট্রের সাথে ধর্ম কিংবা পরিবার ও সমাজের কোন বিরোধ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ছিল একই আদর্শ থেকে উৎসারিত। সেই আদর্শ ছিল ঐশী বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূল (স.) আল-কুর'আনের অনুশাসন দ্বারা নারী জাতির সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কার করে বিভিন্ন নীতি বিগর্হিত সামাজিক অপরাধ যেমন শিশু হত্যা, সীমাহীন বহু বিবাহ প্রথা, জুয়া, সুদ, মদ, যিনা ব্যভিচার ইত্যাদি কুপ্রথাকে সমাজ হতে চিরতরে উৎখাত করা। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অধিকার সাম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। চুরি-ডাকাতি, নর হত্যা শিশু ও কন্যা সন্তান হত্যা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ কিসাস ও হুদুদ এর মত কঠোর আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে সমাজ হতে সমূলে উৎপাটন করেন।

ইসলামী আইনের পূর্ণ অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ (স.) প্রবর্তিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে আরব উপ-দ্বীপের সীমা অতিক্রম করে ইউরোপের স্পেন, তুরস্ক থেকে শুরু করে এশিয়া মাইনর এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ আল-কুর'আনের

---

৯ আশ্-শাইখ আব্দুর রহমান তাজ, *তারীখুল তাশ্রীইল ইসলামী* (মিশর : মুস্তফা আল-বারী আল-হালাবী, ১৯৩৬), পৃ. ৮-৯; আস সাইয়্যেদ রশীদ রেজা, *তাফসীরুল মানার* (মিশর : আল- হাইয়াতু আল-মিশরিয়্যা, তা.বি), পৃ. ৪১৪

অনুশাসন পরিত্যাগ করায় ১৯২৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের খেলাফতের চূড়ান্ত পতন হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রগুলো মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে দখল করে নেয়। তারপর এ সকল মুসলিম রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল পরিচালিত আল-কুর'আনের আইন-অনুশাসনকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে পরিত্যাগ করে তদস্থলে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রবর্তন করে। আল-কুর'আনের বর্ণিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আইনসমূহের অসারতা প্রমাণ করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন পণ্ডিত তৈরি করে তাদের দ্বারা ইসলামী আইনের মনগড়া, বিকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত ইসলামের আইনের রকমারি পুস্তক প্রনয়ণ করে। এ সকল অমুসলিম পণ্ডিতদের লিখিত ইসলামী আইন বিষয়ক বই, গবেষণা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন উক্তি, বক্তব্য লেখা আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমরা পাঠ করে আজ বিভ্রান্ত হচ্ছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স.) এবং ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম জ্ঞানী-গুণীদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট এবং খণ্ডিত। বস্তুত বলা চলে আজ ইসলামের উপর সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা বিশ্বের সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চলছে অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে।

মুসলিম জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের উপর গবেষণা করে আল-কুর'আন প্রদত্ত সামাজিক আইনসমূহের ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্ণয় করে এগুলোর সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। সেই সাথে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনসমূহের বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ যোগ্যতা এবং এদের স্বকীয়তা, বস্তুনিষ্ঠতা, সৌন্দর্য, দর্শন বিচার- বিশ্লেষণ করে মুসলিম মিল্লাতের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করা আজ সময়ের দাবি। এ দাবিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য গবেষণার বিষয়টিকে 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইন: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' (The Social Laws In Al-Quran: An Analytical Study) শিরোনামে গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করাই গবেষণার কাজ গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো এমন লুক্কায়িত সত্যের আবিষ্কার যা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।[১০] ইসলামী আইনের পরিপূর্ণ অনুসরণের উপর নির্ভর করে মুসলিম উম্মার পার্থিব উন্নতি, অগ্রগতি, প্রতিপত্তি অর্জন, মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠান এবং আখিরাতের মুক্তি। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলিম অধ্যুষিত অধিকাংশ দেশ মানব রচিত আইনে শাসিত হয়ে আসছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, উক্ত আইন ব্যবস্থা তাদেরকে সর্বজনীন টেকসই, উন্নতি ও নিরাপত্তা- যা মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তার কোনটাই পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। পক্ষান্তরে তারা পরিণত হয়েছে এক মূল্যহীন, পশ্চাদপদ, প্রতিপত্তিহীন, মর্যাদাহীন জাতিতে। পৃথিবীর

১০ ড. মোঃ শাহজাহান তপন, *থিসিস ও এ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল* (ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৩), পৃ. ১৩

সর্বত্রই আজ তারা লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও পদদলিত। তাদের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী মানব রচিত ভুলে ভরা আইনের অনুসরণ এবং অনেকাংশে ইসলামী আইনের অনুসরণ থেকে তাদের পিছুটান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখান কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১১]

উপরোক্ত আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামী আইনের অংশবিশেষ অনুসরণ করে এবং অংশবিশেষ ত্যাগ করে কোনভাবে মুক্তি অর্জন করা যাবে না; বরং তাতেও রয়েছে পার্থিব লাঞ্ছনা ও আখিরাতের কঠোর শাস্তিভোগ। সুতরাং, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল মানব জাতির জন্য যা নিয়ে এসেছেন আমাদেরকে কেবল তাই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।[১২] এ প্রসঙ্গে কুর'আন মাজীদে আরো উল্লেখ আছে,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

'কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।[১৩] আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্নতর সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট

১১ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ৮৫
১২ আল-কুর'আন, আল- হাশর, ৫৯ : ৭
১৩ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৬৫

হবে।[১৪] একই সাথে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম জাতিকে অন্য কোন জাতির অনুসরণ করতেও নিষেধ করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, তারা বিজাতির অনুসরণ করলে দ্বীন থেকে, হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না'।[১৫]

মুসলিম সমাজকে চিরসত্য সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠা করে সমাজ দেহকে শোষক-অত্যাচারী ও পাপাচারী মানুষদের হাত হতে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে পবিত্র আল-কুর'আনে সামাজিক আইনসমূহ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিধৃত হয়েছে। মূলত পবিত্র আল-কুর'আনের এ সকল সামাজিক আইন গোটা মানব সমাজ ব্যবস্থার জন্য রক্ষা কবচ (Safe-guard)। এই বক্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পবিত্র আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের নিম্মোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ আলোচ্য গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

১. আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।
২. আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের শানে নুযূল সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৩. আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৪. প্রাক-ইসলামিক প্রথাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এ সকল প্রথাসমূহের কুপ্রভাব ও কুসংস্কার সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৫. আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের সৌন্দর্য ও দার্শনিক যৌক্তিকতা, সমাজতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করা।
৬. আধুনিক মুসলিম বিশ্বে আল-কুর'আনে সামাজিক আইনসমূহের উপযোগিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োগযোগ্যতা নিরূপণ করা।
৭. মুসলিম মিল্লাতের চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন করা।
৮. মহানবি (স.) ও খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের বাস্তব প্রতিফলন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।
৯. আল-কুর'আনে সামাজিক আইন ও প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও আধুনিক অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক আইনসমূহের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের কর্তৃত্ব নিরূপণ করা।
১০. সামাজিক অপরাধ মূলোৎপাটন ও সংশোধনে আল-কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক আইনের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব নিরূপণ করা।

---

১৪ আল-কুর'আন, আল- আহযাব, ৩৩ : ৩৬
১৫ আল-কুর'আন, আল- মায়েদা, ৫ : ৫১

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়।[১৬] গবেষণার আলোচ্য বিষয় প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞান সংযোজন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও নীতিমালাকে ঠিক রেখে প্রথমে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার নক্সা তৈরি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক (Content Analysis) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়ণে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical), বর্ণনামূলক (Descriptive) বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational) ধাপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে (Action Research paradigm) সম্পন্ন করা হয়েছে। উপরের বিবিধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, আলোচনাভিত্তিক বিবৃতি যেখানে যেটা উপযোগী সেখানে সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলা। তবে তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি, আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিও সংযুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট আল-কুর'আনে বর্ণিত আয়াতসমূহের বিশ্লেষণে প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীর গ্রন্থের প্রত্যক্ষ সহায়তা নেয়া হয়েছে। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি বিষয়বস্তু বিবেচনায় সরাসরি অথবা ভাবানুবাদের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূত্র সংযোজন করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলার মৌলিকত্ব ও ভাবের বিশুদ্ধতা সঠিকভাবে বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষণার পরিধি (Scope)

পবিত্র আল-কুর'আনে লিপিবদ্ধ ৬,৬৬৬ আয়াতের মধ্যে মাত্র ৫০০টি আয়াতে মৌলিক আইন সন্নিবেশিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আবার একই বিষয়ে আয়াতের পুনরোক্তি (Repetition) লক্ষ্য করা যায়। পুনরোক্তি বাদ দিলে প্রায় দুইশতটি আয়াতে সামাজিক আইনের সাধারণ নীতিমালা পরিস্ফুট রয়েছে। তম্মধ্যে প্রায় আশিটি আয়াত জুড়ে রয়েছে উত্তরাধিকার, বিবাহ, দেনমোহর, তালাক, ভরণ-পোষণ, হেবা, ইয়াতিমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ, জুয়া খেলা, মদ্য পান, রিবা (সুদ) ও ঘুষ গ্রহণ, নর হত্যা ও ব্যাভিচারের বিধি-বিধানসহ আখালাকে হামীদাহ্ (সৎ চরিত্র) ও আখলাকে যামীমাহ্ (নিন্দনীয় চরিত্র)

---

১৬ ড. মোঃ শাহজাহান তপন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

এর বিশেষ উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন সামাজিক আইন। যেহেতু আল-কুর'আনে সামাজিক আইনসমূহের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং গবেষণার সময়কাল সীমিত বিধায় আলোচ্য গবেষণায় মৌলিক সাতটি সামাজিক আইনের উপর গবেষণা ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যথা গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও তালাক আইন, মিরাস আইন ও অছিয়ত আইন, দাস প্রথা ও দত্তক প্রথা সম্পর্কিত আইন, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন, নর হত্যা ও চুরি সংক্রান্ত আইন। এ সকল সামাজিক আইন সম্পর্কিত আয়াতে কারীমাগুলোর অনুপঙ্খ বিশ্লেষণ আলোচ্য গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)

সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহ তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়েছে। একইসাথে সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি আল-কুর'আনে সামাজিক আইনগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে চার মাযহাব প্রণীত উসূলে ফিকহ্ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Historical and analytical method) ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে উপাত্তসমূহকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহ ও সংযুক্তির সকল ক্ষেত্র আল-কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক আইনসমূহ নাযিলের তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও শানে নুযূল প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত রীতি-নীতি, প্রথা-অনুষ্ঠান, সামাজিক আচার-আচরণ, বিচার পদ্ধতির সাথে আল-কুর'আনের বর্ণিত সমাজিক আইনসমূহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সাথে প্রাক-ইসলামী যুগে বিদ্যমান আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত বিভিন্ন সামাজিক আইনসমূহের প্রয়োগ আল-কুর'আনের সামাজিক আইনসমূহের ভিত্তিতে যাচাই করা হয়েছে। পরিশেষে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের দর্শনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে।

গবেষণার উৎস (Sources Data)

গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে উৎসসমূহ ব্যহারের সূত্রের পূর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

প্রচলিত সামাজিক আইন ও আল-কুর'আনে সামাজিক আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ, গবেষণা গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, বিভিন্ন Law Journal ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রাথমিক উৎস হিসেবে সহায়তা নেয়া হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources):

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ চয়ন করা হয়েছেঃ

ক) সামাজিক আইন সংশ্লিষ্ট আল-কুর'আনের আয়াতসমূহ।

খ) বিভিন্ন প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থ।

গ) বিভিন্ন প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ ।

ঘ) বিভিন্ন ইসলামী আইন শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ।

গবেষণার সময় পরিধি (Research Time Frame):

এ গবেষণার সময়কাল ৫ বছর। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রামাণ্য তাফসির গ্রন্থাদি, হাদিস গ্রন্থ এবং হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, দেশি- বিদেশি বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, জার্নাল, অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইট, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসমূহ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে যাঁচাই-বাছাই ও পুনর্মূল্যায়ন করে গবেষণাকর্মটির মানদণ্ড বজায় রেখে এটি অতি যত্নসহকারে সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম খসড়া (ড্রাফ্‌টিং), সম্পাদনা, পুনঃসম্পাদনা, চূড়ান্ত প্রুফসহ থিসিসটি উপস্থাপনযোগ্য করতে গবেষকের সময় লেগেছে মোট ৫ বছর। গবেষণা কাজে ব্যবহৃত মোট সময়কে নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ব্যয়িত সময়ের তালিকা

কাজের ধরন	**ব্যয়িত সময়**
প্রথম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	১ বছর
দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	১ বছর
প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন	১ বছর
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	১০ মাস
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রুফ	৮ মাস
চূড়ান্ত প্রিন্ট, সম্পাদনা এবং বাঁধাই	৬ মাস

গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশেষ করে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের বিষয়ে বাংলা ভাষায় সরাসরি কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আরবি ও ইংরেজি ভাষায়ও আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম চোখে পড়ে না। ফলে গবেষণার তথ্য-উপাত্তকে আরো শক্তিশালী ও আরো নির্ভরযোগ্য করার পথে যথেষ্ঠ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে গবেষণা কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দায়ভার গবেষকের সম্পূর্ণ নিজের। তাছাড়া পিএইচ.ডি. একটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষার স্তর যা সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অর্থবহ ও শক্তিশালী অবদান রাখতে সক্ষম। ফলে একজন গবেষকের জন্য উচ্চতর গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য বৃত্তি কিংবা আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরূপ বৃত্তি কিংবা আর্থিক অনুদানের সুযোগ অবারিত নয়। উচ্চতর গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য এরূপ বৃত্তি কিংবা আর্থিক অনুদানের সুযোগ অবারিত থাকলে এ ধরনের নিবিড় (Indepth) গবেষণা কর্ম আরো সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং অধিক অর্থবহ করা সম্ভব হত।

তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা (Liteature Review)

আলোচ্য গবেষণা কর্মটির মূল বিষয় আল-কুর'আনের সামাজিক আইন। আল-কুর'আন যেহেতু সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর। সুবিশাল আল-কুর'আন হতে সামাজিক আইন সংক্রান্ত আয়াতগুলো পৃথক করে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত আয়াতসমূহকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা দুরূহ কাজ। আল-কুর'আনের বর্ণিত এ সকল সামাজিক আইনসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে আল-কুর'আনের বিভিন্ন সূরায় সন্নিবেশিত রয়েছে। আল-কুর'আনে ছড়িয়ে থাকা এসকল সামাজিক আইনসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিভিন্ন প্রামাণ্য তাফসির গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন প্রামাণ্য তাফসির গ্রন্থের উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। যে সকল তাফসির গ্রন্থ হতে সবচেয়ে বেশি তথ্য-উপাত্ত আলোচ্য গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাফসির গ্রন্থ হচ্ছে তাফসিরে কাবীর, তাফসিরে মারাগী, তাফসিরে মাহাসিনুত তা'বীল, তাফসিরে নূরুল ইয়াকিন, তাফসিরে তা'বারী, তাফসিরে জালালাইন, তাফসিরে ইবনে কাসীর, তাফসিরে মাজহারি, তাফসিরে ফি-যিলালিল কুর'আন, বয়ানুল কুর'আন, তাফসিরে খা'যাইনুল কুর'আন, তাফসিরে মা'আরিফুল কুর'আন, তাফসিরে রূহুল মা'আনী, তাফসিরে ফতহুল কাদীর, তাফসিরুল মানার, ইমাম কুরতুবি (র.) প্রণীত আল-জামে লি আহকামিল কুর'আন, ইমাম আবু বকর আল জাস্সাস (র.) বর্ণিত আহ্কামুল কুর'আন, আল্লামা ইবনুল আরাবী প্রণীত আহ্কামুল কুর'আন ইত্যাদি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) রচিত ও জাকারিয়া বুক ডিপো, ইউপি থেকে প্রকাশিত ‘তাফসিরে মাজহারী’ (তা.বি) গ্রন্থটিতে আল কুর’আনের বিভিন্ন সামাজিক আইনসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে যেমন বিবাহ, বহু বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার প্রথা, হদ ও কিসাস ইত্যাদি বিষয়গুলো সহিহ্ হাদীস ও ফিকহ এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আল-কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাইয়েদ কুতুব শহীদ রচিত ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ অনূদিত ‘তাফসীরে ফী যিলালিল কুর’আন’ (১৯৯৮) গ্রন্থটিতে আল-কুর’আনের সামাজিক আইনসমূহের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠতা বলিষ্ঠভাবে আলোচিত হয়েছে। যা আধুনিক কালের অন্যতম সেরা তাফসির হিসেবে বিবেচিত ও সমাদৃত।

দারুল ইহইয়াউ আত-তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত হতে প্রকাশিত ও আহমদ মোস্তফা আল-মারাগী রচিত ‘তাফসিরুল মারাগী’ (তা.বি) গ্রন্থে আল-কুর’আনের সামাজিক আইনসমূহের সৌন্দর্য, বাস্তব উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আলোচিত হয়েছে।

মুহাম্মদ রশিদ রেজা প্রণীত ‘তাফসীরুল মানার’ (১৯৪৭) মিশরঃ দারুল মানার হতে প্রকাশিত এবং মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী প্রণীত ‘রাওয়ায়েউল বায়ান তাফসীরে আয়াতিল আহকামি মিনাল কুর’আনে’ (২০০৭) মিশরঃ দারুস সাবুনী হতে প্রকাশিত প্রভৃতি গ্রন্থে আল-কুর’আনের সামাজিক আইনসমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, উদ্দ্যেশাবলী, আইনের দর্শন এর শক্তিমত্তা অত্যান্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বস্তুনিষ্ঠতার সাথে নির্মহ দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আল-কুর’আনে সামাজিক আইন সম্পর্কে ইহুদি পণ্ডিত রবাট রবার্টস ১৯২৪ সালে জার্মানের লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক আইনের উপর জার্মান ভাষায় গবেষণা করেন এবং উক্ত গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটি পরবর্তীতে Robert Roberts নিজেই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে ‘The Social Laws Of The Quran’ (1977) নামে New Delhi: kitab Bhavan, প্রকাশনা হতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে রবাট রবার্টস আল-কুর’আনের সামাজিক আইন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পান। উক্ত গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে আল-কুর’আন সম্পর্কে রবার্ট রবার্টসের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট বলে মনে হয়। তিনি তার গ্রন্থে আল-কুর’আনে বর্ণিত সামাজিক আইনের ব্যাখ্যায় অনেক স্থানেই মনগড়া ধারণার (Surmise & Conjecture) আশ্রয় নিয়েছেন।

কোন কোন স্থানে ‘Robert Roberts’র বক্তব্য একপেশে, খাপছাড়া, বিদ্বেষমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অনুমিত হয়। ‘Robert Roberts’র কোন কোন বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবে ও বস্তুনিষ্ঠতার

আলোকে অসত্য। উদাহরণ স্বরূপ হযরত যায়েদ বিন হারেস (রা.) কে রাসূল (স.) পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে যায়েদ বিন হারেসার সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁরই আপন ফুফাত বোন যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে বিবাহ দেন। দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক রীতিতে যায়েদ বিন হারেস (রা.) এবং যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) এর মধ্যে সম্পর্কের অবনতির চূড়ান্ত পর্যায়ে যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে তালাক প্রদান করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স.) জাহেলী যুগের জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা সামাজিক প্রথা ‘পালক পুত্র আপন পুত্রের মর্যাদা পায় এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারী অর্জন করে’-এই কু-প্রথা রহিত করে আল্লাহ তা’য়ালার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স.) পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেস (রা.) এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে বিবাহ করে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করে নেন। কিন্তু রবার্ট রবার্টস বিদ্বেষমূলকভাবে ঐতিহাসিক সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে তার গ্রন্থে উক্তি করেন যে ‘One occasion the prophet had seen (Joynab) unveiled, and whose charms had made a great impression upon him. On hearing this, Zaid at once decided to divorce her in favour of his benefactor’.[১৭] অর্থাৎ কোন এক ঘটনা উপলক্ষে নবী (স.) যয়নাব বিন জাহাশকে ঘোমটাবিহীন অনাবৃত চেহারায় দেখে ফেলেন, তার রূপ-সৌন্দর্য নবী (স.) এর উপর ভীষণ ছাপ ফেলে। এ কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ যায়েদ (রা.) স্বীয় স্ত্রী যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে মনিবের (নবী) কৃপা লাভের আশায় তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রবার্ট রবার্টস এই উক্তি ঐতিহাসিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্যের অপলাপ। আলোচ্য গবেষণায় রবার্ট রবার্টসের মনগড়া বিকৃত উক্তি ও বিশ্লেষণে গঠনমূলক জবাব প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্পের গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Research Topic)

গবেষণার সুবিধার্থে ‘আল-কুর’আনে সামাজিক আইন: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন’ (The Social Laws In Al-Quran: An Analytical Study) অভিসন্দর্ভকে ৭টি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম এবং পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার অবতরণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, গবেষণার পরিধি/ব্যাপকতা, উৎস, গবেষণার সময়কাল, গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা এবং

---

১৭ Robert Roberts, *The social Laws of the Quran* (New Delhi: kitab Bhavan,1977), p. 37

অভিসন্দর্ভ গঠন/গবেষণা পরিকল্পনা ইত্যাদি ধারাবাহিক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরো যেসব বিষয়সমূহ এ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো, আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে পরিবার, এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য, পরিবার গঠন প্রক্রিয়া, পরিবার ও সমাজের উৎপত্তি, এর ক্রমবিকাশের তত্ত্ব, মানব পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য, আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে বিবাহ, বিবাহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, পরিবার ও বিবাহের উদ্দেশ্য, ইসলামের দৃষ্টিতে বহু বিবাহ, মুহাররামাত ও চরিত্রহীনা নারীকে বিবাহ সম্পর্কে আল-কুর'আনের বিধান। উল্লিখিত শিরোনামে বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সূত্রসহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য, তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের রীতি-নীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য আরো যেসব শিরোনাম আলোচনায় এসেছে তা হচ্ছে স্ত্রীর দেনমোহর, নাফাকা বা স্ত্রীর ভরণ পোষণ, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ, আল-কুর'আনে তালাক আইন, তালাকের প্রকারভেদ, ইদ্দত আইনের সংক্ষিপ্তসার, আল-কুর'আনে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার ও তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপত্র, তালাক বিষয়ে অমুসলিম পণ্ডিতদের বক্তব্য ও এর জবাব, তালাকের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপাস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ব্যভিচার ও ব্যভিচার সংক্রান্ত আইন স্থান পেয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও এর শাস্তি, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিশ্লেষণ, আল-কুর'আনে ব্যভিচারের শাস্তি, ব্যভিচার প্রমাণের পদ্ধতি, ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন, ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি আইন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়ে দাস প্রথা ও পালক পুত্র অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন স্থান পেয়েছে দাস অধিগ্রহণ, দাসদের সাথে আচার ব্যবহারে আল-কুর'আনের নির্দেশাবলী, আল-কুর'আনে দাস মুক্তির বিধান, প্রাচীন আরব সমাজে পালক পুত্র গ্রহণ প্রথা, পালক পুত্র গ্রহণে আল-কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি, যায়েদ বিন হারেস (রা.) এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশ সম্পর্কে অমুসলিম পণ্ডিতদের মনগড়া উক্তি ও এর

গঠনমূলক জবাব আলোচ্য অধ্যায়ে গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন স্থান পেয়েছে, উত্তরাধিকার বা ফারায়েয আইনের সংজ্ঞা, উত্তরাধিকার আইনের গুরুত্ব, আল-কুর'আনে উত্তরাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্য, উত্তরাধিকার আইনের নীতিমালা, আল-কুর'আনে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিভাগ, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির বন্টন ব্যবস্থা, উইল বা অসিয়ত আইন এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে হত্যা ও চুরি সংক্রান্ত আইন বর্ণিত হয়েছে, হত্যার প্রকারভেদ, আল-কুর'আনে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিবরণ, হত্যার শাস্তি, কিসাস ও দিয়ত সংক্রান্ত বিধি-বিধান, কিসাস আইনের দর্শন, চুরির সংজ্ঞা, চুরির হদ বা দণ্ড ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উপসংহার

অভিসন্দর্ভের শেষ পর্যায়ে উপসংহার (Conclusion) লেখা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সার নির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার জন্য নির্বাচিত আল-কুর'আনের সামাজিক আইনগুলোর বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ অত্যন্ত জটিল কাজ। কারণ আল-কুর'আন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী। তাই কোন সৃষ্টির পক্ষে আল-কুর'আনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য গবেষণায় আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের নির্ধারিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, যুগোপযোগিতা এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে উপসংহার টানা হয়েছে। পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, চিন্তাবিদ ও গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু সাধারণ জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। এই অভিসন্দর্ভ প্রমাণ করেছে এই পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে, যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ আইন ও আইন বিজ্ঞান রয়েছে তার মধ্যে আল-কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক আইনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যুগোপযুগী। কারণ আল-কুর'আন যেমন শাশ্বত-তেমনি আল-কুর'আন হতে উৎসারিত বিধি-বিধান, আইন-কানুনও শাশ্বত এবং সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য। আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ আইনে মানব স্বভাব ও মানব প্রকৃতিকে সর্বক্ষেত্রে লালন করা হয়েছে। সেই সাথে এই আইন প্রয়োগে মানবতার সর্বক্ষেত্রে সাম্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ফলে দার্শনিকতা, সুসামঞ্জস্যতা, মানব কল্যাণবর্তিতার ক্ষেত্রে এই বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য সকল আইনের উপর আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের শক্তিমত্তা অবিসংবাদিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। উন্মুক্ত মন, নির্মহ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, যুক্তি নিরীক্ষণ ও গভীর দার্শনিক অনুধ্যান নিয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করলে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব। এই গবেষনা সমাজের দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, আইন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং জ্ঞান পিপাশু পাঠক সর্বোপরি মুসলিম মিল্লাতের কাঙ্খিত প্রয়োজন মেটাতে যদি সামান্যতম অবদান রাখে তাহলে গবেষকের পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে মহান আল্লাহর নিকট আশা করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে পরিবার

◊ পরিবার ও সমাজের বিকাশ
◊ মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব
◊ সমাজ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের মত ও আল-কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি
◊ খিলাফতের দায়িত্ব পালনে মানব পরিবার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে বিবাহ

◊ বিবাহের আইনগত সংজ্ঞা
◊ বিবাহের দর্শন তত্ত্ব
◊ আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবন
◊ আল-কুর'আনে দাম্পত্য জীবনের রূপরেখা
◊ বিবাহের উদ্দেশ্য
◊ বিবাহের গুরুত্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনে একাধিক বিবাহ

◊ যুগে যুগে বহু বিবাহ
◊ একাধিক বিবাহ আইনের প্রেক্ষাপট
◊ চারজন স্ত্রী একসাথে রাখার বৈধতা
◊ একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমতা বিধান
◊ একাধিক বিবাহের স্বীকৃতির অন্তর্দর্শন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুহাররমাত

◊ মুহাররমাতের সংজ্ঞা
◊ আল-কুর'আনে মুহাররমাত
◊ রক্ত সম্বন্ধীয় মুহাররমাত
◊ বৈবাহিক সম্বন্ধীয় মুহাররমাত
◊ দুগ্ধপান সম্বন্ধীয় মুহাররমাত
◊ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে পরিবার

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা। বস্তুত ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে সামাজিক জীবনের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। পরিবারেই সর্বপ্রথম ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্মিলন ঘটে এবং এখানেই হয় অবচেতনভাবে মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের হাতেখড়ি। এই পরিবার গঠনের একমাত্র সমাজ স্বীকৃত প্রক্রিয়া হল বিবাহ। কারণ যৌন প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত প্রাকৃতিক বিষয়। যৌন প্রবৃত্তির সুষ্ঠু নিবৃত্তির মধ্যে রয়েছে মানুষের মন-মানসিকতা ও স্নায়ুমণ্ডলির পরম শান্তি ও সুস্থতার নিরাপত্তা। তাই ইসলাম মানুষের যৌন প্রবৃত্তিকে শুধু স্বীকারই করেনি বরং এর লালন ও বিকাশের জন্য ইসলাম সব ধরনের সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ইসলাম খ্রিষ্টান ধর্মমতের বৈরাগ্যবাদকে কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি আবার পাশ্চাত্য জগতের মত যৌনতাকে বাছ-বিচারমুক্ত, অবাধ, বল্গাহীন ও স্বাধীন করেও দেয়নি। বরং ইসলাম যৌন প্রবৃত্তি নিবারণে ভারসাম্যপূর্ণ মানব স্বভাবসম্মত বিধান ও নীতি-পদ্ধতি প্রদান করেছে। তাই আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে পরিবার ও বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুর'আনের বহু সংখ্যক আয়াতে পরিবার গঠন প্রক্রিয়া, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

পরিবার ও সমাজের বিকাশ

পরিবার নামক সংগঠনের ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। আল-কুর'আন দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে যে, এই পৃথিবীর বুকে প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ও তার জীবন সঙ্গীনী হাওয়ার পদচিহ্নের মাধ্যমে মানব জাতির অভ্যুদয় ও বিকাশের সূচনা হয়। আদম (আ.) ও হাওয়া পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম পরিবারের গোড়াপত্তন করেন। তারপর তারা একাধিক সন্তান-সন্ততি জন্ম দিয়ে মানব বংশধারার প্রবাহমানতাকে অব্যাহত রাখেন। মানব জাতির অভ্যুদয়, বিকাশ, পরিবার ও সমাজ গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়িকে এবং সেই দুইজন থেকেই (বিশ্বময়) ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে

অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন'।[১] আলোচ্য আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে মানব জাতির সূচনা, পরিবার ও সমাজ গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি বিষয় প্রতিভাত হয়।

এক. নর ও নারী একই نَفْسٍ (নাফ্স) থেকে সৃষ্ট : আরবী ভাষায় নাফ্স শব্দে যেমন আত্মা বুঝায়, তেমন বুঝায় কোন কিছুর সমগ্রতা এবং নির্যাস (The whole of a thing and its essence)। উৎসমূলক প্রকৃতিতে ও সামগ্রিক বিবেচনায় নর ও নারী একই নাফ্স থেকে সৃষ্ট। এখানে নাফ্সকে (প্রাণ) মানবতার ঐক্য বিন্দু এবং পরিবারকে গোটা সমাজের ঐক্যের সূত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।[২] আয়াতাংশটি মহান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহনকারী। আল্লাহ তা'য়ালা মানবতার বিকাশ শুরু করেছিলেন একজন মাত্র মানুষ তথা আদমকে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। পরে তারই সত্তাগত উপাদান দিয়ে তার জুড়ি হাওয়াকে তিনি সৃষ্টি করেন। এ দু'জনের পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলশ্রুতি হিসেবেই পৃথিবীতে অসংখ্য পুরুষ ও নারীর অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয়েছে। বস্তুত আদম ও তার স্ত্রী হাওয়া মিলে সর্বপ্রথম পরিবার গঠন করে মানবতার সূচনা করেন। নারী ও পুরুষ একই উৎস হতে প্রবাহিত মানবতার দুটি স্রোতধারা। নারী ও পুরুষ একই জীবন-সত্তা থেকে সৃষ্ট, একই বংশ থেকে নিঃসৃত।[৩] সুতরাং এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উৎসমূলক প্রকৃতিকে ও সামগ্রিক বিবেচনায় নর ও নারী সমতুল্য।[৪] তাই নারীর গঠন, প্রকৃতি, স্বভাব, চরিত্র, রুচি, দায়িত্ব ও ভূমিকার কৃত্রিম দূর্বলতা অন্বেষণ করে পারিবারিক বন্ধনকে দূর্বল করা সমাজ বিকাশের অন্তরায়। তাই আজ পর্যন্ত নারীর প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তার কারণে পরিবার কোন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একমাত্র ইসলামই জাহেলী সমাজের হীন দৃষ্টিকোণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটিয়ে আদল ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে।[৫]

দুই. বিবাহ ও পরিবারের ভিত্তি স্থাপন: 'وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا' আয়াতাংশটি নির্দেশ করে যে, মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। পরিবারের গঠনের একমাত্র বৈধ, সভ্য সমাজ স্বীকৃত পন্থা হলো বিবাহ। আয়াতাংশ হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন আদমের স্ত্রী রূপে। সূরা

১ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১

২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীরে ফী যিলালিল কুর'আন* (অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ঢাকা : আল-কুর'আন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), খ.৪, পৃ. ৩৮

৩ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ৫৫

৪ গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ২২

৫ প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪১

আল-‘আরাফে উল্লেখ আছে আদমের প্রশান্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন।[৬] পরে এ দু'জনের বৈধ বিবাহের মাধ্যমে পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলশ্রুতি হিসেবেই পৃথিবীতে অসংখ্য পুরুষ ও নারীর অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয়েছে।[৭] বস্তুত এই নর-নারী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। আর তা নির্ভর করে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে নর-নারী যুগলদ্বয়ের পরিবার গঠনের উপর।

তিন. সারা বিশ্বে মানব বসতি স্থাপন: আয়াতে বর্ণিত ‘بَثَّ’ শব্দের অর্থ ‘التفريق واثارة الشيئ’ অর্থাৎ ‘বিভক্ত করা, কোন বস্তুর বিস্তৃতিকরণ, ছড়িয়ে দেওয়া।[৮] যেমন আল কুর'আনে এসেছে, ‘ وزرابي مبثوثة’ অর্থাৎ ‘বিছানো গালিচা’।[৯] ‘وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء’ এই আয়াতাংশের মমার্থ হলো আদম ও হাওয়ার মাধ্যমে অসংখ্য বংশাবলী ও সন্তান-সন্ততি বিস্তার লাভ করে ছড়িয়ে পড়েছে।[১০] আলোচ্য ‘بَثَّ’ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় আদম ও হাওয়ার পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে তাদের একাধিক পুত্র ও সন্তানাদি। তারপর আদমের এই পুত্র ও কন্যা সন্তানগণ বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে তৎকালীন প্রচলিত শরি'য়ত সম্মত উপায়ে একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অগণিত সন্তান জন্ম দিয়ে জীবন ও জীবিকার তাগিদে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মানব বসতি গড়ে তুলেছে।

চার. সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের মূলতত্ত : মানুষ সামাজিক জীব। মানব জাতির আরবি প্রতিশব্দ ‘الانسان’ এর মূল ধাতু ‘أُنْسٌ’ অর্থ মনের আকর্ষণ, ঝোঁক-প্রবণতা, ভালবাসা ও মেলামেশা। মানুষের স্বভাব হলো অন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা- তথা সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। এর দুটো কারণ দেখা যায়। এক. জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন, দুই. স্বজাতীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ।[১১] প্রথম কারণটি আলোচ্য আয়াতে ‘تسائلون به ’ শব্দে পরিস্ফুট, বাঙ্ময় (contemplated) হয়েছে। تسائلون শব্দের অর্থ ‘ تعاطون - تعاقدون و تعاهدون ’ ।[১২] আয়াতাংশ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ ’ এর মর্মার্থ হচ্ছে, ‘তোমরা তোমাদের ঐ প্রতিপালককে ভয় কর যার নাম উচ্চারণ করে, যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর, সাহায্য চাও। তোমরা আল্লাহর নাম

৬ ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই স্বজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছে যেন তার থেকে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পার’। দ্র. আল-কুর'আন, আল-আ'রাফ, ৭ : ১৮৯

৭ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৮ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়েউল বায়ান তাফসীরে আয়াতিল আহকামি মিনাল কোরআনে* (মিশর : দারুস সাবুনী, ২০০৭), খ.২, পৃ. ৩৩৩

৯ আল-কুর'আন, আল-গাশিয়া, ৮৮: ১৬

১০ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৩

১১ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অনান্য, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ.৪২৯

১২ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, *ফতহুল কাদির* (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৩), খ. ১, পৃ. ৫৬৫

নিয়ে পরস্পরে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও, চুক্তি সম্পাদন কর, একে অপরের নিকট সাহায্য- সহযোগিতা চাও, পরস্পরে দান -দক্ষিণা কর। যেমন মানুষ একে অপরের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা চায় এরূপ বলে 'اسالك بالله-أنشدك الله' অর্থাৎ আমি তোমার নিকট আল্লাহর ওয়াস্তে চাই অথবা তোমার নিকট আল্লাহর ওয়াস্তে কামনা করি, দাবি করি ইত্যাদি।[১৩] এভাবেই মানুষ পরস্পরের নিকট অধিক পরিমাণে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কামনা-বাসনা, আর্জি-ওজর পেশ করে থাকে। আলোচ্য শব্দটির অর্থ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আদম সন্তানরা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা একে অপরের নিকট সাহায্য- সহযোগিতা চায়। একে অপরের নিকট সাহায্য- সহযোগিতা চাওয়ার স্বভাব থেকে উৎপত্তি হয় সমাজের। বস্তুত মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য তারা একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া (interaction) গড়ে তোলে। আর এই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে মানব সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ হয়। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান সৃষ্টির বহূ পূর্বেই সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের মূলতত্ত্বটি আলোচ্য 'تسائلون به' আয়াতাংশে বিধৃত হয়েছে।

পাঁচ. মৌলিক মানবাধিকারের (fundumental human rights) সংরক্ষণ: আলোচ্য 'تسائلون به' শব্দগুচ্ছ দ্বারা মৌলিক মানবাধিকারের বাণী বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে। কারণ প্রতিটি মানুষই আল্লাহর সৃষ্ট। তাই মানুষ মাত্রই পরস্পরের আত্মীয় তুল্য। সৃষ্ট জীব হিসেবে প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে সমান, উঁচু-নীচুর কৃত্রিম ভেদাভেদ মুক্ত। একের প্রতি অন্যের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের কোন মানুষই এই অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে না।

ছয়. পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন: আয়াতে বর্ণিত 'اَلْاَرْحَمْ' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'আরহাম' শব্দের অর্থ জরায়ু বা মাতৃগর্ভাশয় যেখানে ভ্রুন থাকে। পরবর্তীতে আত্মীয়স্বজন ও নিকটাত্মীয় অর্থে 'اَلْاَرْحَمْ' শব্দটি আরবি বাকরীতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আল-কুর'আন পরিবারস্থ লোকদের দুটি নামকরণ করেছে; কখনো একে 'আরহাম' বলে সম্বোধন করেছে, কখনো 'যাবীলকুরবা' বা নিকটাত্মীয় বলে সম্বোধন করেছে।[14] যেমন- 'وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ' 'এবং নিকটাত্মীয়দের ও মিসকিন ও পর্যটকদের প্রাপ্য পরিশোধ কর'।[১৫] আল-কুরআনে এসেছে, وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 'বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর

---

১৩ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৬৫

১4 আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ* (অনু. মাওলানা রেজাউল করিম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩), পৃ. ১৩৩

১৫ আল-কুর'আন, আল-বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬

বেশী হকদার'।[১৬] 'الْأَرْحَمْ' শব্দটি নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রশ্নই উঠে না। এই নির্দেশ সমাজবদ্ধ হয়ে ও একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করে। আলোচ্য আয়াত ' وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইকরামা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, واتَّقُوالأرْحَامَ وَصَلُوْهَا অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হতে পরস্পর বিরত থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ।[১৭] আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কখনো বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। আল-কুর'আন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 'তোমরা যদি জিহাদের বিধান হতে ফিরে যাও, তাহলে তোমরা কি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবে'।[১৮]

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী আবু হাইয়ান (র.) লিখেন, যদি তোমরা শরি'য়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেও- জিহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগে এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা অবসানের জন্য জিহাদের নির্দেশ জারী করেছে। জিহাদের মাধ্যমে সুবিচার ও আত্মীয়তার বন্ধন সুসংহত হয়।[১৯] একই প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে এসেছে, ' لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ' "তারা মর্যাদা দেয় না, কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার বন্ধনকে, আর না কোন অঙ্গীকার পালনে, এরাই সীমালংঘনকারী"।[২০]আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'وَلا' শব্দের অর্থ নিকটাত্মীয়তা।[২১] এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের এই আয়াতটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا 'এবং তিনিই আল্লাহ যিনি পানির উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, আপনার প্রতিপালক সর্ব শক্তিমান'।[২২] এ আয়াতে মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একভাগ হচ্ছে বংশ

১৬ আল-কুর'আন, আল-আনফাল, ৮ : ৭৫
১৭ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫
১৮ আল-কুর'আন, আল-মুহাম্মদ, ৪৭ : ২২-২৩
১৯ মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মহিউদ্দিন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), খ.৮, পৃ. ২৯
২০ আল-কুর'আন, আত্- তাওবা, ৯ : ১০
২১ আবু বকর আল- জাস্সাস, *আহকামুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮), খ. ২, পৃ. ৩৫২
২২ আল-কুর'আন, আল- ফুরকান, ২৫ : ৫৪

রক্ষার বাহন, অর্থাৎ পুত্র সন্তান, বংশ তাদের দ্বারাই রক্ষা পায়, 'অমুকের ছেলে অমুক' বলে পরিচয় দেয়া হয়। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষার বাহন অর্থাৎ কন্যা সন্তানকে অপর ঘরের ছেলের নিকট বিয়ে দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এই দুই ধারার আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্যে অসাধারণ কল্যাণকামিতা রয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালার অসীম কুদরতের প্রকাশ।[২৩]

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার জন্য মহানবি (স.) সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, পরিপূর্ণ কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী মহান আল্লাহ বলেন, 'আমিই আল্লাহ, আমার নাম রহমান, অতীব দয়াময়, করুণা নিধান, আমিই আত্মীয়তা সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে নির্গত করে এই নাম রেহেম রেখেছি। যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সঙ্গে (রহমতের) সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার থেকে (রহমতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব'।[২৪] আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেন, তোমরা নিজেদের বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে তোমরা তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় থাকলে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বাড়ে।[২৫] মহানবি (স.) এরশাদ করেন, 'রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেস্তে প্রবেশ করবে না'।[২৬]

উপরোক্ত হাদীস সমূহে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করল, সে মূলত আল্লাহ তা'য়ালাকেই অস্বীকার করল। কারণ এ পৃথিবীতে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টিকারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ। কে কার আত্মীয় হবে বা কে কার পিতা বা সন্তান হবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয় কারো জানা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই রুহের জগতে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই রক্তের বন্ধন ছিন্নকারী অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসেবে গণ্য হবে। তাই তার জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সূরা আন-নিসার উপরোক্ত আয়াতের সারমর্মে বলা যায় যে, আল্লাহর ভয় এবং আত্মীয়তার বন্ধন পারস্পরিক সম্প্রীতি অটুট রাখার মানসিকতা সৃষ্টি করে, পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। অতঃপর গোটা মানবতার মাঝে পারস্পরিক দয়া-করুণা এবং সংহতির যাবতীয় দায়ভার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানব জাতির মূল যেহেতু একই বংশধারা

---

২৩ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ও ৯৭

২৪ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী (র.), *সুনানে তিরমিযী* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), অধ্যায়: রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, হাদীস নং ১৯০৭, খ.২, পৃ. ১২

২৫ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত- তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, অধ্যায় : বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞানদান, হাদীস নং ১৯৭৯, খ.২, পৃ. ১৯

২৬ ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ বোখারী* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৭৫০, খ. ২, পৃ. ৮৮৫

হতে প্রবাহিত। তাই সারা বিশ্বের মানবজাতি একই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় ও অটুট রাখার জন্য এখানে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাতে ফাটল সৃষ্টি হয় এমন সব বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য এবং অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৭]

মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব

পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানব প্রকৃতিই এ আত্মীয়তার যৌগিকতার দ্বারা এক একটা সুসংবদ্ধ পরিবার গড়ে তুলে। এ পরিবারসমূহের সমন্বয়ে গড়ে উঠে গোত্র বা সমাজ এবং এই সমাজই রূপান্তরিত হয় এক একটি বৃহত্তম জাতিতে এবং মানবতার এ কাফেলাকে সুসভ্য ও সংস্কৃতিপন্ন জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সমাজ গঠনের মূল উপাদান-পারস্পরিক সহযোগিতা। সমাজের উৎপত্তি মূলে পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণা সর্ব প্রথম আল কুর'আনে সূরা আল-হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু'।[২৮]

এই আয়াতটিতে মানব সমাজ গঠন প্রক্রিয়া ও সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশের তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে আল-কুর'আনের সূরা আল হুজরাতের ১৩ নম্বর আয়াত হতে অনেক তত্ত্ব, তথ্য-উপাত্ত, উপকরণ লাভ করেছে। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় ও লেখনীতে যা ফুটে উঠেছে। ফলে বক্ষমান আয়াতটির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে আয়াতটির বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলোঃ

এক. আয়াতটি মানুষের সৃষ্টি ও তার অস্তিত্বের সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক রূপরেখা পরিস্ফুট করে। সামাজিক অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল মানুষ সর্বদা দলবদ্ধভাবে, গোত্রবদ্ধভাবে ও জাতিবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। প্রতিটি মানুষই তার জাতিসত্তা, কিংবা গোত্র সত্তা দ্বারা পরিচিত বা সনাক্ত হয়ে থাকে- এটা এজন্য যে, সে এর মাধ্যমে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে সকলের নিকট সুপরিচিত হয়ে যায়। কার্যত মানব প্রকৃতি সুখ, শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সহ-সদস্যের সাথে সমাজে বসবাস করতে চায়। এজন্য ইসলাম মানুষকে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে শিক্ষা দিয়েছে। পারস্পরিক দয়া,

---

২৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৮
২৮ আল-কুর'আন, আল- হুজরাত, ৪৯ : ১৩

সহানুভূতি ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের তাগিদ দিয়েছে যেখানে এর সদস্যরা শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতে পারবে।[২৯]

দুই. 'The Scientific Indications in the Holy Quran' গ্রন্থে আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে,

> 'After the different races in human populations have been stabilized, the adaptaions of territorialism, dominance, and the leader-follower relationship have evolved and helped to make human societies possible.The differences in manners, customs, and behavior between the races stimulated an urge among men to know each other's race, and at the same time a need arose to seek new frontiers to fulfill their daily necessities like food, clothing and shelter. Thus started a process of social intercourse between the tribes, races and nations, This is evidently what is implied in the phrase لِتَعَارَفُوا (that you may know one other) mentioned in the verse'.[৩০]

অর্থাৎ সারা বিশ্বে মানব জাতির বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আঞ্চলিকতা, কর্তৃত্বের অভিযোজন এবং নেতা-অনুসারী সম্পর্ক মানব সমাজ গঠনে সাহায্য করেছে। দুটি নৃ-গোষ্ঠির মধ্যে স্বভাবগত, প্রথাগত ও আচরণগত ভিন্নতা একে অপরের জাতি-গোষ্ঠি সম্পর্কে জানতে পরস্পরকে আগ্রহী করেছে, একই সাথে খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়ের মতো তাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলি পূরণ করতে নতুন সীমানা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। এভাবে বিভিন্ন উপজাতি, জাতি ও নৃ- গোষ্ঠির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আয়াতে বর্ণিত لتعارفوا (যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার) শব্দগুচ্ছে আলোচ্য বিষয়টির তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে।

তিন. শায়েখ জাদা বলেন, মানুষকে বহু জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হলো তারা যেন নিজ নিজ বংশ দিয়ে পরিচিতি লাভ করতে পারে। কোন ব্যক্তি যেন তার বংশ নয় কিংবা তার পিতা নয় এমন ব্যক্তির পরিচয়ে নিজ পরিচয় না দিতে হয়। মানুষের এই বংশ পরিচয় পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার

২৯ Jamil Farooqi, *Islamic Concept of sociology: Journal of Objective Studies* (New Delhi: Institute of Objecetive Studies, Vol. 4 No. July 1992/1413-H), p.32

৩০ M. Shamsher Ali, et all, *The Scientific Indications in the Holy Quran* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh), p. 504

জন্য নিজ বংশের রক্ত ধারাকে বিশুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন। কোন অবস্থায় যাতে কোন ব্যক্তি নিজ রক্তধারা গোপন করতে না পারে সে জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা নারী ও পুরুষকে বিভিন্ন বংশ, খান্দান, গোত্র বা কৌম (Clan) ও জাতিতে বিভক্ত করেছেন।[৩১]

চার. এখানে বলা হয়েছে, যদিও আল্লাহ তায়া'লা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজতর হয়।[৩২]

পাঁচ. কার্যত সমস্ত মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত, একই বংশ হতে উদ্ভূত। তারপর তাদের বংশ বিস্তারের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বংশধারার সৃষ্টি। এই অসংখ্য বংশধারা হতে গোত্র এবং অসংখ্য গোত্র হতে বিভিন্ন জাতি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসের দরুণ সমস্ত মানুষ বর্ণ, আকার-আকৃতি, ভাষা, উচ্চারণভঙ্গি, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রা ও চালচলন (Life Style) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে পরস্পর বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির মূলে পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতা কার্যকর করাই ছিল একমাত্র লক্ষ। এভাবেই অসংখ্য বংশ একত্রিত হয়ে গোত্র, অসংখ্য গোত্র একত্রিত হয়ে জাতি এবং অসংখ্য জাতি সম্মিলিত হয়ে বিশ্ব সমাজ সংস্থা গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক পরিচিতি লাভের এই মাধ্যমকে গৌরব, বিভেদ, বিসম্বাদ ও হিংসা-বিদ্বেষের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা কোনভাবেই কাম্য নয়।[৩৩] ফলশ্রুতিতে মৈত্রি ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয়। বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, চরিত্র, প্রতিভার ও যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি সৃষ্টিগত বৈচিত্র মাত্র। এই সৃষ্টিগত ভিন্নতাকে মিথ্যা গর্ব-অহংকারের হাতিয়ার বানিয়ে বিশ্ব পরিবারে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সৃষ্টির মূলকে ভুলে যাবার নামান্তর।[৩৪]

ছয়. আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা এই বিশ্ব মানবতাকে একজন পুরুষ ও নারী তথা আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি করার পর তাদের দু'জনের বংশ হতে অসংখ্য নর- নারী জন্ম নিয়ে বিভিন্ন জাতি- গোত্রে বিভক্ত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে গোত্র ও জাতি বুঝাতে قبائل ও شعوب শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। قبائل শব্দটি قبيلة (কবিলাহ) শব্দের বহুবচন এর অর্থ হলো এমন বৃহত্তর দল ও সম্প্রদায় যা বিভিন্ন গোত্র ও বংশকে একত্রিত করে।[৩৫] আর شعوب শব্দটি شعب (শা'বুন) শব্দের বহুবচন। শা'বুন বলা হয় এমন বৃহত্তর গোত্র ও বংশের সমাবেশকে যার মধ্যে অনেক কবিলাহ অন্তর্ভুক্ত

---

৩১ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুত্ তাফাসীর* (মিশর : দারুল সাবুনি, ১৯৮৯), খ.৩, পৃ. ২৩৬
৩২ মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), প্রাগুক্ত, খ.০৯, পৃ. ২৬০
৩৩ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুর'আন* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯৯),খ.১৫, পৃ. ৯৭
৩৪ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ১৭৩
৩৫ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুত্ তাফাসীর* (মিশর : দারুল সাবুনি, ১৯৮৯), খ.৩, পৃ. ২৩৬

থাকে। মূলত একটি শা'বে একটি বংশধারার সপ্তম পুরুষ অন্তর্ভুক্ত করে।[৩৬] তাফসীরে আল-মারাগীতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত বংশধারার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে,

عشيرة ← فصيلة ← فخذ ← بطن ← عمارة ← قبيلة ← شعب

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) আ'শিরা, দাদা হাশেম ফাসিলা, আবদে মানাফ ফাখয, কুশাই বাতন, কুরাইশ ইমারহ, কেনানা কবিলাহ এবং খুজাইমা শা'বুন এর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে شعوب ও قبائل দুটি বহুবচন পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা অসংখ্য- অগণিত কবিলাহ ও শা'বুন একতাবদ্ধ ও অবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস উদ্দেশ্য।[৩৭] মানুষ নানারকম কল্যাণমূলক প্রয়োজন পূরণে একে অপরের সাহায্য- সহযোগিতায় পরস্পরে এগিয়ে এসেছে পারস্পরিক পরিচিতি লাভের মাধ্যমে। মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা হল সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার প্রবণতা হতে মানুষ অসংখ্য- অগণিত কবিলাহ ও শা'বুন গড়ে তুলেছে।

সাত. মানবতার সাম্য: আল-কুর'আন অত্র আয়াতে মানবতার সাম্য ঘোষণা করেছে। ঘোষণা করেছে সমস্ত মানুষের বংশীয় অভিন্নতার কথা। ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মৌলিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে বাঁধা। সকলেই বংশ ও রক্তের দিক দিয়ে অভিন্ন। সকলেই আদমের বংশধর। মানুষের বংশ, বর্ণ ও রক্তভিত্তিক বিভিন্নতার সব চিন্তা ও মতবাদকে এ আয়াতটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে- তা প্রাচীন জাহিলিয়াত সৃষ্ট হোক কিংবা আধুনিক জাহিলিয়াত উদ্ভাবিত হোক- সবই মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।[৩৮] পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে, তা বাস্তব সত্য। কিন্তু এই পার্থক্যও নিতান্তই বাহ্যিক, এই পার্থক্য মানুষে মানুষে কোন মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে না। আল-কুর'আন এই পার্থক্যকে আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর অস্তিত্বের বাস্তব নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সমস্ত মানুষের বাক-শক্তি একই রূপ, মুখ ও জিহ্বার গঠন প্রকৃতিতে কোনই পার্থক্য নেই। মগজের মাত্রা ও গঠনেও নেই কোন পার্থক্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ভাষা এক নয়, বিভিন্ন। একই ভাষাভাষী অঞ্চলের শহর, গ্রাম ও জনপদের বুলিও এক নয়। উপরন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণ ও বাকরীতি পরস্পর থেকে ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্ত্বেও মানুষের মৌলিক একত্বে কোন পার্থক্য নেই। আল-কুর'আন এ সম্পর্কে বলে,

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

---

৩৬ আহমদ মোস্তফা আল-মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী* (বৈরুত: দারুল ইহইয়াউ আত-তুরাস আল-আরাবি, তা.বি), খ.২৬, পৃ. ১৪২

৩৭ আহমদ মোস্তফা আল-মারাগী, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ১৪২

৩৮ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার* (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ১১১

'তার আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে'।[৩৯]

মৌলিক অভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে বাহ্যিক বৈচিত্রকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে মর্যাদা ও অধিকারে পার্থক্য সৃষ্টি করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। অতএব ভাষা নিয়ে, বর্ণ নিয়ে গৌরব করা, ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে, বিভিন্ন গোত্র বর্ণ ধারকদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদের সৃষ্টি করার, এক ভাষাভাষীদের দ্বারা অন্য ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে, এক বর্ণের লোকদের পক্ষে অন্য বর্ণের লোকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার, তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চরম অমানুষিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪০] বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক সীমারেখা মানবতার সাম্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সাদা-কালো, ইংরেজ-বাঙ্গালী, চীনা-মালয়েশীয়, আমেরিকান-এশিয়াবাসী, আরব-অনারব-পৃথিবীর সকল মানুষই একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। জাতি-বর্ণ, ভাষা-ভৌগোলিক সীমার পার্থক্য এখানে একেবারে বিলীন হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'সকল মানুষই চিরুনীর শলাকার ন্যায় সমান। আরবের অনারবের উপর, সাদার কালোর উপর, পুরুষের নারীর উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্য তাঁর নিকট অধিক মর্যাদা রয়েছে'।[৪১]-

সমাজ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের মত ও আল-কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) সর্বপ্রথম সমাজ সম্পর্কে তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুকাদ্দমায় আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে লুইস হেনরি মর্গানের (১৮১৮-১৮৮১) ও জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী ফার্ডিনান্ড টনিজ (১৮৫৫-১৯৩৬) সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা ব্যক্ত করেন। এই তিনজন সমাজ বিজ্ঞানীর মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা আল কুর'আনের সুরা আন-নিসার ১ নং আয়াত ও সুরা আল-হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে মিলে যায়। নিম্নে উপরোক্ত দু'জন সমাজ বিজ্ঞানীদের মতামত তুলে ধরা হলঃ

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) আসাবিয়া (عَصَابِيَةٌ) প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। আসাবিয়ার অর্থ সংহতি (solidarity)। এই সংহতি বলতে ইবনে খালদুন বুঝেছেন গোষ্ঠী সংহতি (group solidarity) তথা সামাজিক সংহতি (social solidarity)। খালদুনের মতে সমাজের ভিত্তি হচ্ছে এই গোষ্ঠী সংহতি বা সামাজিক সংহতি। রক্ত, জাতি এবং ধর্ম সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সামাজিক সংহতি গড়ে উঠে।[৪২]

---

৩৯ আল-কুর'আন, আর-রূম, ৩০ : ২২
৪০ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলাম ও মানবাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯
৪১ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), *মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল* (কায়রো. ১৯৩০), খ. ৬, পৃ. ৪১১
৪২ ড. আনোয়ারুল উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজ বিজ্ঞান শব্দ*কোষ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৭৯

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফার্ডিনান্ড টনিজ (১৮৫৫-১৯৩৬) সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তার ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেন, অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করার ফলে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে নানারকম পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং তারা সম্প্রদায় গঠন করে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যক্তির পরিচয় তার পেশা বা বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। গোটা মানুষ হিসেবে তিনি পরিচিত।[৪৩] লুইস হেনরি মর্গানের (১৮১৮-১৮৮১) মতে, আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পরিবারকে রক্ত সম্পর্কযুক্ত বা consanguine family বলা হয়। তার মতে এটাই মানব সমাজে প্রথম ও আদি পরিবার।[৪৪]

সমাজ সম্পর্কে আল-কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি

গভীর অনুধ্যন নিয়ে গবেষণা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও এর চলমানতা ও গতিশীলতার মূলসূত্র সঞ্চিত রয়েছে সূরা আন- নিসার ১ম আয়াত ও সূরা আল-হুজরাতের ১৩ নং আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে। আয়াত দুটি পাশাপাশি একত্রে অধ্যয়ন করলে সমাজের উৎপত্তির মূল তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একক পরিবারের উপর ভিত্তি করে এই সমাজের ক্রমবিকাশের মূল সূত্র অর্ন্তনিহিত (implied) রয়েছে উপরে বর্ণিত আয়াত দুটির অন্তর্ভুক্ত দুটি শব্দগুচ্ছ যথাক্রমে 'تسائلون به' ও 'لِتَعَارَفُوا' এর মধ্যে। সূরা আন-নিসায় বর্ণিত 'تسائلون به' শব্দগুচ্ছে (phrase) যে বিষয়টি পরিস্ফুট (contemplated) হয়েছে তা এই যে, মানুষ তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য একে অপরের নিকট সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে, পরস্পরে বিভিন্ন চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। একে অপরের নিকট চাওয়া ও পাওয়ার ভিত্তি হল আত্মীয়তার বন্ধন। মূলত পারিবারিক বন্ধন থেকেই আত্মীয়তার বন্ধনের সৃষ্টি হয়, আত্মীয়তার বন্ধন হতে সৃষ্টি হয় সামাজিক বন্ধন। এরূপ বন্ধন সমূহের সূত্রপাত হয় একে অপরকে জানা -শোনার ও পারস্পরিক পরিচিতি লাভের মাধ্যমে।

সূরা আল-হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত 'لِتَعَارَفُوا' শব্দটি تَعَارَف শব্দ হতে উদ্ভূত। تَعَارَف (তা'য়ারুফ) শব্দটি تخالف (তাখালুফ) শব্দের বিপরীত। তাখালুফ শব্দের অর্থ হলো বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, ফলে تَعَارَف (তা'য়ারুফ) অর্থ ঐক্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি।[৪৫] পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার গুণটি মানুষের জন্মগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য (Inherent Trait)। এই স্বভাবজাত গুণটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমাজ গঠনের বীজ। সমাজ গঠনের এই বীজ হতে বর্তমান সুবিশাল বিশ্ব সমাজের আত্মপ্রকাশ।

---

৪৩ পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্বের রূপরেখা* (কলিকাতা: সেন্ট্রাল এডুকেশানাল এন্টারপ্রাইজ), ১৯৮৯, পৃ. ৫১
৪৪ সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯
৪৫ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুত্ তাফাসীর*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৩৬

উক্ত আয়াতে বিশ্বের সকল মানুষের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচিত হয়েছে একটিমাত্র সারগর্ভ বাক্যের মাধ্যমে। প্রায় ৭০০ শত কোটি মানুষের মূল উৎস এক ও অভিন্ন। তাদের সূচনা হয়েছিল এক পিতা আদম ও এক মাতা হাওয়া হতে। অতঃপর এই আদি পিতা-মাতার পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে একাধিক সন্তান-সন্ততি। এই সন্তানরাই আবার বৈধ বিবাহের মাধ্যমে অগণিত সন্তান জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে সুশোভিত ও প্রাণচঞ্চল করে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অগণিত আদম সন্তান নিজেদের পারস্পরিক বহুবিধ প্রয়োজনে একে অপরের সাথে ঐক্য গড়ে তোলে। تَعَارَف (তা'য়ারুফ)- এই সহজাত বৈশিষ্ট্যই আদম সন্তানদেরকে সমাজ গঠন ও এর চলমানতায় নিয়ামকের ভূমিকা রাখতে নিরন্তর সাহায্য করে চলেছে। পারস্পরিক চিন-পরিচয়ের প্রক্রিয়ায় তারা একে অপরের নিকট সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে। ফলে পরিবার কেন্দ্রিক আত্মীয়তার বন্ধন হতে জন্ম নিল বংশ, বংশ হতে গোত্র, গোত্র হতে জাতি। এটা কোন কাকতলীয় ব্যাপার নয়। বরং কাল হতে কালান্তরে যুগ হতে যুগান্তরে এই মানবধারা প্রকৃতির নিয়মে অগ্রসরমান। নিঃসন্দেহে আয়াত দুটির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে সমাজ সম্পর্কে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতামতের সাথে আল-কুর'আনের বক্তব্যের সাযুজ্য খুজেঁ পাওয়া যায়।

খিলাফতের দায়িত্ব পালনে মানব পরিবার

পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব পালনই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য। মানুষের অস্তিত্বের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। সেই চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, মানুষ তার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই আনুগত্য করবে এবং দাসত্ব করবে, অন্যকথায় এই বিশ্বে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বাস্তবায়িত করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

(হে রাসূল! আপনি স্বরণ করুন সেই সময়ের কথা) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই'।[৪৬] একই প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের অন্যত্র এসেছে,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন।'[৪৭]

---

৪৬ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ৩০
৪৭ আল-কুর'আন, আল-আন'আম, ৬ : ১৬৫

আলোচ্য দুটি আয়াত এই মহা সত্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে মানুষ মহান স্রষ্টার পক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা চান, পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ প্রয়োজন মতো পেয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যমত জীবন যাপন করবে এবং পরকালে অধিকারী হবে আল্লাহ তা'য়ালার নির্ধারিত স্থায়ী ও চিরকল্যাণময় জান্নাত। এই জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত হলো মানুষ আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা শরি'য়ত হিসেবে বিবেচিত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করবে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই জীবন বিধান তথা ইসলামী শরি'য়তের ভিত্তি হলো আসমানি কিতাব এবং নবী ও রাসূল। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

'অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে, তাদের কোন ভয় ভীতি ও দুশ্চিন্তা থাকবে না'।[৪৮] আয়াতে বর্ণিত 'হুদা' অর্থ নবী ও আসমানী কিতাব এবং 'তোমাদের নিকট' একথা বলে সকল আদম সন্তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৪৯] কোন কোন তাফসীরকারীদের মতে, 'আমার পক্ষ হতে যখন কোন হিদায়াত আসবে'- এই বাক্যের অর্থ রাসূল এবং আসমানি কিতাব।[৫০] আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত এই হিদায়াত ও জীবন বিধান নিয়ে পৃথিবীতে এলেন মানুষের প্রথম পরিবার। মাটির পৃথিবীতে তারা কার্যকর করতে থাকলেন প্রাকৃতিক ও খোদা প্রদত্ত বিধান। এই জীবন বিধানের ভিত্তিতে পথ চলাই হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান দ্বারা অপরকে পরিচালিত করাই হচ্ছে খিলাফত।

যেমন আল-কুর'আনে এসেছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জ্বিন ও মানুষ জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি'।[৫১] বস্তুত আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত শরি'য়ত অনুসারে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা সার্বভৌমত্বের নিকট মাথা নত করাই ইবাদত পালন ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মূল কথা। আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য বা গোলামীর স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হলে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা মানুষের জন্য অপরিহার্য।[৫২]

---

৪৮ আল-কুর'আন, আল- বাকারা, ২ : ৩৮
৪৯ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.), *তাফসীরে মাযহারী* (ইউপি : জাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৫
৫০ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৮
৫১ আল-কুর'আন, আল-যারিয়াত , ৫১ : ৪৯
৫২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ২২৪

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান দ্বারা অপরকে পরিচালিত করাই হচ্ছে খিলাফত। মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসারে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছার সার্বভৌমত্বের নিকট মাথা নত করাই ইবাদত পালন ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মূল কথা। বস্তুত আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য বা গোলামীর স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হলে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা মানুষের জন্য অপরিহার্য।[৫৩] আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত জীবন বিধান দ্বারা এই পৃথিবীর মানুষদেরকে পরিচালিত করা। এখানে ইবাদত অর্থ আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও দাসত্ব করা। খিলাফতের মৌল উদ্দেশ্য হল মানুষ প্রতিনিয়ত কর্মদক্ষতা দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিকাশ ও বর্ধন ঘটাবে। জীবনের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি আনয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্রষ্টার অনুগত থেকে তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে।[৫৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব সমাজের একমাত্র আদি প্রতিষ্ঠান পরিবার। এই পরিবার গঠনের একমাত্র সমাজ স্বীকৃত বৈধ মাধ্যম হল বৈধ বিবাহ। তাই ইসলাম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকেও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে এ পথে প্রবল ও দূরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করেছে। ইসলাম যৌন প্রবৃত্তি নিবারণের সকল প্রকার অবৈধ পথ বাধাগ্রস্ত করে দিয়ে অবাধ ও উন্মুক্ত করে দিয়েছে বৈধ ও পবিত্র পথ। এই বৈধ ও পবিত্র পথের নাম হচ্ছে বিবাহ। যেন মানুষ এই পবিত্র পরিচ্ছন্ন পথেই স্বীয় স্বাভাবিক যৌন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পাশাপাশি পরিবার গঠনের মাধ্যমে মানবীয় উচ্চতর মর্যাদা রক্ষা পায়। বিবাহ মানব সমাজের একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিবাহ ব্যক্তির জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, চিন্তাগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করে। বিবাহ মানব বংশধারার প্রবাহমানতাকে বেগবান রাখে। মানব বংশধারার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও এর বিকাশ বিবাহের মাধ্যমে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চললে সমাজ ও সভ্যতার চাকা সচল থাকে।

---

৫৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ২২৪
৫৪ প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে বিবাহ

ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলত আল-কুর'আন বিবাহ রীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী যদিও একই প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত তবুও ইসলামী আইনে স্বামী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন দুটি মানুষ এবং ভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুইজন নর-নারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দাম্পত্য জীবন শুরু করার এখতিয়ার দিয়েছে কে? আল্লাহ তা'য়ালার ঐশী ফরমানই প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর জন্য এই এখতিয়ারের পথ খুলে দিয়েছে। মহানবি (স.) এর ভাষ্য অনুযায়ী এই ঐশী ফরমান হল 'কালিমাতুল্লাহ' তথা আল্লাহর মহান বাণী। আল্লাহর বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালাকে সাক্ষী রেখে দুইজন ভিন্ন নর-নারী পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুজনে 'একজনে' পরিণত হয়ে পারিবারিক জীবনের সূচনা করেন। বাংলা ভাষায় একে ঘর করা, সংসার করা বা সংসার পাতা ইত্যাদি অভিধায় ব্যক্ত করা হয়। আল-কুর'আনে বিবাহ বন্ধনকে মিসাকান গালিজা (ميثاقا غليظا) অর্থাৎ সুদৃঢ় অঙ্গিকার বলে ঘোষণা করেছে। আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে বিবাহ বলতে কী বোঝায়- এর স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য আলোচ্য এই দুটি অভিব্যক্তি (conotation) বিশ্লেষণ করা অতি জরুরী।

'কালিমাতুল্লাহ' ও 'মিসাকান গালিজা' এর ব্যাখ্যা

আল- কুর'আন বিবাহিতা স্ত্রীদের সম্পর্কে বলে,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

'এবং বিবাহিতা স্ত্রী লোকেরা তাদের স্বামীদের নিকট থেকে শক্ত ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে'।[৫৫] আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে বিবাহ বন্ধন হচ্ছে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে আবদ্ধ হয়।[৫৬] যেমন মহান আল্লাহ নিজেই এ বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন এভাবে,

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

'তোমরা তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে ভালভাবে আবদ্ধ রাখ অথবা পরিত্যাগ করলে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ করো'।[৫৭] আলোচ্য আয়াতটি যদিও তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতটির নির্দেশনা স্বামী স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধন অটুট রাখার সীমারেখা সম্পর্কিত একটি নীতিমালা হিসেবে ইসলামী শরি'য়তে গণ্য হয়ে আসছে। ইসলামে বিয়ে এমন দৃঢ় প্রতিশ্রুতিরই বাস্তব অনুষ্ঠান, এ প্রতিশ্রুতি সহজে

---

৫৫ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ২১

৫৬ হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (র.), *তাফসীরে ইবনে কাসির* (অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২০১০), খ.৪, পৃ. ৩২৬

৫৭ আল-কুর'আন, আল বাকারা, ২ : ২৩১

ভাঙ্গার নয়। মানব বংশের ধারা বৃদ্ধির স্থায়িত্বের জন্যই বিয়ে করাকে এক অপরিহার্য কর্তব্য বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। বিবাহ ব্যতীত নারী পুরুষের যৌন মিলন নিষিদ্ধ বা হারাম, ইসলামে বিবাহ হচ্ছে নারী পুরুষের এক স্থায়ী বন্ধন। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মিলন এমন কোন ক্রীড়া নয়, যা দুদিন খেলা হলো, তারপর যে যার পথে চম্পট দিয়ে চলে গেল।[৫৮]

হযরত মুজাহিদ (র.) এর মতে বিবাহকে সুদৃঢ় মজবুত চুক্তি হিসেবে আলোচ্য আয়াতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৫৯] এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর বেঁধে দেয়া রীতি-পদ্ধতির উপর যে বৈবাহিক বন্ধন ও প্রতিশ্রুতি, যার মর্যাদাকে ছোট ও হেয় করে দেখা স্বামীদের উচিত নয়, তারা যেন এই পাকা প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।[৬০] এই অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতির প্রশ্নটি প্রতিজ্ঞা রক্ষার সাথে সম্পর্কিত। মহানবি (স.) বলেছেন,

عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم احق الشروط ان تو فوابه ماستحللتم به الفروج

'যত প্রকারের অঙ্গীকার করা হয়, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অবশ্য পালনীয় হচ্ছে সেটি যার ফলে তোমরা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ বলে বিবেচনা কর'।[৬১]

পরস্পরের প্রতি অবধারিত কর্তব্য প্রতিপালন করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে নব দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এর মাধ্যমে যে সকল পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব নির্ণীত হয় একেই ميثاقا غليظا (মিসাকান গালিজা) অর্থাৎ সুদৃঢ় অঙ্গীকার বলে। সূরা আর রুমের তৃতীয় রুকুতে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে এভাবে। আয়াতটি নিম্নরূপ:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি (নিদর্শন) এই যে, তিনি তোমাদের কল্যাণে তোমাদেরই সম-উপাদান হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পরস্পরের সাহচর্যে স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পার এবং এ জন্য তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ এবং করুণার সঞ্চার করে দিয়েছেন; নিশ্চয়ই এ বিষয়ে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে'।[৬২] এ আয়াতের নির্দেশনায় স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য ও দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে তা তিনি পালন করে চলবেন, এটাই হচ্ছে বিবাহের অঙ্গীকার।

---

৫৮ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৫৯ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৬৭
৬০ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৮৭
৬১ ইমাম আবুল হোসীন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহীহ মুসলিম* (ইউপিঃ মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), কিতাবুন নিকাহ, খ.১, পৃ. ৪৫৫
৬২ আল কুর'আন, আর-রূম, ৩০: ২১

প্রত্যেক বিবাহের খুতবায়, প্রথমে হামদ-না'ত, তারপর কালিমা শাহাদাত, তারপরেই কুর'আনের তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করে সর্বাগ্রে স্বামী ও স্ত্রীকে এ অঙ্গীকারের কথা নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। ইজাব-কবুল হয় তারপরেই।[৬৩]

সংসার ধর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক তরুণী নারী, নিজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের আদর সোহাগের চির অভ্যস্ত পরিবেশকে বিসর্জন দিয়ে, সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশকে সানন্দে অবলম্বন করে নেয় কিসের আশায়, কোন শক্তিমানের জামানতের (অভয়ের) উপর নির্ভর করে? সে জামানত (security) হচ্ছে আল-কুর'আনের প্রেম-প্রীতি ও আদর-অনুরাগ পাওয়ার আশ্বাস। তার রক্ষকবচ (safegurd) হচ্ছে, আল্লাহর কালিমা তথা, তাঁর বিধান বা ফরমান।[৬৪] 'তারা স্ত্রীরা তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে', আয়াতাংশে বর্ণিত এ অঙ্গীকার হল স্ত্রীরা স্বামীদের সাহচর্য ও শয্যায় স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের জন্য পুরুষদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা মহানবি (স.) এই বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন।[৬৫]

মহানবি (স.) বিদায় হজ্বে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে ভাষণে অন্য সব বক্তব্য শেষ করার পর উপসংহারে বলেন, 'অতঃপর নিজ স্ত্রীদের প্রতি আচার-ব্যবহারে তোমরা আল্লাহর (আদেশ-নিষেধ) সম্বন্ধে সদা সতর্ক হয়ে চলবে। সাবধান! তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীরূপে) গ্রহণ করেছ আল্লাহর আমানত অর্থাৎ Security বা জামানতে এবং তাদের সাথে তোমাদের সহবাস-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহর কালিমা বা ফরমান অনুসারে। তাদের উপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে তা হলো তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে না দেয়, যাদেরকে তোমরা সহ্য করতে পার না। যদি তারা এমন করে তবে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারো। তবে তা লঘু শাস্তি। আর তোমাদের উপর তাদের রয়েছে ন্যায়ভাবে খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার অধিকার'।[৬৬] আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত 'তাদের সাথে তোমাদের সহবাস-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহর কালিমা বা ফরমান অনুসারে'-অত্র বাক্যে আল্লাহর কালিমা পদটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন মনীষীগণের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ক. আল্লামা নবুবী (র.) বলেন, আল্লাহর কালেমা অর্থ কালিমাতুত তাওহীদ। তা হচ্ছে, لاإله إلاالله محمد رسول الله 'আল্লাহ ছাড়া ক্ষমতার মালিক কেউ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (স.)'। কেননা মুসলিম নারীর অমুসলিম কোন পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

---

৬৩ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৬৪ প্রাগুক্ত।

৬৫ শায়খ আহমাদ মোল্লাজিয়ুন, *তাফসীরে আহমাদি* (ইউপি : আল-মাকতাবাতু আশরাফিয়া, তা.বি) পৃ. ১৬৮

৬৬ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ, খ. ১, পৃ. ৩৯৭

খ. কারো মতে, আল্লাহর কালেমা অর্থ আল্লাহ তায়'লা যে নির্দেশনার মাধ্যমে নারীদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বৈধতা দিয়েছেন। সে নির্দেশনা হচ্ছে : فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء 'তোমরা নারীদের মধ্য হতে যাকে খুশি তাকে বিবাহ কর'।[৬৭]

গ. আল্লামা খাত্তাবীর মতে, আল্লাহর কালেমা অর্থ ইজাব ও কবুল অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাব ও তাতে সম্মতি। এর অর্থ হলো এই ইজাব কবুলের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশে পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।[৬৮] অর্থাৎ বিবাহের খুতবার সাক্ষ্য দ্বারা স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা।

আল কুরআনের অপর আয়াতে এই অঙ্গীকারকে ' عقدة النكاح , (উকদাতুন নিকাহ) বলা হয়েছে। যেমন আল-কুর'আনে এসেছে, وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ 'ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত (তালাকপ্রাপ্তা নারীর সাথে) তোমরা বিয়ের বন্ধনের সংকল্প করবে না'।[৬৯]

عقدة النكاح (উকদাতুন নিকাহ) এর অর্থ বিবাহের প্রতিজ্ঞা عقد। শব্দের ধাতুগত অর্থ বন্ধন, গ্রন্থি। العقدة এর আভিধানিক অর্থ শক্ত করা। যেমন আরবরা বলে, আমি রশিটিকে শক্ত করে বেঁধেছি। অতএব এর অর্থ সুদৃঢ় করা। কোন বস্তুর প্রান্তদ্বয়ের মাঝে মেলবন্ধন সূচিত হওয়া।[৭০] ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী বলেন, العقدة اسم لمايعقد من نكاح او يمين او عيرها অর্থাৎ পদটি আল- আক্বদাতু বিশেষ্য, যা বিবাহ, চুক্তি ইত্যাদি বিষয় দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।[৭১] যেমন আল-কুরআনে এসেছে, তোমরা فَانكِحُوا 'নিকাহ কর' পদের অর্থ স্বামী ও স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও।[৭২]

বৈবাহিক সম্পর্ক তাই ঐশী বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মিলন, ইসলামের অবশ্য পালনীয় বিধান। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবাহের পূর্ণ্য পদ্ধতি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে মানুষের সম্বন্ধ, মৈত্রি ও আত্মীয়তার বিস্তৃতি ঘটে। বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে দৃঢ়তা, স্থিতিশীলতা ও ঐকান্তিকতা ছিল নর-নারীর আদিম ও শাশ্বত ধারনা। পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হওয়ার অর্থই ছিল- তারা চিরন্তন দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। অতঃপর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ঐকান্তিকতার পরিবেশে চিরকাল তারা

---

৬৭ আল কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ৪

৬৮ ইমাম আবু জাকারিয়া ইহইয়া ইব্‌ন আশরাফ আন- নববী (র.), *শারহিল কামিল* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), খ.১, পৃ. ৩৯৭

৬৯ আল কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩৫

৭০ আবু বকর আল- জাস্‌সাস, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৯০৪

৭১ আবুল কাশেম আল-হোসাইন বিন মুহাম্মদ আল-মারূফ রাগেব ইস্ফাহানী, *আল-মুফরাদাত* (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, তা.বি) পৃ. ৫০৫

৭২ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

একজন অপরজনের হয়ে থাকবে। তারা হবে পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন, একজন অপরজনকে কখনো ত্যাগ করবে না। একজনের বিপদে অপরজন বিপন্নবোধ করবে। একজনের সুখে অপরজন অকৃত্রিমভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে এই ছিল তাদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি। এক কথায় তারা শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থতাই লিপ্ত হবে না; তারা হবে অচ্ছেদ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ।

বিবাহের আইনগত সংজ্ঞা

আল-কুর'আন, আল-হাদীস ও ফিকহ্ এর দৃষ্টিতে বিভিন্ন মণীষীগণ বিবাহের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলোঃ

এক. Mariage is an institution for the protection of society, and in order that human beings may guard themselves from foulness and unchastity.[৭৩]

অর্থাৎ 'সমাজের সুরক্ষার জন্য বিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাতে মানুষ নিজেদেরকে অশুচিতা থেকে রক্ষা করতে পারে'।

দুই. নিকাহ হলো দুটো সত্তার মাঝে মিলনের ও জোড় সৃষ্টি করা। বুরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর (র.)-এর মতে, 'নিকাহ' শব্দটি আকদ বা বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন অর্থে ব্যবহৃত ।[৭৪]

তিন. النكاح عقد يراد به على ملك المتعه قصدا

'বিবাহ হচ্ছে এমন একটি চুক্তি বা বন্ধন যার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ভোগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়'।[৭৫]

চার. الزواج عقد بين رجل و امراة تحل له شرعا غاية انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل

'স্বামী- স্ত্রীর মাঝে বিবাহ একটি চুক্তি বিশেষ যার দ্বারা স্ত্রী স্বামীর জন্য আইনসিদ্ধ ও বৈধ হয়। পাশাপাশি এটা উভয়ের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্য সফল করে'।[৭৬]

পাঁচ. ইমাম রাগেব ইসফাহানী এর মতে, 'নিকাহ' শব্দের আসল অর্থ বৈবাহিক চুক্তি, প্রচ্ছন্ন অর্থ হল স্ত্রী সঙ্গম। পবিত্র আল-কুর'আনে 'নিকাহ' শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যেমন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

---

৭৩ Syed Amir Ali, *Commentaris on Mohammadan Law* (Allahabad: Hind Publishing House, 2012), p.1287

৭৪ ইমাম বুরুহানুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-মুরগিনানী, *আল-হিদায়াহ* (ইউপি : আশরাফি বুক ডিপো, তা.বি.), খ.২, পৃ. ৩০৫

৭৫ মাহমুদ আন-নাসাফী, *আল- কানজুল দাকাইক* (দিল্লী : মুজতাবাই প্রেস, তা.বি), পৃ. ৯৭; আল-শায়খ নিজাম বুরহানপুরী, *ফতুয়া আলমগীরী* (দেওবন্দ, তা.বি), খ.২, পৃ. ১

৭৬ Dr. Tanzil-Ur- Rahman, *A Code of Muslim Personal Law* (Karachi : Hamdard Acdemy, 1978), Vol. 1, p.17

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ঈমানদার নারীদেরকে বিবাহ করবে এবং তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিবে, তখন তোমাদের দিক হতে তাদের কোন ইদ্দত পালন করার আবশ্যক হবে না, যা পূর্ণ করার জন্য তোমরা দাবি করতে পার'।[৭৭]

উদ্ধৃত আয়াতে 'নিকাহ' শব্দটি দ্বারা আকদ অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে ও পরিবার সম্পূর্ণ ফল। নারী নিজেকে বিয়ের জন্যে উপস্থাপিত করা এবং পুরুষ তা গ্রহণ করা- এই 'ঈজাব'ও 'কবুল' দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরই ফলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে দাম্পত্য জীবন যাপন শুরু করার সুযোগ লাভ করে থাকে। এরই ফলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতগুলো অধিকার নির্দিষ্ট হয়। দু'হাজার বছরের ধারাবাহিক ও ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা সত্বেও ইউরোপীয় সমাজ বিয়ে ও পরিবারকে অতখানি স্থান ও মর্যাদা দিতে পারেনি, যতখানি চৌদ্দশত বছর আগে ইসলাম দিয়েছে।[৭৮]

আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবন

বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবারিক জীবনের সূচনা হয়। মূলত বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন বিশ্ব প্রকৃতির এক স্বভাব সম্মত বিধান। এ এক চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থা যা কার্যকর বিশ্ব প্রকৃতির পরতে পরতে, প্রত্যেকটি জীব ও বস্তুর মধ্যে। আল-কুর'আনের ঘোষণা,

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'সুস্পষ্ট প্রশংসা তাঁরই যিনি প্রত্যেক অস্তিত্বের প্রতি-যুগল সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।'[৭৯] একই প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে এসেছে,

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

'মহান পবিত্র সেই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিলোকের সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন-উদ্ভিদ ও মানব জাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।'[৮০]

আয়াতে ব্যবহৃত 'زَوْجَيْنِ' শব্দটি দ্বিবচন। এর অর্থ যুগলই শুধু নয়- এমন যুগল যা পরস্পরের প্রতিক্রিয়াশীল বা বিপরীতধর্মী। আয়াত দু'টির সারমর্ম হচ্ছে- 'আমি সৃষ্ট সকল বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছি, পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতি-যুগলে এক নির্ধারিত পরিমাপের ভিত্তিতে।[৮১]

এই বিশ্ব প্রকৃতির চলমানতা ও গতিশীলতার মূল তত্ত্ব (Theory) উপরোক্ত আয়াত দুটির সারমর্ম থেকে প্রকাশ পেয়েছে। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা দুটি বিপরীতমুখী পারস্পরিক আকর্ষণ উন্মুখ প্রতিযুগল

---

৭৭ আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৪৯
৭৮ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), প্রাগুক্ত পৃ. ৮৬
৭৯ আল-কুর'আন, আয-যারিয়াত, ৫১ : ৪৯
৮০ আল-কুর'আন, আল-ইয়াছিন, ৩৬ : ৩৬
৮১ কাজী জাহান মিয়া, *কুর'আন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব*-২ (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭), পৃ. ২১০

পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। প্রত্যেকটি মানুষ- স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ তীব্র আকর্ষণ। এ আকর্ষণই স্ত্রী ও পুরুষকে বাধ্য করে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে, সম্মিলিত ও যৌন জীবন যাপন করতে। মানুষের অর্ন্তলোকে যে প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, দয়া- অনুগ্রহ, স্নেহ- বাৎসল্য ও সংবেদনশীলতা স্বাভাবিকভাবেই বিরাজমান, তার কার্যকারিতা ও বাস্তব রূপায়ন কেবল মাত্র বৈবাহিক তথা পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন গঠনের মাধ্যমেই সম্ভব।[৮২]

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে ইমাম গায্যালী (র.)-এর অভিমত

কাম প্রবৃত্তি কেবল চরিতার্থকরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং কাম প্রবৃত্তিকেই এই বিবাহ প্রথার স্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যাতে কাম প্রবৃত্তি স্ত্রী ও পুরুষ জাতিকে উত্তেজিত করে পরস্পরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করায়। এভাবে মানব বংশের প্রবৃদ্ধি হয়ে ধর্ম পথের পথিক উৎপন্ন হয় এবং ধর্মপথে চলে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে একমাত্র ধর্মপথে চলার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। এই মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[৮৩] এই আয়াত হতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'য়ালা আপন ধর্মের স্থায়িত্বের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই মানব বংশের স্থায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় এবং কাম্য।[৮৪]

আল কুর'আনে দাম্পত্য জীবনের রূপরেখা

একটি নর ও নারীর বিবাহ-সূত্রে একত্রিত হয়ে সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন যাপনকেই বলা হয় দাম্পত্য জীবন। দু'জন সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশ, ভিন্ন পরিবার ও পরিবেশের লোক, পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, একজনের নিকট অপরজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকারের। অনেক সময় এসব দিক দিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরাট পার্থক্যও হতে পারে-হয়ে থাকে। এ দুজনের মধ্যে পূর্ণ মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপন-দুজনকে 'একজনে' পরিণতকরণই হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য।

'যাওজ' শব্দটি পুরুষ নারী উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে–এর আসল অর্থ এমন একটি সংখ্যা যা এমন দুটো জিনিসের সমন্বয়ে রচিত ও গঠিত যেখানে সে দুটো জিনিসই একাকার হয়ে রয়েছে এবং বাহ্যত তারা দুটো হলেও মূলত ও প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একটিমাত্র জিনিসে পরিণত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী–উভয়ের জন্যে। ব্যবহার করা হচ্ছে

---

৮২ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৮৩ আল-কুর'আন, আল-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬

৮৪ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালি (র.), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত* (অনু. মাওলানা নুরুর রহমান, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ২০০২), খ.২, পৃ. ১৭

একথা বোঝাবার জন্য যে, স্বামী তার স্ত্রী সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অন্তরের গভীর একাত্মপূর্ণ ভাবধারা ও ভেদহীন কল্যাণ কামনার সাহায্যে একাকার হয়ে থাকবে, তা-ই হচ্ছে স্বাভাবিকতার ঐকান্তিক দাবি। তারা একাকার হবে এমনভাবে যে, একজন ঠিক অপরজনে পরিণত হবে।[৮৫]

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে দাম্পত্য জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আল-কুর'আনে ফুটে উঠেছে:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِين

ক) 'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেটা থেকেই তার সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তার নিকট থেকে শান্তি পায়। অতঃপর সে যখন তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করেছে এবং সেটা নিয়েই সে চলাফেরা করেছে। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে পড়লো, তখন তারা উভয়ে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রর্থনা করলো, আপনি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল সন্তান দান করেন, তবে আমরা আপনার শুকরিয়া আদায় করব'।[৮৬]

হযরত ইকরামার (রা.) এর অভিমত হল অত্র আয়াতের সম্বোধন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতে পুরুষের ছেয়ে ফেলা- এই আয়াতাংশের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং 'লঘু গর্ভধারণ' অর্থ গর্ভধারণের প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ। অর্থাৎ আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে একই ব্যক্তি থেকে, অর্থাৎ তার পিতা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই স্বজাতি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যখন তারা উভয়ে সংগত হয়েছে এবং গর্ভ প্রকাশ পেয়েছে ; আর উভয়ে সুস্থ সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছে এবং এমন সন্তান লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে; অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তেমনি সন্তান দানও করলেন; তখন তাদের অবস্থা এই হলো যে, কখনো তারা এ সন্তানকে প্রকৃতির দিকে সম্পৃক্ত করতে থাকে, যেমন- নাস্তিকদের অবস্থা; কখনো নক্ষত্ররাজির দিকে, যেমন- তারকা পূজারীদের প্রথা; কখনো মূর্তগুলোর দিকে, যেমন- মূর্তি পূজারীদের নিয়ম নীতি। আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন, 'তিনি তাদের উক্তসব শিরকের অনেক উর্ধ্বে'।[৮৭]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের আসল প্রকৃত পরিচয় সন্ধানের ও তার সৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রায়ন করেছেন। এখানে দাম্পত্য সম্পর্কের তিনটি বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত স্বামী-স্ত্রীর একত্রে অবস্থানের মূল কথা শান্তি-তৃপ্তি, ভালবাসা, স্থিতি ও আবাসন।

---

৮৫ আহমদ মোস্তফা আল-মারাগী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৯০

৮৬ আল-কুর'আন, আল-আ'রাফ, ৭ : ১৮৯

৮৭ সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, *তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, চট্টগ্রাম : গুলশান-ই-হাবীব ইসলাম কমপ্লেক্স, ২০১০), পৃ. ৩২২

দ্বিতীয়ত যখন 'সে তাকে ঢেকে ফেললো' এ বাক্যটিতে আবাসিক পরিবেশের সাথে সহবাসের চিত্রটির সমন্বয় সাধন ও কাজটিকে ভদ্র ও শালীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে করে তা দুটি দেহের নয় বরং দুটি হৃদয়ের মিলনরূপে প্রতীয়মান হয়। এখানে দাম্পত্য যুগলকে মানবীয় ভঙ্গি অবলম্বনের ও তাকে ঘৃণার পাশবিক ভঙ্গি এড়িয়ে চলার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে গর্ভধারণের প্রাথমিক অবস্থাকে 'লঘু' বলে চিত্রিত করা হয়েছে। তৃতীয় স্তরে বলা হয়েছে, অতঃপর যখন গর্ভ ভারী হয়ে উঠে তখন উভয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, 'তুমি যদি আমাদেরকে একটা উত্তম সন্তান দাও, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো'। এ পর্যায়ে এসে গর্ভ স্পষ্ট হয়ে যায়, তার প্রতি স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ের টান সৃষ্টি হয় এবং সন্তান যেন সুস্থ্য, নিখুঁত ও সৎরূপে গড়ে উঠে, এই আকাঙ্খা জন্মে। সন্তান গর্ভে থাকাকালে পিতা-মাতার মনে এরূপ আরো আনেক আকাঙ্খার সৃষ্টি হয় এজন্য তারা দোয়া করে যে, আমাদের একটা উত্তম সন্তান দিলে আপনার কৃতজ্ঞ থাকব। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে যখন একটা সুস্থ্য সন্তান দান করেন, তখন সন্তানের বিষয়ে আল্লাহর সাথে অন্যকেও শরীক করে ফেলে। আল্লাহ তাদের শিরক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এর উদ্দেশ্য পারিবারিক জীবনে এমন একটা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা মানুষের নতুন বংশধরদের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির সহায়ক, মূল্যবান মানবীয় ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণের অনুকূল এবং মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন এবং তাতে নতুন উপাদান সংযোজনের যোগ্যতায় নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা। কেবলমাত্র সাময়িক আনন্দ উপভোগের জন্য নয় কিংবা ভবিষ্যতে পার্থিব ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়।[৮৮] এই আয়াতে বিবাহের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বিধৃত। এত বলা হয়েছে যে, বিবাহের মাধ্যমে দম্পতি শান্তির সন্ধান পায়। নারী ও নর প্রকৃতিগতভাবে এমন স্বভাব নিয়ে জন্মেছে যে, তাদের পক্ষে একক জীবন-যাপন করা অশান্তিজনক। বিবাহের মাধ্যমে বাঞ্ছিত/ আকাঙ্খাকিত সন্তান লাভ হয় এবং মানবজীবন সুখময় হয়ে উঠে।

খ) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

'রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক স্বরূপ, আর তোমরা ভূষণ হচ্ছ তাদের জন্য। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন।

৮৮ সায়্যেদ কতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩১৮

অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর'।[৮৯] আল্লামা কারখী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন,

انه شبه كل واحد من الزو جين لاشتماله على صاحبه فى العناق والضم باللباس المشتمل على لا لبسه اى كالفراش واللحاف وحاصله انه تمثيل لصعوبة اجتنابهن وشدة ملابستهن- (جمل عن الكرخى)

'আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককে পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে উপমা দিয়েছেন, যেমন নাকি শয্যার সাথে লেপের সম্পর্ক, শয্যা ও লেপ একটি অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে, তদ্রুপ স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরে মিল-মহব্বত এবং অতি নৈকট্যপূর্ণ সর্ম্পকের কারণে পোশাকের মতই একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকে। অর্থাৎ তাদের পক্ষে একে অপরের সাথে কোনভাবেই দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। কারণ তারা উভয়ে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত'।[৯০]

ইবনে আরাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'পুরুষের জন্য স্ত্রীরা পরিচ্ছদ স্বরূপ, একজন অপর জনের নিকট খুব সহজেই মিলিত হতে পারে তার সাহায্যে নিজের লজ্জা ঢাকতে পারে, শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে'। তিনি আরো লিখেন, 'নারীরা যে পুরুষদেরই অর্ধাংশ কিংবা সহোদর এতে কোন সন্দেহ নেই'।[৯১]

আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর কেউ নিজেকে অপর জনের থেকে সম্পর্কহীন করে ও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। কেননা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক মিল-মিশ ও দেখা-সাক্ষাত খুব সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। প্রত্যেকেই অপরের সাহায্যে স্বীয় চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারে।[৯২] এ আয়াতে নারী ও পুরুষকে একই পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে এবং উভয়কেই উভয়ের জন্যে পোশাক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত 'লিবাস' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'লিবাস' মানে পোশাক, যা পরিধান করা হয়, যা মানুষের দেহাবয়ব আবৃত করে রাখে। স্ত্রী পুরুষকে পরস্পরের 'পোশাক' বলার তিনটি কারণ হতে পারে:

এক. যে জিনিস মানুষের দোষ ঢেকে দেয়, দোষ-ক্রুটি গোপন করে রাখে, দোষ প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই হচ্ছে পোশাক। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দোষ-ক্রুটি লুকিয়ে রাখে, কেউ কারো কোন প্রকারের দোষ দেখতে বা জানতে পারলে তার প্রচার বা প্রকাশ করে না– প্রকাশ হতে দেয় না। এজন্য একজনকে অন্যজনের পোশাক বলা হয়েছে।

---

৮৯ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ১৮৭

৯০ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি, *তাফসিরে জালালাইন*, (ইউপি: মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), পৃ. ২৭

৯১ আবু-বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুর'আন* (বৈরুত : দারুল ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া, তা.বি), খ.১, পৃ.৯০

৯২ ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাশ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৯০

দুই. স্বামী-স্ত্রী মিলন শয্যায় আবরণহীন অবস্থায় মিলিত হয়। তাদের দুজনকেই আবৃত রাখে মাত্র একখানা কাপড়। ফলে একজন অন্য জনের 'পোশাক' স্বরূপ দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে উভয়ের গভীর, নিবিড়তম ও দূরত্বহীন মিলনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

তিন. স্ত্রী স্বামী জন্য এবং স্বামী স্ত্রীর জন্য প্রশান্তি স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এবং তিনি তার (স্বামী) থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন যেন তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে মনের শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে'।[৯৩] স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এই অতি নৈকট্যের কারণে মনে হয় যেন তারা একে অপরের পরিচ্ছদ। পরিধেয় বস্ত্র যেমন শরীরাচ্ছাদনকে নিশ্চিত করে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে পরগামীতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই হাদীস শরিফে বলা হয়েছে, যে বিয়ে করলো, সে ইমানের দুই-তৃতীয়াংশ অর্জন করলো।[৯৪] বস্তুত নারী ও পুরুষ যেন একটি বৃক্ষমূল দুটি শাখা। এখানে পোশাক দ্বারা দৈহিক ও আত্মিক সত্তা একীভূতকরণ বুঝিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

هن سكن لكم و انتم سكن لهن

অর্থাৎ 'তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের অবলম্বন এবং তোমরা স্বামীরাও তাদের অবলম্বন'।[৯৫]

পোশাক যেমন করে মানবদেহকে আবৃত করে দেয়, তার নগ্নতা ও কুশ্রীতা প্রকাশ হতে দেয় না এবং সব রকমে ক্ষতি, শীত ও অপকারিতা হতে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্যে ঠিক তেমনি। কুর'আন মাজীদে পোশাকের প্রকৃতি বলে দেয়া হয়েছে এ ভাষায়,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, যা তোমাদরে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে'।[৯৬]

স্বামী-স্ত্রী দুজনই সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ঢাকবার ও যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি সাধনের বাহন। ইমাম রাগেবের ভাষায়, স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের জন্য পোশাকবৎ। কেউ কারো দোষ প্রকাশ হতে দেয় না- যেমন করে পোশাক লজ্জাস্থানকে প্রকাশ হতে দেয় না।[৯৭]

এখানে একত্ব অবিভাজ্যতা, অঙ্গাঙ্গী, ঘনিষ্ঠতা, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা এমন অনিন্দ্য প্রকৃতির যেন তারা একে অপরের সম্পূর্ণ পরিপূরক। একজনের অসম্পূর্ণতা অন্যজনে পূরণ করবে, অন্যজন সে একজনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলবে। উভয়ের মধ্যে থাকবে এক স্থায়ী নৈকট্য,

---

৯৩ আবুল কাশেম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ রাগেব ইস্ফাহানি, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৪১
৯৪ আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৮
৯৫ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী , প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১২২
৯৬ আল-কুর'আন, আল-আ'রাফ, ৭ : ২৬
৯৭ ইমাম রাগেব ইস্ফাহানি, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৪১

একমুখীতা, একাত্মত। উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হবে এক পরম গভীর নিবিড় সৌহার্দ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক। মানুষকে দুই লিঙ্গে বিভক্ত করে সৃষ্টি করার মূলে যে রহস্য, তা এখানেই নিহিত'।[৯৮]
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠপূর্ণ ও নৈকট্যপূর্ণ যে, তাদের দুই দেহ যেন এক দেহে লীন হয়ে একটি অভিন্ন বস্ত্রে আবৃত। কোন জগৎবিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক কিংবা সমাজ চিন্তক স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি বুঝাতে আল-কুর'আনের মত এত সুন্দর ও সুগভীর তাৎপর্যমণ্ডিত উপমা ব্যবহার করতে আজ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি।

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই

বৈরাগ্যবাদ, সন্নাসজীবন ও যৌন উদ্দমতার এই দু'য়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে বিবাহ। বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ব্যবস্থায় একটি অপূর্ব ঔদার্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের আবির্ভাবের বহুকাল পরেও কৌমার্য সভ্য সমাজের একটি অংশ প্রশংসনীয় মনে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সংসার ধর্মের প্রতি আসক্তি আছে, আছে ভোগস্পৃহা; এ কারণে ত্যাগী পুরুষের পক্ষে বিবাহ বাধা স্বরূপ। ইসলাম এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ইসলাম বলে যে সংসার করেনি সে পূর্ণতা পায়নি। যে পূর্ণ নয়, সে ত্যাগের মহিমা বুঝে না। সর্বোপরি, ইসলামের মতে কাম প্রবৃত্তি দমনে পূণ্য নেই, আছে তার উদ্দামতার সংযমে। আর সে সংযম সম্ভব বিবাহিত জীবনে। বিবাহ করাকে ইসলাম নারী-পুরুষের স্বভাব মনে করে। সুতরাং কৌমার্য ইসলাম সম্মত নয়।[৯৯]
মানব-মনের আবেগ-অনুভূতি, উত্তেজনা, বাসনা-কামনা মাত্রই পাপ- ইসলাম তা অনুমোদন করে না। বরং এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলীকে সৃজনশীল প্রবৃত্তি বলেই ইসলাম মনে করে এবং এদের যথার্থ প্রয়োগের নির্দেশ দেয়। সন্নাসব্রত আল্লাহ পছন্দ করেন না। এটা মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে বিরত রাখে এবং তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। পরিবার সমাজ ও বৃহত্তর মানবতার প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।[১০০]এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
'আমি নূহ ও ইব্রাহিমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাঁদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়্যাত ও গ্রন্থ। কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশ ছিল সত্যত্যাগী। অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম এবং মরিয়ম তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল

৯৮ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৯৯ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১০০ আবদুল খালেক, *নারী ও সমাজ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ১৭১

এবং তাদের অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। কিন্তু বৈরাগ্যবাদ এটাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি'।[১০১]

একবার কিছু সংখ্যক সাহাবী সারা রাতদিন ধরে ইবাদত করার, সারা রাত জেগে থেকে নামায পড়ার, সারা বছর ধরে রোযা রাখার এবং বিয়ে না করার সংকল্প গ্রহণ করেন। নবী করীম (স.) এসব কথা শুনতে পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগত স্বরে বলেন, اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَاوَاللهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلهِ وَاَتْقَاكُمْ لَه لكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ- فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ 'তোমরাই কি এই এই কথা বলেছিলে ? শোনো, আমি তোমাদের সবার চাইতে আল্লাহকে অধিক ভয় করি। রাতে নামায পড়ি, আবার ঘুমাই। আমি রোযা রাখি ও আবার ভাঙ্গিও। আর আমি বিয়ে শাদীও করেছি। এবং রমণীদের পাণিও গ্রহণ করি। এই হচ্ছে আমার নীতি -আদর্শ; যে ব্যক্তি আমার কর্মনীতি থেকে বিচ্যুত হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১০২]

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স.) বলেছেন, 'বিয়ে করা আমার আদর্শ ও স্থায়ী নীতি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না, সে আমার নয়'।[১০৩]

যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত যারা বিবাহ প্রথাকে অস্বীকার করে, তারা সমাজের পরজীবী, বিশ্বাস ঘাতক। কারণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতেই প্রতিটি মানুষ সে সমস্ত ধন সম্পদ ভোগ করে থাকে- যা সমাজের পূর্ববর্তীগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করে রেখেছে। শিশু উপযুক্ত হয়ে সমাজে যথাযথ অবদান রাখবে, এই আশায় সমাজ তাকে সবল করে তোলে। কিন্তু বড় হয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দাবি করে সে যদি বলে, আমি কেবল যৌন বাসনাই পূরণ করব, এর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বভার বহন করব না, তবে সে সমাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করল। এই দায়িত্ব পালনের জন্যই ইসলামের বিবাহ প্রথা।[১০৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমরা প্রেমময়ী, অধিক সন্তানসম্ভাবা নারীকে বিয়ে করবে। কারণ আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব'।[১০৫]

বিবাহের উদ্দেশ্য

আল-কুর'আনের উপস্থাপিত মানুষের ইতিহাস প্রথম নর-নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পারিবারিক জীবন যাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে, এ পারিবারিক জীবন যাপনও উদ্দেশ্যহীন নয়, লালসা সর্বস্ব

---

১০১ আল-কুর'আন, আল- হাদীদ, ৫৭ : ২৬-২৭

১০২ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৮৭২, খ.২, পৃ. ৭৫

১০৩ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ্ আল- কাযবীনী (র.), *ইবনে মাজা* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৮৪৬, খ.১, পৃ. ১৩৩

১০৪ আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

১০৫ ইমাম আবু-দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ২০৫০, খ. ১, পৃ. ২৮০

যৌন চর্চা নয়-বরং তার মূলে বৃহত্তর লক্ষ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদান, সন্তানদের লালন-পালন, তাদের এমনভাবে যোগ্য করে তোলা, যেন তারা ভবিষ্যত সমাজের নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। বিবাহের বহুবিধ উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

এক. বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য নৈতিক চরিত্র পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কুলুষমুক্ত রাখা। বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় যৌন স্পৃহা পূরণ করা যাবে না। উহুদ যুদ্ধের পর তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে সূরা আন-নিসা নাযিল হয়। একই সূরার ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে বৈধ বিবাহ ব্যতিত অন্যান্য পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আয়াত দুটি যথাক্রমে,

ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

'এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ, (অর্থাৎ যাদের স্বামী রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম) কিন্তু তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী তারা ব্যতীত। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের (মোহর) বিনিময়ে অন্বেষণ করবে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য। ব্যভিচারের জন্য নয়'।[১০৬]

খ) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিবাহ করবে, আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সমতুল্য। সুতরাং তাদের বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর নিয়ম অনুযায়ী দিয়ে দাও। এই হিসাবে যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এই হিসাবে নয় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত প্রণয়ণী'।[১০৭] উক্ত আয়াতে শরী'য়াত সমর্থিত পন্থা ব্যতিরেকে (অর্থাৎ মোহরানা ধার্য করা, সাক্ষী থাকা এবং বিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য না হওয়া ইত্যাদি) শুধু অর্থের বিনিময়ে যিনা, 'মুতআ' তথা খন্ডকালীন বিবাহ ইত্যদি সকল ধরনের অবৈধ পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 'মুহসিনিন' অর্থ

১০৬ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৪
১০৭ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৫

ব্যভিচার হতে মুক্ত পবিত্রা নারী, সতী-স্বাধী নারী। মুহসিনিন অর্থ সৎ থাকা, পাপমুক্ত থাকা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা). বলেন ‘আখদানুন’ শব্দটি ‘খিদনুন’ শব্দের বহুবচন। অর্থ নারী বন্ধু, প্রণয়ী যার সাথে গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় । কেননা মহান আল্লাহ প্রকাশ্য বা গোপনে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও ব্যভিচার পরিহার করতে নিষেধ করেছেন’।[১০৮] আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে ‘মোসাফেহীন’ শব্দটি ‘সিফাহুন’ ধাতু হতে উদ্ভূত। অর্থ নীচু ও ঢালু ভূমিতে পানি নিক্ষেপ করা। ব্যবহারিক অর্থে নারী ও পুরুষ যৌথভাবে মানবধারা অব্যাহত রাখবে। একটি জাতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সন্তান জন্ম দেয়া, তার প্রশিক্ষণ, লালন পালন এবং সংরক্ষণের মত কাজগুলো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা ঠিক যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, অথচ তা না করে তারা যৌন অবৈধভাবে স্বাদ আস্বাদন করবে এবং ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির কামনা বাসনা চারিতার্থ করবে এটা আল্লাহ তা'য়ালা চান না।[১০৯]

দুই. বংশ বিস্তার ও এর রক্ষণাবেক্ষণ : কুর'আন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবন যাপনের প্রধানতম উদ্দেশ্য সন্তান জন্ম দান। হযরত যাকারিয়া (আ.) মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করে ছিলেন তাকে একটি সন্তান দানের জন্য। বলেছিলেন, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ‘হে আমার রব, আমাকে তোমার নিকট থেকে একজন ওলী দাও, যে ইয়াকুব বংশধর থেকে আমার উত্তরাধিকারী হবে’।[১১০] এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বহু সংখ্যক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে নিম্নোক্ত।

ক. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

‘তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয়ের মধ্যে জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের জুড়িদের মধ্য থেকে তোমাদের দান করেছেন অনেক পুত্র ও পৌত্র এবং তোমাদের যুগল থেকে অসংখ্য পুত্র ও পৌত্রের বিস্তার ঘটিয়েছেন’।[১১১] আল্লামা আযহারী বলেন, ‘হাফদাহ’ অর্থ সন্তানের সন্তান। আভিধানিক অর্থে সেবক, সেবিকা এবং সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, সহযোগিতাকারী।[১১২] আলোচ্য

---

১০৮ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুত্ তাফাসীর*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৬৮
১০৯ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১০৯
১১০ আল-কুর'আন, আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৪
১১১ আল-কুর'আন, আন নমল, ২৭ : ৭২
১১২ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩০

আয়াতে সন্তান-সন্ততিদেরকে 'হাফদাহ্ নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে, যেহেতু তারা পিতৃ-পুরুষের সেবা-শুশ্রুষা করে এবং তাদের আনুগত্যে সদা তৎপর থাকে।[১১৩]

আল্লামা শাওকানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন যেন তোমরা অন্তরের গভীর সম্পক নিয়ে তার সাথে মিলিত হতে পারো। কেননা প্রত্যেক প্রজাতি তার স্বজাতির প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে, ভিন্ন প্রজাতি থেকে তার মন থাকে বিরূপ। মনের এ আকর্ষণের কারণেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন সম্পর্ক কার্যকর হয়, যার ফলে বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে, আর তাই হচ্ছে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য।[১১৪]

খ. বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। সন্তানাদি সম্পর্কে আল-কুর'আনে আরো বলা হয়েছে- الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন'।[১১৫] আল্লামা আলুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ধন-মাল হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।[১১৬]

গ. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের স্বজাতিদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও তাদেরই স্বজাতীয় জুড়ি বানিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন'।[১১৭] অত্র আয়াতে সংখ্যা বৃদ্ধি করেন অর্থ 'মহান আল্লাহ তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় বানিয়ে তোমাদের সংখ্যা বিপুল করেছেন। কেননা বংশ বৃদ্ধির এই হল মূল কারণ।[১১৮] হযরত মুজাহিদ (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাদেরকে বংশের পর বংশে ও যুগের পর যুগে ক্রমবর্ধিত করে সৃষ্টি করেছেন।[১১৯] বস্তুত সন্তান লালনের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনই হচ্ছে ইসলামের পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য এবং যে মিলন এ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়, তাই ইসলাম সম্মত মিলন।

---

১১৩ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

১১৪ আল্লামা শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭২

১১৫ আল-কুরআন, আল-কাহফ, ১৮: ৪২

১১৬ আল্লামা আবুল ফজল শিহাব উদ্দিন আস্ সাইয়্যেদ মাহমুদ আল-আলুসি, *তাফসীরে রুহুল মা'আনী* (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৫) খ. ১১, পৃ. ১৯

১১৭ আল-কুর'আন,আশ- শূরা, ৪২ : ১১

১১৮ ইমাম শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫১৩

১১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

ঘ. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও'।[১২০] এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বা যৌনতার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি ও বংশধারার স্থায়িত্ব। প্রথমত স্বামী-স্ত্রীর যৌন জীবনকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্রস্বরূপ'। বক্তব্যটি দৃষ্টান্তমূলক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে حَرْثٌ (হারসুন) শব্দের অর্থ জমিনে বীজ বপন করা এবং জমিনকে ফসলের উপযোগী করে তোলা। স্ত্রীদেরকে حرث (হারসুন) তথা শস্যক্ষেত্র অভিধায় অভিষিক্ত করার তাৎপর্য হচ্ছে, স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এমন চাষযোগ্য বস্তুর- যার উপর মানব বংশের সুরক্ষা ও স্থিতি নির্ভর করে, যেমন করে জমিনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এমন চাষযোগ্য বস্তুর, যার উপর ফসলের প্রজাতিক অস্তিত্ব রক্ষা নির্ভর করে।[১২১]

وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ ' আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, তা কামনা কর' আয়াতাংশের তাৎপর্য হল 'আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের ভাগ্যে যে সন্তান-সন্ততি নির্ধারণ করেছেন, স্ত্রী সম্ভোগের মাধ্যমে সেই নির্ধারণের অন্বেষী হও। 'আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, যে সন্তান সন্ততি রূহের জগতে সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেই সন্তান সন্ততি লাভে তোমরা সচেষ্ট হও। এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে স্ত্রী-সহবাস করে সন্তানাদি লাভের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), দাহ্হাক, মুজাহিদ প্রমুখ তাবেয়ী এ আয়াত থেকে এ অর্থই বুঝেছেন। আল্লামা আলুসী এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী সঙ্গমকারীর কর্তব্য হচ্ছে, সে বিয়ে ও যৌন ক্রিয়ার মূলে বংশ রক্ষাকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করবে, নিছক যৌন-লালসা পূরণ নয়। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রজাতীয় অস্তিত্বকে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যেমন আমাদের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আমাদের জৈব জীবন একটা সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য যৌন প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। যৌন স্পৃহা পূরণ তো নিম্নস্তরের পশু ছাড়া আর কারোর কাজ হতে পারে না'।[১২২]

---

১২০ আল-কুর'আন, আল-বাকারা ২ : ২২৩
১২১ আবুল কাশেম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ রাগেব ইস্ফাহানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১২২ আল্লামা আবুল ফজল শিহাব উদ্দিন আস্ সাইয়্যেদ মাহমুদ আল-আলুসি, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬৯

'তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের অধিক্ষেত্র স্বরূপ, অতএব, তোমরা তোমাদের অধিক্ষেত্রে গমন কর- যেভাবে তোমরা চাও-পছন্দ কর'। অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছে যৌন কামনা-বাসনা পরিপূর্ণ করার একমাত্র উৎস। এখানে বলা হয়েছে 'যেভাবে তোমরা চাও'- এটা বাধাহীন একমাত্র বৈধ পন্থা। স্ত্রী সহবাস, বংশ বিস্তার ও সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত, যার ফলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও ধর্ম শক্তিশালী হয়।[১২৩] এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ সন্তান। মুজাহিদ, দাহ্হাক, হাসান (র.) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এই ব্যাখ্যাই প্রদান করেন।[১২৪] যেভাবে ইচ্ছা করো অর্থ- বংশ বিস্তৃতির ইচ্ছা করো, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নয়।[১২৫]

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেন, 'আল-হারস' অর্থ ক্ষেত্র। আর ক্ষেত্র হচ্ছে চাষাবাদের স্থান। এর দ্বারা এখানে যৌন সঙ্গমের স্থান অর্থে ব্যবহৃত। স্ত্রীদের এজন্য ক্ষেত্র বলা হয়েছে যেহেতু তারা সন্তান উৎপাদনের কেন্দ্র স্থল। 'তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে আস যেমন করে তোমরা চাও'- এই উক্তি সঙ্গমকে মুবাহ করে দিয়েছে, যা স্ত্রী অঙ্গে হয়। কেননা আসলে 'চাষের স্থান' সেটাই। আল্লাহ প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী জাতিকে পুরুষদের কেবল 'বিহার কেন্দ্র' নয় বরং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও 'কৃষকের- ফসলের ক্ষেত্র' রূপী সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। মানব বংশের কৃষকেরদের মানবতার এই কৃষি ক্ষেত্রে শুধু মানব বংশের উৎপাদনের লক্ষেই গমন করা উচিত'।

ঙ. আল-কুর'আন মানব বংশধারার সংরক্ষণ ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব পরিগঠন করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

'তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম'।[১২৬]

মানুষে মানুষে সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক হয় দুই পদ্ধতিতে। রক্তগত ও বিবাহগত । ভাই-বোনের সম্বন্ধ রক্তগত। বিবাহগতভাবেও মানুষে মানুষে সম্পর্ক হতে পারে। স্ত্রী, শ্যালক, শ্যালিকা প্রভৃতি বিবাহগত পর্যায়ের সম্বন্ধ ।[১২৭] আয়াতে দাদা ও শ্বশুর- শাশুড়ী সম্পর্ক সৃষ্টির যে অসাধারণ কল্যাণের কথা ইঙ্গিতের মধ্যে আবৃত করে দেয়া হয়েছে, উভয় লিঙ্গও পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক ও আগ্রহপূর্ণ হতে হবে। এমন সম্পর্ক দুজনের মধ্যে থাকতে হবে, যার ফলে উভয়ই উভয়ের জন্যে সর্বদিক দিয়ে পরিপূরক হতে পারবে। একজনের অসম্পূর্ণতা অন্য জনে পূরণ করবে, অন্য জন সে একজনকে কানায়-কানায় পূর্ণ করে তুলবে। উভয়ের মধ্যে থাকবে এক স্থায়ী নৈকট্য, এই দুই ধারার আত্মীয়তার সম্পর্ক

---

১২৩ শায়েখ আহমাদ মোল্লাজিউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১২৪ আবু-বকর আল-জাসসাশ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৯২
১২৫ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবদী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১২৬ আল-কুর'আন, আল- ফুরকান, ২৫ : ৫৪
১২৭ গাজী শমছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

সৃষ্টির মধ্যে অসাধারণ কল্যাণকামিতা রয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালার অসীম কুদরতের প্রকাশ।[১২৮] তার চরম লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে দাদা-নানা-শ্বশুর-শাশুড়ীর আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠবে এবং যে ব্যক্তি-মানুষই জন্মগ্রহণ করবে তার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে অসংখ্য প্রকারের আত্মীয়তার সম্পর্কের জালে নিজেকে জড়িত দেখতে পায়, এর ফলে মানুষের সামষ্টিক জীবন, সুসংবদ্ধ জীবন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক জীবন গড়ে উঠে এবং নৈরাজ্যের পরিবর্তে জীবন পথের পথিকরা সুসংগঠিত এক-একটি অভিযাত্রীরূপে অগ্রগতি ও বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। মানুষকে দুই লিঙ্গে বিভক্ত করে সৃষ্টি করার মূলে যে রহস্য, তা এখানেই নিহিত।

তিন. নারী-পুরুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দাবি পূরন ও যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি ও স্থিতি বিধান বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আন বলে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতিদের মধ্যে থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। যেন তারা তাদের কাছে পরম শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পারে এবং তিনিই তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও দয়া অনুকম্পাও জাগিয়ে দিয়েছেন'।[১২৯] এ আয়াতে জুড়ি গ্রহণের বা বিয়ে করার উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হয়েছে, যেন তোমরা সে জুড়ির কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি ও গভীর শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পার। বক্তব্যটির তাৎপর্য, স্বামী-স্ত্রীর মনের গভীর পরিতৃপ্তি-শান্তি , স্বস্তি ও স্থিতি লাভ হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য। বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালবাসা জন্ম নিতে পেরেছে। আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা করে ইমাম আলূসী লিখেছেন, 'তোমাদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা শরি'য়তের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বিয়ের মাধ্যমে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম, প্রণয় এবং মায়া-মমতা, দরদ-সহানুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অথচ পূর্বে তোমাদের মাঝে না ছিল তেমন কোন পরিচয়, ছিল না নিকটাত্মীয় বা রক্ত-সম্পর্কের কারণে মনের কোনরূপ সূদৃঢ় সম্পর্ক'।[১৩০]

বিয়ের এই উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মনের পরম প্রশান্তি লাভই হচ্ছে বিয়ের প্রধানতম উদ্দেশ্য। আর এ বিয়েকে কুর'আন মজীদে 'প্রেম-ভালবাসার জীবন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত বিয়ের প্রকৃত বন্ধন হচ্ছে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন যা প্রকৃত প্রেমের অভাবে ছিন্ন হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। এ কারণে পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি ও তাকে স্থায়ী ও

১২৮ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১২৯ আল-কুর'আন, আর রূম-৩০ : ২০
১৩০ আল্লামা মাহমুদ আল-আলূসী, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৩১

গভীরতা দানের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।[১৩১] মানবীয় যৌন আবেগের ভিন্নতর এক দাবির দিকে আয়াতাংশ ইঙ্গিত করছে। আর তা হচ্ছে, যৌন সম্পর্ক স্থাপনে শান্তি- স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ। কেবল দেহকেন্দ্রিক (Biological) শান্তি-স্বস্তি ও তৃপ্তি যৌন সর্ম্পকের মূল নিয়ামক নয়। তা তো নিম্ন শ্রেণীর ইতর প্রাণীকুলের যৌন সম্পর্ক স্থাপনে থাকে বা আছে। এক্ষেত্রে পুরুষ যেমন বিশেষভাবে নারীর মুখাপেক্ষী, সেই পুরুষের প্রতি নারীর মুখাপেক্ষিতাও কিছুমাত্র সামান্য নয়। তবে পুরুষের মুখাপেক্ষিতা অধিক তীব্র। সম্ভবত সে কারণেই আল- কুর'আনে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে পুরুষকে বলা হয়েছে স্ত্রীর নিকট কাঙ্খিত শান্তি-স্বস্তি-তৃপ্তি লাভের কথা। এর বাস্তব কারণ রয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতিই পুরুষদের স্কন্ধে যে কঠিন ও দুর্বহ দায়িত্ব, কর্তব্য ও বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, তা হৃদয়াবেগে যে তীব্রতা, মন-মানসিকতায় যে অস্থিরতা এবং অনুভূতিতে যে প্রচণ্ড উন্মত্ততার সৃষ্টি করতে থাকে অবিরামভাবে, যার কারণে পুরুষ জীবনের গোটা পরিমণ্ডলকেই সাংঘাতিকভাবে প্রভাবান্বিত ও উদ্বেলিত করে।[১৩২] আল্লাহ তা'য়ালা মানসিক প্রশান্তির জন্য হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই স্বজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার থেকে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পার'।[১৩৩]

এখানে এ সত্যকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলেছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি, তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভের জন্য দাবি হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, দায়াদ্রতা, কল্যাণ কামনা, পরম বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা।

বিবাহের গুরুত্ব

বিবাহের মধ্যে যৌন সম্ভোগের একটি সুস্পষ্ট দিক আছে, কিন্তু বিবাহ সম্ভোগের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি করে। বিবাহিত দম্পতি লোকালয়ের মধ্যে আপন অধিকারে মিলিত জীবন-যাপন করে, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক সমাজের অপরাপর সদস্যদের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে অনুমোদিত হয়। বিবাহিত দম্পতি তাদের সন্তানকে যত্ন ও লালন দ্বারা বড় করেন। পরিবারের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।[১৩৪] বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আল-কুর'আন ঘোষণা করে,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

১৩১ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬৮
১৩২ প্রাগুক্ত।
১৩৩ আল-কুর'আন, আল- আ'রাফ, ৭ : ১৮০
১৩৪ গাজী শাসছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

'বিবাহ সম্পাদন করো। যারা তোমাদের মধ্যে রয়েছে একাকী (অর্থাৎ যার স্ত্রী নেই, কিংবা স্বামী নেই), আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, যোগ্য এবং উপযুক্ত তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন। কারণ, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাবিজ্ঞ'।[১৩৫]

আয়াতে উদ্ধৃত اَلأَيَامَى শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'আয়ামা' বলতে বোঝায় এমন নারীদের, যাদের স্বামী নেই এবং এমন পুরুষদের যাদের স্ত্রী নেই, একবার বিয়ে হওয়ার পর বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে এরূপ হোক কিংবা আদৌ বিয়েই না হওয়ার ফলে।[১৩৬]

সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশের অর্থ করা হয়েছে এ ভাষায়, 'হে মু'মিন লোকেরা! তোমাদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই, তাদের বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য তাদেরও।[১৩৭]

ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'এ আয়াতে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে। ইসলামের মনীষীদের মতে প্রত্যেক সামর্থবান ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব'।[১৩৮] এ শ্রেণীর মনীষীরা উপরোক্ত আয়াতের সমর্থনে যে হাদীস দ্বারা দলিল উপাস্থাপন করেছেন তা হচ্ছে , রাসূলে করীম (স.) যুবক বয়সের লোকদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, 'হে যুবক-যুবতীগণ! তোমাদের মধ্যে যারাই বিয়ের সামর্থবান হবে, তাদেরই বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে তাদের চোখ বিনত রাখবে, তাদের যৌন অঙ্গ পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখবে। আর যাদের সে সামর্থ্য নেই, তাদের রোযা রাখা কর্তব্য। তাহলে এই রোযা তাদের যৌন উত্তেজনা দমন করবে'।[১৩৯]

হাদীসে বর্ণিত 'যুবক-যুবতী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে, তার জবাবে ইমাম নববী লিখেছেন, যারা বালেগ- পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে এবং ত্রিশ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি, তারাই যুবক-যুবতী।[১৪০] এই যুবক-যুবতীদের বিয়ের জন্যে রাসূলে করীম (স.) গুরুত্ব প্রদান করলেন কেন, তার কারণ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন, 'হাদীসে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীদের বিয়ে করতে বলার কারণ এই যে, বৃদ্ধদের অপেক্ষা এই বয়সের লোকেদের মধ্যে বিয়ে করার ঝোঁক- প্রবণতা ও দাবি অনেক বেশী বর্তমান দেখা যায়। যুবক যুবতীর বিয়ে যৌন সম্ভোগের পক্ষে খুবই স্বাদপূর্ণ হয়, মুখের সুগন্ধি খুবই সুমিষ্ট হয়, দাম্পত্য জীবন যাপন খুবই সুখকর হয়, পারস্পরিক কথাবার্তা খুব আনন্দদায়ক হয়, দেখতে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, স্পর্শ খুব আরামদায়ক হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী তার জুড়ির চরিত্রে এমন কতগুলো গুণ

---

১৩৫ আল-কুর'আন, আন নূর, ২৪ : ৩২

১৩৬ হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (র.), *তাফসীরুল কুরআনুল আজিমি* (মিশর : মাকতাবাতুল ইলমে, ২০০৪), খ. ৪, পৃ.২৮

১৩৭ বদরুদ্দিন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আল-আইনি, *উমদাতুল ক্বারী* (বৈরুত : দার ইহইয়াউ আত-তুরাস আল-আরাবী, ২০০৩), খ. ২০, পৃ. ১২১

১৩৮ হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮

১৩৯ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল- বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৮৭৫, খ.২, পৃ. ৭৫৮

১৪০ মওলানা আব্দুর রহিম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

সৃষ্টি করতে পারে, যা খুবই পছন্দনীয় হয় আর এ বয়সের দাম্পত্য ব্যাপার প্রায়শই গোপন রাখা ভাল লাগে'।[১৪১] এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও, যেন তোমরা সংখ্যায় অধিক হতে পার। নিশ্চয় আমি কিয়ামত দিবসে তোমাদের সংখ্যাধিক্য হেতু অন্যান্য নবীর উম্মতের উপর গর্ব করব'।

আল-কুর'আন স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পকর্কে একে অপরের জন্য পরিচ্ছদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠপূর্ণ ও নৈকট্যপূর্ণ যে, তাদের দুই দেহ যেন এক দেহে লীন হয়ে একটি অভিন্ন বস্ত্রে আবৃত। কোন জগদ্বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক কিংবা সমাজ চিন্তক স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাতে আল-কুর'আনের মত এত সুন্দর ও সুগভীর তাৎপর্যমণ্ডিত উপমা ব্যবহার করতে আজ পর্যন্ত সক্ষম হয় নাই। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের বিকাশ ঘটে। এখানে স্বামী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, পিতা হিসেবে, মাতা হিসেবে যে রকম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয়, বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট প্রশিক্ষণ।

---

১৪১ বদরুদ্দিন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আল-আইনি, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৬৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুর'আনে একাধিক বিবাহ

ইসলাম পূর্ব যুগে বিবাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ছিলনা। বিত্তবান ব্যক্তিরা সে যুগে নিজেদের যৌন লালসা পূরণ করার জন্য অসংখ্য নারীকে স্ত্রী তথা দাসী করে রাখত। ইসলাম জাহিলিয়াতের সময়কালীন এই উচ্ছৃঙ্খল, নীতিজ্ঞান বিবর্জিত অসংখ্য নারীকে বিবাহ করার উপর একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে। আল-কুর'আন প্রকৃতপক্ষে একক বিবাহের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। যেহেতু ইসলাম একটি প্রগতিশীল চিরন্তন ধর্ম একমাত্র সেই কারণেই বিশেষ কিছু শর্ত সাপেক্ষে এবং কতিপয় পরিস্থিতিতে আল-কুর'আন সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত স্ত্রীর কথা বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। কেউ একের অধিক বিবাহ করতে চাইলে তাকে সকল স্ত্রীর সাথে আচার-ব্যবহার, ভরণ-পোষণ ও সহৃদয়তার ক্ষেত্রে অবশ্যই সমতা বিধান করতে হবে যা ইসলামে বহুবিবাহের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। কেউ যদি স্ত্রীদের মধ্যে এইরূপ সমতা বিধান করতে না পারে সে ক্ষেত্রে আল-কুর'আন তাকে শুধু একটি মাত্র বিবাহ করার জন্যই উপদেশ দেয়।

যুগে যুগে বহু বিবাহ

সাধারণভাবে প্রাচ্যের কিছু কিছু দেশ বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশের নাগরিকদের মাঝেই এই ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে বহু বিবাহ Polygamy প্রথা ইসলামই প্রবর্তন করেছে এবং ইসলামের মাধ্যমেই বহু বিবাহ প্রথার প্রসার ঘটেছে। এই অপপ্রচারের ফলে ইসলাম ও বহুবিবাহ সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস গভীরভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বহু বিবাহ প্রথা ইসলাম ধর্মে প্রবর্তনের বহু পূর্ব থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা ও সমাজের ভিতর প্রচলিত ছিল। 'Encyclopaedia Britanica' তে এই তথ্যের সমর্থনে বলা হয়েছে, ' As an instiution polygmay exists in all parts of the world'.[১৪২] প্রাচীন কালের সকল ধর্ম এবং বিভিন্ন দেশে বহুবিবাহ প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, আক্কাদীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতাসমূহে বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।[১৪৩] এমনিভাবে ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্মে এবং সমকালীন চীন, ভারত, আফ্রিকা, জার্মান, রোম, ফ্রান্স, ইরান, গ্রিস, ব্যাবিলীয়ন ও অষ্ট্রিয়াতে

---

১৪২ Daphne Baume & others edited, *Encyclopaedia Britanica, Inc.*(Chicago:14th Edition, 1988,) Vol. xiv, p.949

১৪৩ ডক্টর অতুল সুর, *ভারতের বিবাহের ইতিহাস* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিঃ, ১৩৮০), পৃ.৩২-৩৩ : Dr. Faraj Basmachi, *Treasures of the Iraq Museum* (Baghdad, Iraq: The Ministry of Information, 1975-1976), pp. 40-41

বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।[১৪৪] ইহুদি জাতিও বহুবিবাহ রীতিতে অভ্যস্ত ছিল। 'Old Testament' গ্রন্থেও বহু বিবাহ প্রথার স্বীকৃতির অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। জার্মানীর সংস্কারগণ যোড়ষ শতকে নিঃসন্তান কিংবা অনুরূপ কারণে প্রথম স্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন।[১৪৫]

প্রাচীন আরবে বহু বিবাহ

মহানবি (স.) এর আগমনের বহুকাল পূর্বে প্রাচ্যের জনগণের মাঝে বহুবিবাহ আইনসিদ্ধ ছিল এবং একইরূপে আরবদের মাঝেও। তৎকালীন আরবে একজন পুরুষ কতজন নারীকে বিবাহ করতে পারবে, তার কোন সীমা রেখা ও নিয়ন্ত্রন রেখা ছিল না। আল-কুর'আন আরবের এই প্রাচীন বহু বিবাহ প্রথাকে কেবল সীমিত করেছে। এ প্রসঙ্গে Robert Roberts এর উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বলেন, 'And is fairness to Muhammad it must be said that he limited rather than introduced the prartice among the Arab'.[১৪৬] অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি সত্য উচ্চারণে বলা যায় যে, তিনি আরবদের মাঝে বহু বিবাহ প্রথা চর্চাকে কেবল সীমিত করেছেন, তিনি কোনভাবেই এটি প্রবর্তন করেননি।

আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে একাধিক বিবাহ

ইসলামের দৃষ্টিতে নর-নারী নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য পারিবারিক জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে যেমন বিয়ে করার আদেশ করা হয়েছে, তেমনি বিশেষ কোন কারণে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লে, একাধিক বিবাহের অনুমতি তাকে দেয়া হয়েছে। আল-কুর'আনের সূরা আন-নিসার ৩নং আয়াতে বহু বিবাহের আইন জারী করা হয়। এই আইনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে শেষ সীমা চার-এ স্থিরীকৃত করা হয়। ফলে বর্তমানে একজন পুরুষের জন্য চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম।

একাধিক বিবাহ আইনের প্রেক্ষাপট

সূরা আন-নিসা নাজিল হয়েছে এমন প্রেক্ষাপটে, যখন শত্রুর অনবরত আক্রমন হতে রক্ষা পেতে মুসলিমগণ সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষত ওহুদের যুদ্ধের ফলে বহু যোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন, বহু নারী স্বামীহারা ও বহু শিশু সন্তান পিতৃহারা হয়েছিলেন। এই উদ্বৃত্ত ব্যবস্থা বিধবা নারীদের পুনর্বাসনকল্পে ও

---

১৪৪ Fida Hussain Malik: *Wives of the prophet* (Lahore: Shaiks Ghulam Ali & Sons, 1952), p.64-65

১৪৫ Robert Roberts, *The social Laws of the Quran* (New Delhi: kitab Bhavan,1977), p.8

১৪৬ Robert Roberts, Ibid, p.8

এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) সীমিত বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। কুর'আন মজীদে এই সম্পর্কে যে আয়াতটি রয়েছে তা হচ্ছে এই যে,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

'যদি তোমাদের এ ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা এতিম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনোপুত হয় তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। অতঃপর যদি তোমাদের এই আশঙ্কা থাকে যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা'।[১৪৭]

আয়াতের শানে নুযূল

হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশাকে (রা.) 'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না' এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'হে আমার বোনের ছেলে (ভাগ্নে)! এটা ঐ পিতৃহীনা বালিকা যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার ধন-সম্পদে ঐ পিতৃহীনা বালিকার অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার সম্পদ ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্যত্র বালিকাটির বিয়ে হলে যতটা মোহর ইত্যাদি পেত ততটা সে দেয় না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা ঐ সকল অভিভাবককে পিতৃহীনা বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের মহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতি অনুসরণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তাদের পছন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওরওয়া (রা.) বলেন, আয়েশা (রা.) আরো বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে জানতে চাইলে মহান আল্লাহ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء (লোকেরা তোমাকে নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করে) আয়াত নাযিল করেন। আয়েশা (রা.) বলেন, পরবর্তী আয়াত وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ (যাদেরকে বিয়ে করা তোমরা পছন্দ করবে) এর অর্থ হল, কোন এতিম মেয়ের অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবন কম থাকার দরুন কারো এতিম মেয়েদের বিবাহ করতে অপছন্দ হলে তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবনবতী এতিমদেরকে পছন্দ হলেও বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবন না থাকার কারণে অপছন্দনীয় হলেও যদি ইনসাফের ভিত্তিতে মোহরানা দেয়া হয়, তা হলে বিয়ে করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।[১৪৮]

এটা স্পষ্ট যে, উপরোক্ত আয়াতের দুটি অংশে সম্পর্ক রয়েছে। এতিমদের প্রতি ন্যায্য কর্মে অপারগতা

১৪৭ আল-কুর'আন,আন-নিসা, ৪ : ৩
১৪৮ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল আল- বুখারী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৩৮৮, খ.২, পৃ. ৬৫৮

এবং এ সম্পর্কে অপারগতার প্রতিকারে একাধিক বিবাহ। এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে সূরার পরের অংশে এই আয়াতের প্রতি নির্দেশ দিয়ে,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

'(হে নবী) তারা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে বিধান জানতে চায়, আপনি (তাদের) বলে দিন, 'আল্লাহ তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, যা এই কিতাবে তোমাদের শুনানো হয়, এতিম নারী সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ (নিজেদের প্রয়োজনে) তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও এবং শিশুদের সম্পর্কে। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যেন এতিমদের সাথে তোমরা সুবিচার কর। তোমরা (যেখানেই) যেটুকু সৎকাজ কর, আল্লাহ তা'য়ালা তার সবকিছু সম্পর্কেই সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন '।[১৪৯]

এই দুটি আয়াত একত্রে পাঠ করলে দেখা যায় যে, যখন একজন বিধবা নারী এতিম সন্তানসহ অবহেলায় অনাদরে মৃত স্বামীর ভাইয়ের ঘরে অবস্থান করত, সেও তার সন্তানগণ উত্তরাধিকারের অংশও পেত না, অথচ লোকে উক্ত বিধবা নারীকে সেও তার সন্তানদের বিবাহ করে ভার গ্রহণেও রাজি ছিল না। এদের দুর্দশা দূর করতে মহানবি (স.) দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, বিধবা ও এতিম সন্তানগণকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হল, তারপর সীমিত বহু বিবাহের অনুমতি দানের মাধ্যমে বিধবার আশ্রয়ের ব্যবস্থা প্রদান করা হল।[১৫০]

কুর'আন ও হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনা মতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এতিম যুবতীদের সাথে জাহেলী যুগে খুবই দুর্ব্যবহার করা হত। এসব এতিম মেয়েদের সাথে সমাজপতিরা লালসা চরিতার্থ করত। ব্যভিচার করত, তাদেরকে ধোঁকা দিত বা প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করত। লালসা ছিল তাদের সম্পদ ভক্ষণ করার প্রতি এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মোহর থেকে বঞ্চিত করত। এসব পিতৃহীনা নারীরা বিত্তবান ও সুশ্রী চেহারায় অধিকারী হলে তাদেরকে বিয়ে করে তাদের নির্ধারিত উত্তরাধিকার ও মোহরানা উভয়টি হতে বঞ্চিত করত। আর যদি সুশ্রী ও সুন্দরী না হয়ে শুধু বিত্তবান হত, সেক্ষেত্রে অন্য কেউ তাদের সম্পদের মালিক হয়ে যাবে বলে তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে দিত না, কিন্তু নিজেরা বিয়ে ছাড়াই তাদের ভোগ বিলাস করত।[১৫১]

---

১৪৯ আল-কুর'আন,আন-নিসা, ৪ : ১২৭
১৫০ মৌলানা মুহাম্মদ আলী, *মহানবীর অমর সত্য* (অনু. মাহমুদ হায়দার, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৯), পৃ. ১৫২
১৫১ সায়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৩৫

চারজন স্ত্রী একসাথে রাখার বৈধতা

আয়াতে বর্ণিত فَانكِحُواْ বিয়ে কর, শব্দের কারণে যদিও বাহ্যত আদেশ বোঝায়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি প্রদান, সে জন্য আদেশ দেয়া নয় এবং তা করা ওয়াজিব কিংবা ফরজও নয় বরং তা অনুমতি মাত্র। অতএব তা জায়েয বা মুবাহ বৈ আর কিছু নয়। বিভিন্ন যুগের তাফসীরকার ও মুজতাহিদগণ এ মতই প্রকাশ করেছেন এবং এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত মনীষীদের মধ্যে কোন দ্বিমত দেখা দেয়নি।[১৫২] এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, চারজনের অধিক স্ত্রী এক সময়ে ও এক সঙ্গে গ্রহণ করা হারাম।[১৫৩] সমস্ত ইমাম ও সমস্ত মুসলিমের মতে চারজনের অধিক নারীকে বিয়ে করা বৈধ নয়।[১৫৪]

مَا অক্ষরের কারণে আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে। প্রথমত নারীদের মধ্য থেকে দুই, তিন, চার যে বা যত সংখ্যাই তোমার জন্যে ভাল হয়, তত সংখ্যক নারীই তুমি বিয়ে কর। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মেয়েলোকদের মধ্য থেকে যে যে মেয়ে তোমার জন্যে ভাল বোধ হয় তাকে বিয়ে কর, তারা দুজন হোক, তিনজন হোক, আর চারজনই হোক না কেন।[১৫৫]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা একজন পুরুষের একসাথে একই সময়ে চারজন নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আয়াতে 'فانكحواماطاب لكم' শর্তটি ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ ভাল লাগা, পছন্দ হওয়া, মনঃপুত হওয়া। দাহ্হাক, হাসান বসরী (র.) ও অন্যান মনীষীগণ বলেন, অত্র আয়াতে কারিমার মাধ্যমে জাহেলী যুগের ঐ কুপ্রথাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, যে প্রথায় একজন পুরুষ যত খুশি সংখ্যক স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে পারত আলোচ্য আয়াত দ্বারা এই সংখ্যা চারে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের এবং ইবনে মালেক (র.) প্রমুখ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'ماحل لكم' শব্দ দ্বারা অর্থাৎ যেসব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক মুফাস্সিরিন (আল-কুরআনের ব্যাখ্যাকার) উপরোক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতভাবে তোমাদের মনঃপুত এবং শরি'য়তের দৃষ্টিকোণ হতে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।[১৫৬]

---

১৫২ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কাশেমী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১১০৪
১৫৩ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৫ ; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, খ.২, পৃ. ৮৯
১৫৪ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২
১৫৫ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কাশেমী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১১০৪
১৫৬ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২২

কোন কোন মুফাস্সির আলোচ্য আয়াতটির অর্থ লিখেন, রূপ, সৌন্দর্য কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা কল্যাণের দৃষ্টিতে যে যে মেয়ে তোমাদের নিজেদের পক্ষে ভাল বোধ হবে তাদের বিয়ে কর।[১৫৭] আলোচিত আয়াতটি কেবল বিবাহ হালাল হওয়ার ব্যপারে অবতীর্ণ হয়নি বরং অবতীর্ণ হয়েছে বিবাহের সংখ্যা নিরূপণ প্রসঙ্গে। বিবাহ হালাল হওয়ার বিষয়টি অন্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর বক্ষমান আয়াতটি কেবল সংখ্যা নিরূপক।[১৫৮]

স্বাধীনা নারীদের মধ্য হতে 'চার' সীমারেখা পর্যন্ত বিবাহ করার বৈধতা অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। পাশাপাশি যদি একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমতা রক্ষা না করার আশঙ্কা থাকে তাহলে একসাথে কেবলমাত্র একজন স্ত্রীকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা ইসলামী শরি'য়ত ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে।[১৫৯]

অতএব, উক্ত আয়াতে কারিমা হতে এটা প্রমাণিত যে, বহু বিবাহ প্রথা তথা চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বর্তমান সভ্যতায় যতই দূষনীয় ও কলংকের কাজ হোক না কেন, আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে এ কাজ যে একেবারে ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ ছিল না তাতে কোনই সন্দেহ নেই। বিশেষত যে সব পুরুষ একজনমাত্র স্ত্রী দ্বারা নিজের চরিত্রকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারে না, যৌন শক্তির প্রাবল্য পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হতে ও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে যাদের বাধ্য করে, তাদের পক্ষে একাধিক স্ত্রী দুজন থেকে প্রয়োজনানুপাতে চারজন পর্যন্ত গ্রহণ করা যে কর্তব্য তাতে কোনই সন্দেহ থাকে না। এ ধরনের ব্যক্তিদের পক্ষে এ কেবল অনুমতিই নয়, এ হচ্ছে সুস্পষ্ট আদেশ। মূলত, ইসলামের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণ মানবিক ও নৈতিক ব্যবস্থা।[১৬০] উপরন্তু এটা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। ইসলাম ঠিক যে কারণে বিয়ে করার অনুমতি বা নির্দেশ দিয়েছে, ঠিক সেই একই কারণে একাধিক (চারজন পর্যন্ত) স্ত্রী গ্রহণের ও অনুমতি দিয়েছে।[১৬১]

একসাথে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের এ অনুমতিটি পূর্বাপর অনুসারে যদিও এতিম মেয়েদের বিয়ে করে তাদের সাথে 'আদল' তথা ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে না পারার আশঙ্কার উপর শর্তাধীন, তবুও সমস্ত মুসলিম মনীষীদের মতে এক সময়ে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি সকলের জন্যই প্রযোজ্য এমনকি এতিম বিয়ে করে তাদের প্রতি সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা বা ভয় যাদের নেই তারাও একসাথে যে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে।[১৬২]

মহানবি (স.) স্বয়ং এ আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর গায়লান বিন

---

১৫৭ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কাশেমী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১১০৪
১৫৮ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩২
১৫৯ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ. ৩৪২
১৬০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২২১
১৬১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
১৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

আসলামা সাকাফী নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার দশ জন স্ত্রী ছিল, যাদের তিনি জাহেলি যুগে বিয়ে করেছিলেন। তার স্ত্রীরাও তার সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। মহানবি (স.) তাকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন এ দশ জন স্ত্রীর মধ্য থেকে যে কোন চার জনকে রেখে বাকী সবাইকে তালাক দিয়ে দেয়। গায়লান বিন আসলামা সাকাফী রসূল (স.) এর নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন। অর্থাৎ, চারজন রেখে আর সবাইকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিলেন।[১৬৩] উক্ত হাদীসটি ইবনে মাজাহ্‌তে এসেছে এভাবে,

عن ابن عمر قال اسلم غيلان بن سلمة و تحته عشر نسوة فقال له النبى صلى الله عليه اختر منهن اربعا

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, গায়লান ইবনে সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন দশ স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে রেখে দাও।[১৬৪]

কায়েস ইবনুল হারিস আসাদী (রা.) বলেন, আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন আমার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল আট। আমি ব্যাপারটি মহানবি (সা.) এর গোচরীভূত করলাম। তিনি আমাকে চার জন স্ত্রী রেখে বাকী সবাইকে বিদায় করে দিতে বললেন।[১৬৫]

উপরোক্ত হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য এবং তা হচ্ছে এই যে, আল-কুর'আনের এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর রাসূলে করিম (স.) তা থেকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী এক সাথে ও এক সময়ে রাখা জায়েয তার অধিক নয়- এ কথায় বুঝতে পেরেছেন এবং তিনি ঠিক সেই অনুযায়ী চারজনের অধিক স্ত্রী না রাখার নির্দেশ ও কার্যকরভাবে জারি করেছেন।[১৬৬] হাদীসের এসব বর্ণনা দ্বারাও এ বিষয়টি অর্থাৎ চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধকরণের কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ মনীষীগণ উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, পুরুষের জন্য একসাথে চারটির বেশি বিয়ে করা নিষেধ। এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুতরাং একসাথে চার সংখ্যার বেশী নারীকে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করার অনুমোদন থাকলে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই আলোচ্য আয়াতে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন।[১৬৭] Robert Roberts এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, বৈধ স্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে পবিত্র আল-কুর'আনে কেবলমাত্র একটি আয়াতের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।[১৬৮]

---

১৬৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ৩২২; ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১১২৮

১৬৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ আল- কাযবীনী, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৯৫৩

১৬৫ প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৯৫২

১৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১৬৭ হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৭৯

১৬৮ Robert Roberts, Ibid, p.7

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী লিখেন, আল-কুর'আনের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা চারজনের অধিক স্ত্রী একসাথে গ্রহণ বৈধ নয় বলে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় না, তবে হাদিসের ভিত্তিতে তা অবশ্যই প্রমাণিত হয়। বিশেষত সমস্ত মুসলিম সমাজই যখন এ সম্পর্কে একমত।[১৬৯]

একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান

আল-কুর'আনের যে আয়াতে একাধিক বিয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, তাতে এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শর্তটি হচ্ছে একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' বা সমতার বিধান সুনিশ্চিত করা। তাই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান সম্পর্কিত আইনটি বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

একাধিক বিয়ের অনুমোদন সম্পর্কিত আয়াতটি বিশ্লেষণের পূর্বে আয়াতটির পুনোরোল্লেখ করা প্রয়োজন।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

'যদি তোমাদের এ ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা এতিম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনঃপুত হয় তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। অতঃপর যদি তোমাদের এই আশঙ্কা থাকে যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা'।[১৭০]

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আয়াতে পর পর দুটো বিষয়ে, 'তোমরা যদি আশংকা কর' বলা হয়েছে। প্রথম এতিম মেয়েদের বিয়ে করে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারা সম্পর্কে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে এক সঙ্গে দুই, তিন বা চার জন স্ত্রী গ্রহণ করে তাদের প্রতি সুবিচার করতে না পারা সম্পর্কে।

জাহেলি যুগে নিজেদের কাছে পালিতা এতিম মেয়েদের ধনমাল কিংবা রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্যের কারণে বিয়ে করে লোকেরা তাদের প্রতি মোটেই ইনসাফ করত না, ভাল ব্যবহার করত না, স্ত্রীত্বের অধিকার দিত না। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলে দিলেন, এতিম মেয়েদের বিয়ে করে তাদের প্রতি তোমরা অবিচার করার চেয়ে বরং এতিম মেয়ে ভিন্ন অন্যান্য মেয়েদের বিয়ে করো। তাহলে তাদেরকে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা-দান তোমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে না। এগুলো ইসলামের এক মূল্যবান সমাজ

---

১৬৯ মওলানা আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
১৭০ আল-কুর'আন,আন-নিসা, ৪ : ২

সংশোধনী নির্দেশ।[১৭১]

জাহেলি যুগের লোকেরা এতিমদের প্রতি অবিচার করার আশংকায় তাদের অভিভাবক হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় করত, কিন্তু ব্যাভিচারের কোন তোয়াক্কাই করত না। তাদেরকে বলা হয়েছে যদি তোমরা অবিচার করার আশংকায় এতিমদের অভিভাবক হওয়া থেকে বিরত থাক তবে ব্যভিচারেরও ভয় কর এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হালাল তাদেরকে বিবাহ কর এবং হারামের নিকট যেওনা।

হযরত ইকরামা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ বংশীয় লোকেরা দশজন অথবা তারচেয়ে বেশি স্ত্রী বিবাহ করত। এ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, আপন সামর্থ্য দেখে নাও এবং চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ করো না। যাতে তোমাদের এতিমদের ধন-সম্পদ খরচ করার প্রয়োজন না হয়।[১৭২]

আয়াতে উল্লিখিত 'আদল' শব্দের তাৎপর্য অনুধাবনীয়। আল্লামা রাগেব ইসফাহানী লিখেছেন, 'আদল' অর্থ সুবিচার, ইনসাফ, সমতা, সাম্য রক্ষা করা এবং আদল হল সমানভাবে ও হারে বা পরিমাণে অংশ ভাগ করে দেয়া। 'আর তোমরা যদি ভয় পাও যে, স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' করতে পারবে না' এর অর্থ- সেই আদল ও ইনসাফ যা স্ত্রীদের মধ্যে রাত বন্টন ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের ব্যাপারে স্বামীকে দায়িত্ব পালন করতে হয়।[১৭৩]

আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখেছেন, এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রীদের মাঝে রাত ভাগ করে দেয়া ও বিয়ের অধিকারসমূহ সমূহ আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা, সমভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্য আদায় করা। আর এ হচ্ছে ফরয।[১৭৪]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী লিখেন, 'ইসলাম একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে এ শর্তে যে, ব্যক্তির নিজের দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে, সে তার স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ সুবিচার রক্ষা করতে পারবে। খাওয়া, পরা, রাত যাপন করা ও ব্যয়ভার বহনের দিক দিয়ে। যে লোক স্ত্রীদের প্রতি এ সকল অত্যাবশ্যকীয় সুবিচার আদায়ের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী নয় তার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল-কুর'আন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যদি তোমরা সেই সুবিচার করতে পারবে না বলে ভয় পাও, তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে[১৭৫]

---

১৭১ মাওলানা আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
১৭২ সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
১৭৩ আল্লামা রাগেব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮
১৭৪ আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল আরাবি, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩১৩
১৭৫ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২৫৪

সমতার প্রকৃত অর্থ

কেউ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে- কারো যদি স্ত্রী থাকে দুই, তিন কিংবা চারজন, তবে স্ত্রীদের যা কিছু অধিকার এবং যা কিছু তাদের জন্য করা স্বামীর কর্তব্য, স্বামী তার সব কিছুই পূর্ণ সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা, নিরপেক্ষতা ও পূর্ণ সমতা সহকারে যথারীতি আদায় করবে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান সামগ্রী, খাদ্য, সঙ্গদান, মিল-মিশ, হাসি খুশীর ব্যবহার, কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি সব বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করে সকল স্ত্রীর অধিকার আদায় করা স্বামীর কর্তব্য।[১৭৬] আদল বলতে সংখ্যা ও পরিমাণ ইত্যাদির দিক দিয়ে ইনসাফ ও সমতা রক্ষার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকার, সাম্য ও প্রয়োজনানুপাতে প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশনের কথা। কেননা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের প্রয়োজন, রুচি ও পছন্দ যে একই ধরনের ও একই মানের হবে, এমন কোন কথা নেই। কেউ হয়ত রুটি পছন্দ করে, তার প্রয়োজন আটা বা রুটির। আর কেউ ভাত পছন্দ করে, তার প্রয়োজন চাল বা ভাতের। কেউ বেশী বয়সের মেয়েলোক, স্বামীসঙ্গ লাভের প্রয়োজন তার খুব বেশি নয় আর কেউ হয়ত যুবতী, স্বাস্থ্যবতী, তার পক্ষে অধিক মাত্রায় স্বামীসঙ্গ লাভের দরকার। আবার কেউ হয়ত যুবতী হয়েও রুগ্ন তার যৌন মিলন অপেক্ষা সেবা শুশ্রুষা ও পরিচর্যার প্রয়োজন বেশি। কাজেই সুবিচার ও সমতার অর্থ পরিমাণ বা মাত্রার দিক থেকে সাম্য নয় বরং তার অর্থ হচ্ছে সকলের প্রতি সমান খেয়াল রাখা, যত্ন নেয়া এবং প্রত্যেকের দাবি যথাযথভাবে পূরণ করা।[১৭৭]
বস্তুত স্বামীর পক্ষে রাত বন্টন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সমতা সহকারে পরিবেশন একান্তই কর্তব্য। আর যদি সে তা রক্ষা করতে পারবে না বলে আশংকা বোধ করে, তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করা তার কর্তব্য। তাফসীরে ইবনে কাসীর এ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে, 'তোমরা কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে 'আদল' রক্ষা করতে পারবে না বলে যদি ভয় করো, তা হলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত।[১৭৮] স্ত্রীদের মধ্যে রাত বণ্টনসহ ও ব্যয়জনিত অধিকার সমূহ আদায়ে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা স্বামীর জন্য ফরজ।[১৭৯]

প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার বিধান

জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও মানবিক প্রয়োজনও স্ত্রীদের রয়েছে এবং তাও স্বামীর কাছ থেকেই তাদের পেতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। আর এ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সমতা রক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। অন্তত সে জন্যই তাকে প্রাণ-পণে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এটা নিরেট সত্য

১৭৬ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
১৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
১৭৮ ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ২৮২
১৭৯ আল্লামা রাগেব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

যে, প্রেম-ভালবাসা, মনের ঝোঁক, টান, অধিক পছন্দ ইত্যাদি মনের গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রায় অসম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

'এবং তোমরা একাধিক স্ত্রীর মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না-যত কামনা ও ইচ্ছাই তোমরা পোষণ কর না কেন। এমতাবস্থায় (এতটুকুই যথেষ্ট) তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি এমনভাবে পূর্ণমাত্রায় ঝুঁকে পড়বে না যে, অপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিবে। তোমরা যদি কল্যাণপূর্ণ নীতি অবলম্বন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল সীমাহীন দয়াবান'।[১৮০]

যেখানে স্ত্রীদের সাথে সুবিচারও সমতা রক্ষার শর্তে একাধিক বিবাহকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে, সেখানে সুবিচারের অর্থ প্রকাশ্য আচরণের সুবিচার। অর্থাৎ খোরপোশ, রাত যাপনের পালা ও প্রকাশ্য বিষয়াদির মধ্যে সুবিচার করা। যেখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা সুবিচার করতেই পারবে না' সেখানে সুবিচারের অর্থ ভালবাসার সমতা। অর্থাৎ দু'স্ত্রীকে এক রকম ও একই মাত্রায় ভালবাসা এটা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। সুবিচারের এ অর্থ কথার ধরন-প্রকৃতি ও বাক-পদ্ধতি থেকেই অনুধাবন করা যায়। কেননা, এরপরে বলা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা ভালবাসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একদিকে ঝুঁকে পড়বে না। সুবিচারের এই মর্মকথা বুঝানোর জন্যই ঐ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটাও সত্য যে, এর মধ্যেও আবার বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, একাধিক বিবাহ একটি বড় কঠিন ব্যাপার। তীব্র প্রয়োজন ব্যতিরেকে তা অবলম্বন করা অনুচিত।

উপরোক্ত আলোচনা সার সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল-কুর'আন বহু বিবাহকে নিরূৎসাহিত করেনি, আবার একক বিবাহকে ফরয তথা অবধারিতও করেনি। বরং একক বিবাহ ও বহুবিবাহের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আয়াতের শুরুতেই وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى আয়াতাংশ দ্বারা বহুবিবাহের বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে স্থান-কাল, পাত্রভেদে বহু রকম হতে পারে। যেহেতু আল-কুর'আনের বিধি-বিধান শাশ্বত তাই এর নীতিমালাও শাশ্বত। আলোচ্য আয়াত নাযিলকালীন সময়ে অভিভাবকগণ তাদের আশ্রয়ে থাকা এতিম নারীদের প্রতি নানাভাবে অবিচার করত। তারা তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করতে চাইত, কখনও বিয়ে না করেই তাদের সাথে যিনা ব্যভিচার করত। তাদের সম্পদ ও রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে

১৮০ আল-কুর'আন, সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২৯

তাদেরকে বিয়ে করতে চাইত। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে তাদের প্রাপ্য মোহরানা, আনুষঙ্গিক অধিকারসমূহ না দিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করত। এই বিষয়টি আলোচ্য আয়াতাংশে ফুটে উঠেছে এবং এই বাস্তবভিত্তিক সমস্যা দূর করার জন্য আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে যে, فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ অর্থাৎ এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার না করার আশংকা করলে দুইজন, তিনজন কিংবা চারজন পর্যন্ত নারী- এই সীমার মধ্যে যাকে খুশি, যার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয় তাকেই একজন পুরুষ বিয়ে করতে পারবে। আলোচ্য আয়াতাংশে বহু বিবাহের অনুমোদনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল আরবী বলেন, 'ما مالت له نفوسكم واستطابته' অর্থাৎ তোমাদের হৃদয়, অন্তর যার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হৃদয় যাকে বরণ করতে ইচ্ছে করে, সেই-সেই নারীকে তোমরা চারজন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে।[১৮১] এখানে طَابَ শব্দটি অন্তরে ভাল লাগা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার দ্বারা পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হল পুরুষ প্রকৃতি একাধিক নারীর প্রতি আকৃষ্ট। তাছাড়া বিভিন্ন বাস্তব কারণেও একজন স্বামী নিজ স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন নারীকে ভাল লাগতে পারে এবং তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হতে পারে। এই প্রাকৃতিক ও বাস্তব ভিত্তিক কারণের জন্য একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধানের যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে আল-কুর'আন নীতিগতভাবে বহু বিবাহ অনুমোদন দিয়ে এর সীমারেখা চারজনে সুস্থির করেছে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধানে অপারগ হলে একজন পুরুষকে একজন নারীকেই বিবাহ করতে হবে। এভাবে আল-কুর'আন বহু বিবাহ এবং একক বিবাহের রীতি-নীতির মধ্যে বাস্তব ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ বিধান মানব জাতিকে উপহার দিয়েছে।

একাধিক বিবাহের স্বীকৃতির অন্তর্দর্শন

পুরুষ প্রকৃতি একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুগামী। প্রকৃতি তা মানুষেরই হোক আর জন্তু-জানোয়ারের হোক সবই একাধিক (বিয়ের) কামনা আকাঙ্খায় ভরপুর। প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রকৃতি ও অধিকাংশ পুরুষের দেহের ঐকান্তিক দাবী হচ্ছে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, একজন মাত্র স্ত্রী দিয়ে সে অতৃপ্ত। এজন্য মানুষের ইতিহাসে এমন কোন পর্যায় আসেনি, যেখানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ চালু হতে দেখা যায়নি। বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রবণতা অপূর্ণ ও অতৃপ্ত থাকার কারণেই দেখা যায় যে, এক স্ত্রী গ্রহণ আইন যে সব দেশে জোর করে চালু করা হয়েছে সেখানে বহু স্ত্রী ভোগের রেওয়াজ অপরাপর দেশের তুলনায় অনেক বেশি। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, কোথাও স্ত্রী গ্রহণ আইন সম্মত আর কোথাও বেআইনীভাবে আইনকে ফাঁকি

---

১৮১ আল্লামা ইবনুল আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮০০

দিয়ে অবৈধ উপায়ে বহু স্ত্রী ভোগের মাধ্যমে লালসার বন্যা প্রবাহিত করা হয়।[১৮২]

ভিস্টর মার্ক এর মতে, নারীদের বিপরীতে পুরুষদের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রতি একটি স্বাভাবিক ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। পুরুষদের মধ্যে যৌন আস্বাদনের বৈচিত্র্যপ্রিয়তা অধিক বিদ্যমান। ড. রবিন সনের বরাত দিয়ে ভিস্টর মার্ক লিখেন, পুরুষ স্বভাবতই বৈচিত্র্য প্রিয় এবং খুব নগণ্য সংখ্যক পুরুষের পক্ষে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কঠিন, ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভবও। এ সত্যের প্রতি অসংখ্য গ্রন্থকার ও যৌন বিশারদ সমর্থন জানিয়েছেন। যে সব কামোদ্দীপক বিষয় মানুষের যৌন প্রবৃত্তিকে প্রজ্বলিত করছে পুরুষদের মধ্যে তাদের সংখ্যা এত বেশী এবং তাদের ধরণ এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, কোন নারীর পক্ষে সে-সব যৌন উত্তেজক দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব।

ড. মিযেল হেস লিখেন, যখনই কোন পুরুষ তার যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে ফেলে, তখনই সে সহসা অপর যৌন অভিজ্ঞতার প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে নারী যে পুরুষের স্বাদ আস্বাদন করে, তাকে সে কোনমতেই পরিত্যাগ করতে চায় না।

ফোরেলের মতে, নারী তার প্রেম ভালবাসায় খুব সতর্ক থাকে এবং অনেক সাবধানে তার প্রেমাস্পদ অন্বেষণ করে। অপরপক্ষে পুরুষ প্রায় প্রত্যেক যুবতী নারীর স্বাদ আস্বাদনে ঝুঁকে থাকে এবং পাত্রী নির্বাচনে খুব একটা সতর্ক ও সূক্ষ্মদর্শী হয় না। এ ছাড়া নারী যৌন দৃষ্টিকোণ থেকে খুব স্বাধীনচেতা হয় এবং তার পক্ষে একই সময় একাধিক পুরুষের সাথে কাম কেলি কামনা করা কদাচিৎ সম্ভব হয়। মস্কো ইউনিভার্সিটির ৩২৪ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৩১ জন ছাত্রী এই মত প্রকাশ করেছে যে, তারা একই সময় দুটি পুরুষের সাথে প্রেম বিনিময় করতে পারে। মি. কশ্ বলেন, নারীদের যৌন এককেন্দ্রিকতার কারণ হল তাদের ভালবাসায় আন্তরিক উপাদান প্রবল।[১৮৩] এ প্রসঙ্গে আব্দুর রহিম (র) লিখেন, মানব প্রকৃতিতে বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রবণতা অনেক তীব্র। এক স্ত্রী গ্রহণের পরও কোন যুবক এমন পাওয়া যাবে না যে, অপর কোন সুন্দরী যুবতী নারীকে দেখে আকৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি- তা মানুষেরই হোক আর জন্তু জানোয়ারের হোক সবাই একাধিক বিয়ের কামনা-আকাঙ্খায় ভরপুর।[১৮৪]

পুরুষ জাতির স্বভাব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বহু বিবাহের পক্ষে আর নারী জাতির এক স্বামীর পক্ষে। পুরুষ চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা শক্তিশালী, বিত্তবান ও ক্ষমতা লোভী। এজন্যই এক নারীতে পুরুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পুরুষের মনের খোরাক এক নারী দিতে পারে না।[১৮৫] ইউরোপে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় দুপক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যভিচার আইনত বৈধ। বেশ্যাবৃত্তিও বৈধ। তাছাড়া

---

১৮২ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩
১৮৩ ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬
১৮৪ মাওলানা আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
১৮৫ মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (স.)* (ঢাকা : মম প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৫৫

উপপত্নী রাখাও আইনত অনুমোদিত। এরপর একাধিক বিয়ে করার প্রয়োজন আদৌ অবশিষ্ট থাকে না। এক স্ত্রীর প্রথা নিছক একটা আধা ধর্মীয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে। কিন্তু এর গভীর ভিতরে অবাধ মেলামেশা- যিনা, ব্যভিচার, সমকাম, উপপত্নী রাখা, একে অপরের স্বামী ও স্ত্রী বদলের মাধ্যমে প্রকাশ্য ব্যভিচার চালু রয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এই সমস্ত পাপের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে শুধু বিয়ের পথ খোলা রাখে। এই একমাত্র পথেই যৌন চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। ইসলাম শুধু ব্যাভিচারই প্রতিরোধ করে না বরং ব্যাভিচারের প্ররোচনা ও উস্কানি দানকারী যাবতীয় কার্যকলাপ ও চালচলন সমূলে উৎপাটন করে একটি পবিত্র পরিবেশ তৈরি করতে চায়।

ইউরোপের পাশ্চাত্য আধুনিক সমাজে নারীরা সেজেগুজে নুন্যতম পোশাক পরে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করে। নর-নারী খোলাখুলি প্রেমপ্রণয় করে। নাচ- গানের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। জারজ সন্তান কোলে নিয়ে যত্রতত্র বিচরণকারিনী কুমারী মায়েরা সমাজের সমস্যা হয়ে বিরাজ করে। এধরনের পিতৃ পরিচয়হীন শিশুদের লালন-পালনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সমাজকে বহন করতে হয়। তালাকের হিড়িক ও বৈবাহিক বন্ধনের অস্থায়ীত্ব জ্ঞানীগুণী ও চিন্তাশীলদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ঐ সমাজে এক বিয়ের অসার ও মন ভোলানো প্রথা নিয়ে গর্ববোধ করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজে নর নারীর অবাধ মেলামেশা, রূপ প্রদর্শনী ও নগ্নতার সয়লাব বয়ে যায় না। কুমারী মায়েদেরও সেখানে অস্তিত্ব নেই, জারজ সন্তানদেরও আবির্ভাব সেখানে ঘটে না, তালাকের ব্যাপকতাও সেখানে পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ন করে না। কেবল শতকরা সর্ব্বোচ্চ একভাগ পরিবারে একাধিক বিয়ের রেওয়াজ চালু রয়েছে। এখন প্রথোমক্ত সমাজ অনুকরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় না শেষোক্ত সমাজ কোনটা নিয়ে গর্ব করা যায়, প্রথমটা নিয়ে না শেষেরটা নিয়ে।

এ ধরনের পরিবেশে শক্ত ও মজবুত দেহধারী ও অস্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা ও চাহিদা সম্পন্ন একজন মানুষ নিজের যৌন চাহিদা কীভাবে পূরণ করবে ? এর জবাবে ইসলাম অবাধ প্রেমপ্রণয়, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার পথ খোলা রাখার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত পবিত্র, নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট পথ- বহু বিবাহকে পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।[১৮৬]

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বাসনা মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত। ইসলাম এই অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়ে শর্তাধীনে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে। আর একমাত্র এই ব্যবস্থাই বিবাহ বন্ধনের বাইরে গোপন যৌন সম্পর্ক, সামাজিক অশ্লীলতা ও নৈতিক অপরাধ সফলতার সাথে দমন ও প্রতিরোধ করতে পারে। স্বভাবের গতিকে অস্বাভাবিকভাবে রুদ্ধ করে দিতে গেলে এর কুফল প্রচণ্ডরূপে দেখা

---

১৮৬ নঈম সিদ্দিকী, নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম (অনু. আকরাম ফারুক ও অন্যান্য, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২০৭

দেয়। সুতরাং দেখা যায়, বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণের সাথে সাথে সমাজে পতিতাবৃত্তি, নারী ধর্ষন, নারী হরণ, ও ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধ প্রসার লাভ করে। এর ফলে বহু বিবাহের বিরোধী পশ্চিাত্য ও এর অনুসারীগণ আজ চরম বিপদ সংকটের সম্মুখীন। এই সকল স্থানে পতিতাবৃত্তি বহু বিবাহের স্থান দখল করেছে। কেবল নিউইয়র্কেই পঞ্চাশ হাজার উপপত্নী রয়েছে যেখানে এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ গর্ভপাত করা হয়। তাছাড়া প্রতি মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষিত হয়।[১৮৭]

ইউরোপে ছিল না একের বেশি স্ত্রী প্রতিপালনের অনুমোদন। ফলে যৌবনের তাড়নায় জর্জরিত হতে হলো নারীকে। অবদমিত ইন্দ্রিয় ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য তাকে নিতে হয়েছিল অবাধ বিচরনের পথ। উচ্ছৃংখলতার পথ। পেটের ক্ষুধার সংগে যুক্ত হলো অতৃপ্ত যৌনতা, দামী পোশাক ও প্রসাধনীর মত প্রচণ্ড মোহ। এসব কিছু একাকার হয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অধঃপতনের শেষ প্রান্তসীমায়।

নারীরা পুরুষের মত উচ্ছৃংখল ও অনাচারী। তাদের চরিত্র, গৌরব আজ বিসর্জিত। নীতি আর নৈতিকতায় তারা কোন তোয়াক্কা করে না। সুযোগ পেলেই হন্যে হয়ে তৃপ্ত করে জৈবিক ক্ষুধা। অশুভ এই প্রবনতার ফলে বৈবাহিক জীবন এবং পরিবার প্রতিপালনে আজ তাদের চরম রকমের অনীহা। ইউরোপে পুরুষরা নারী অভিভাবকের দায়িত্ব থেকে কেবল সরে দাঁড়ায়নি, নারীর উপর চাপিয়েছে তার ভরণ- পোষণের দায়িত্ব। নারীরা আজ শ্রমভারে ন্যুব্জ। পারিবারিক বন্ধন আজ দুর্বল ও গ্রন্থিচ্যুত। যার পরিণামে টুকরো টুকরো হয়ে একেবারে ভেঙ্গে গুড়িয়ে গিয়েছে আজ ইউরোপের পারিবারিক জীবন। কর্মস্থলে নৈতিকতা ও নারী সুলভ স্বভাব রক্ষা করা তাদের সম্ভব হয়নি। কারখানার ইন্দ্রিয় বিলাসী মালিকগণ নারী শ্রমিকদের ভোগ করত তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। বিশ্বযুদ্ধ নিদারুণভাবে ছাটাই করলো পুরুষের সংখ্যা। এ অবস্থায় বিয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক যৌন তৃপ্ত করা সম্ভব হলো না সব নারীর পক্ষে। এরকম জরুরী সংকটের মোকাবিলা করেছে ইসলাম একাধিক বৈধ বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে।[১৮৮]

একাধিক স্ত্রী বিবাহের পূর্বশর্তগুলির প্রকৃতি এমনই যে, আজকের দিনে বহু স্ত্রী বিবাহের সম্ভাবনাই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। ইসলামি বিশ্বে এটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। পারিবারিক জীবনে একচ্ছত্রভাবে না পেলেও আংশিক পাওয়া নিরাশ্রয় হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল। এই উদ্বৃত্ত বিধবা নারীদের ব্যবস্থাকল্পে ইসলাম একের বেশী স্ত্রী প্রতিপালনের অনুমোদন দিয়েছে।[১৮৯]

মহানবি (স.) নীতিগতভাবে একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর বিবাহ বন্ধনকেই বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করতে পারে,

---

১৮৭ আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

১৮৮ মুহাম্মদ কুতুব, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম* (অনু. ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৫), পৃ. ১১৮

১৮৯ মুরাদ হরম্যান, *ইসলাম দি অলটারনেটিভ* (অনু. মঈন বিন নাসির, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ. ২৮৯

যার সংখ্যা চারজনে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই একজন নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ বৈধ নয়। এই ইসলামী বিধি প্রকৃতিরই ধর্ম অনুযায়ী। একই উপাদানে গঠিত দুটি চরিত্রের সংযোগে বিবাহ এর উদ্দেশ্য মানবের বংশ বিস্তার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন-এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন'।[১৯০] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, 'এবং আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন'।[১৯১] প্রকৃতির ব্যবস্থাই এইরূপ যে, একজন পুরুষ একাধিক নারী দ্বারা একই সময়ে একাধিক সন্তান প্রজননে সক্ষম। কিন্তু একজন নারী একই সময়ে বহু স্বামী হতে একাধিক গর্ভধারণে সক্ষম নয়। তাই অবস্থা বিশেষে (যেমন যুদ্ধোত্তর কালে পুরুষ বিরল সমাজে) পুরুষের বহু বিবাহ সমাজের উপকার করতে পারে, কিন্তু নারীর বহু বিবাহ এই ফল বয়ে আনবে না।[১৯২]

বহু বিবাহের যৌক্তিকতা

এতিম শিশুদের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে মহানবী (স.) এই সীমিত বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। বহুবিবাহের অনুমতি দানের ফলে তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হ্রাস বন্ধ হল, বিধবাদের সতীত্ব রক্ষা পেল, এই বিশেষ অবস্থায় সীমিত বহু বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকবল বেশি ক্ষয় হত এবং বহু নারীর পক্ষে ঘৃণ্য পতিতাবৃত্তি অবলম্বন রোধ করা সম্ভব হত না।

ইসলামের আগমনের পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির অধীনে একাধিক স্ত্রী ছিল। এর কোন বাধাঁধরা নিয়ম ছিল না। ইসলামের আগমন ঘটেছে বহু বিবাহের সীমা নির্ধারণের জন্য, একে ব্যাপক করার জন্য নয়। তদ্রূপ বহু বিবাহকে ইনসাফের সাথে মিলিয়ে দেয়ার জন্য, মানুষের ইচ্ছা বাসনার উপর ছেড়ে দেয়ার জন্য নয়। ইসলাম এসে এক্ষেত্রে এতটুকু সীমা নির্ধারণ করে যে, এক ব্যাক্তি একসাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারবে না। এর সাথে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, সকল স্ত্রীর সাথে যে সমতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে,তবে তার জন্য বহু স্ত্রী (চার পর্যন্ত) রাখা বৈধ, অন্যথায় এক স্ত্রীই রাখতে হবে।

পুরুষের সন্তান জন্ম দেয়ার যৌন ক্ষমতা সত্তর বা তদোর্ধ বয়স পর্যন্ত থাকে। অপর দিকে নারীর সেই ক্ষমতা পঞ্চাশের কোটায় শেষ হয়ে যায়। তাহলে দেখা গেল পুরুষের যৌন ক্ষমতা নারীর চেয়ে কমপক্ষে বিশ বৎসর বেশি। সুতরাং সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, মানব বংশ বিস্তার, তাই প্রাকৃতিক এই

১৯০ আল-কুর'আন, সূরা আশ শুরা, ৪২ : ১১
১৯১ আল-কুর'আন, আন-নাহল, ১৬ : ৭২
১৯২ মৌলানা মুহম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, পুরুষের সন্তান জন্ম দেয়ার নারী অপেক্ষা এই অতিরিক্ত ক্ষমতাকে কাজে না লাগিয়ে বংশ বিস্তারের পথ সীমিত করে ফেলা।[১৯৩]

মনীষীদের মতে সমাজের জন্য বহু বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিবিধান যেখানে পুরুষের চেয়ে নারীরা সংখ্যায় অধিক এবং জনসংখ্যাগত সমস্যা থেকে যে সামাজিক অনাচারের সৃষ্টি হয় তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এটা একটা প্রতিকারের উপায়।[১৯৪]

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা আধা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোতে আবহাওয়া, দারিদ্র্য, অপুষ্টি বা অন্যান্য বহুরকম শিশু রোগের জন্য উচ্চহারে শিশুমৃত্যু ও আন্তগোষ্ঠীয় এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধের কারণে যে বহু জনসংখ্যার অবলুপ্তি ঘটে, তার জন্য বহু বিবাহ প্রথাকে একটি প্রাকৃতিক প্রতিদান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। উপরোল্লিখিত কারণগুলোর জন্য ন্যায়-বিচার, অর্থনৈতিক, দৈহিক ও নৈতিক কারণের জন্য বহু বিবাহ প্রথাকে অনুমোদন করা হয়েছিল। এ অর্থে মানবজাতির স্থায়ী রক্ষণ এবং সামাজিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বহু বিবাহ প্রথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৯৫]

এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অধিক। আবার কোন কোন সমাজে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা চার ভাগের এক ভাগ। এই বিপুল সংখ্যক নারীদের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১। একজন বিয়ের যোগ্য পুরুষ বিয়ের যোগ্য একজন নারীকে বিয়ে করবে। অতঃপর এক বা একাধিক নারী সংখ্যাধিক্যের কারণে অবিবাহিত রয়ে যাবে। তার বা তাদের জীবন এমনভাবে কাটবে যে, তারা কোন পুরুষকে চিনবে না এবং তাদের সঙ্গ ও পাবে না।

২। একজন পুরুষ একজন নারীকে বিয়ে করবে এবং এক বা একাধিক নারীর সাথে গোপনে সখ্যতা রাখবে, কারণ তাদের ভাগে বৈধ পুরুষ নেই।

৩। বিয়ের যোগ্য সকলেই অথবা কেউ কেউ একাধিক বিয়ে করবে। এক্ষেত্রে একাধিক মহিলাকে যে পুরুষটি তার প্রকাশ্য স্ত্রী হিসেবে জানবে, গোপন সঙ্গীনী হিসেবে নয়।

প্রথম সম্ভাবনা মানব প্রকৃতির অন্তরায়। এখানে নারীর প্রাকৃতিক প্রয়োজন তথা দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত চাহিদাকে অস্বীকার করার নামান্তর। দ্বিতীয় সম্ভাবনা সমাজের পবিত্রতা নষ্ট করে। সুতরাং এ বিধান এমন

---

১৯৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬১-৬২
১৯৪ G.A. Parves, Islam: a Challange to Religion *(Lahore: Shaikh Ghulam Ali & Sons* 1968), p. 342
১৯৫ Ibid, p. 341

বস্তুবাদি জগৎ সৃষ্টিতে সম্মত নয়, যার কাজ হচ্ছে বাস্তবের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিধান চাপিয়ে দেয়া এবং সমাজকে কলুষিত করা। বরং এ বিধান এমন এক বাস্তব জগত সৃষ্টি করতে চায় যা বৃদ্ধি ও সমাজের পবিত্রতা বিধানে সহায়ক। তৃতীয় সম্ভবনাটি মানব প্রকৃতির অনুকূল। এ সকল দার্শনিক যুক্তিই হচ্ছে চার স্ত্রী রাখার অনুমোদনের উপর মূল কথা।[১৯৬]

অনাসক্ত ও সুবিবেচকের দৃষ্টিতে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাবে যে, এ শেষোক্ত অবস্থাই সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান। সামাজিক শৃংখলা ও নৈতিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতেও এ ব্যবস্থাই উত্তম। আর ইসলাম এ সমাধানটি পেশ করে মানবাধিকার সংরক্ষণের একটি সুন্দর নমুনা সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন ‘আল্লাহ ব্যতীত নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম বিধান আর কে দিতে পারে ?

একাধিক বিয়ের অনুমোদনের বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। শাশ্বত দীন ইসলাম মানব জাতির কল্যাণে তথা মানবাধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে বহুবিধ কারণে তা অনুমোদন করেছে, যেমন

১. সন্তানের আকাঙ্খা প্রত্যকেরই কম-বেশী থাকে। কোন পুরুষের প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হলে, সে স্ত্রীর জন্য সম্মানজনক এবং সে ব্যক্তির জন্য উত্তম পন্থা হচ্ছে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করা।

২. যে কোন কারণে প্রথম স্ত্রীকে ভাল না লাগলে বা অসহনীয় হলে তাকে তালাক দেয়ার চেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা অপক্ষোকৃত উত্তম। স্ত্রীদের মতামত নিলেও দেখা যাবে যে, এরূপ ক্ষেত্রে তালাক নিয়ে স্বামীর সংসার ত্যাগ করার পরিবর্তে অন্য একজন নারীর সঙ্গে একই স্বামীর গৃহে থাকাই মন্দের ভাল হিসেবে অনেক নারী তা মেনে নেবেন। কারণ, তাঁর সন্তানরা বাবা-মা দুজনের সঙ্গে থাকতে পারবে, যদিও তিনি স্বামীকে আংশিকভাবে পাবেন।

৩. অনেক সময় দেশে পুরুষের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক কারণে যদি পুরুষ সন্তান কম জন্মে, আর নারীর জন্ম হয় বেশি বা জাতীয় যুদ্ধে যখন দলে দলে যুবক প্রাণ দান করে, তখন তো বহু মেয়েই স্বামীহারা হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। অনুরূপ অবস্থায় সমাজের সার্বিক কল্যাণে তারা দাম্পত্য জীবন বঞ্চিত ও কুমারী বৃদ্ধা হয়ে থাকার পরিবর্তে সতীন হয়ে থাকাকে অগ্রাধিকার দিবে।

---

১৯৬ G.A. Parves, Vol. 4, p.61-62

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে যে, আল-কুর'আন এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিবাহ অনুমতি দিয়েছে। যেহেতু সে অবস্থা প্রতি যুগে সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রতিটি জাতির মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই বর্তমান থাকে, যাদের কোন না কোন কারণে একাধিক বিবাহ করতে হয়; তাই একাধিক বিবাহ প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে মানুষ কুকর্ম, ব্যভিচার ও যৌন উচ্ছৃংখলতায় লিপ্ত হবে। সমাজ সংসারকে যদি এই সব অপকর্ম থেকে পবিত্র রাখতে হয় এবং ব্যক্তি স্বভাব ও ব্যক্তি চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা উদ্দেশ্য হয়, তবে একাধিক বিবাহকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা যাবে না। অবশ্য আল- কুর'আন যেহেতু কতিপয় বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে একাধিক বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে, তাই এ ব্যপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধান করার নিশ্চিত অধিকার রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুহাররমাত

আল-কুর'আন বৈধ বিবাহর মাধ্যমে পরিবার গঠনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানব সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হল এই পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে। তাই এই পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিনই মানব বংশধারার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহমানতা অপরিহার্য। বস্তুত বৈধ বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনের উপর নির্ভর করে মানব বংশধারার বিকাশ, এর সংরক্ষণ, লালন-পালন ও পরিপুষ্টি সাধন। আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে বিবাহ শুধু প্রথা সর্বস্ব রীতি অনুষ্ঠানের নাম নয় বরং ভবিষৎ বংশধর সৃষ্টির লক্ষে পারিবারিক যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সাক্ষী রেখে দু'জন নর-নারীর সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার নাম বিবাহ। ইসলামী শরি'য়তে বিবাহ প্রথা পবিত্রতা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আল-কুর'আন সর্বপ্রকার অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করেছে। পবিত্র রক্তধারা সৃষ্টির লক্ষে মানব প্রজনন কর্ম পরিচালিত করার জন্য আল-কুর'আন রক্ত সম্পর্ক, শিশুর সম্পর্ক ও দুগ্ধ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাক নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এদেরকে শরি'য়তের পরিভাষায় 'মুহাররমাত' বলা হয়। পৃথিবীর সকল সমাজে আপন জ্ঞাতি ও জাতি গোষ্ঠির মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে নিষেদ্ধাজ্ঞা প্রচলিত রয়েছে। সব সমাজেই পিতা- কন্যা, মাতা-পুত্র ও সহোদর ভাই -বোনের মধ্যে বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ। সে কারণে এ ধরণের সম্পর্কে বলা হয় ইনছেস্ট (Incest) বা অজাচার। অজাচার তাই টাবু (taboo) বা নিষিদ্ধ প্রথা। যে সকল নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আল-কুর'আন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তা বর্ণনা করার পূর্বে **'মুহাররামাত'** প্রত্যয় বা Concept সম্পর্কে ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

محرمات (মুহাররমাত) এর সংজ্ঞা

মুহাররমাত বলা হয় ঐ সমস্ত নারীকে যাদেরকে বিবাহ করা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে আল্লাহ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন। মুহাররমাত দুই প্রকার:

এক. محرمات ابادية (মুহাররমাতে আবাদীয়্যা): মুহাররমাতে আবাদীয়্যা হল ঐ সকল নারী যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা স্থায়ীভাবে হারাম। এ সকল নারীরা কোন অবস্থাতেই একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য হালাল হয় না।

দুই. محرمات مؤقت (মুহাররমাতে মুয়াক্কাত): মুহাররমাতে মুয়াক্কাত হল ঐ সকল নারী যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা সাময়িকভাবে হারাম। কোনো কোনো নারী আবার চিরতরে হারাম নয়। কোনো কোনো অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়।[১৯৭]

আল-কুর'আনে মুহাররমাত

আল-কুর'আনের সূরা আন-নিসার ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে এ সকল নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার উপর নিষেদ্ধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আয়াতগুলো ব্যখ্যা-বিশ্লেষণষহ ধারাবাহিকভাব নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً

'আর যা বিগত হয়েছে তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না; নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা'।[১৯৮]

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল

হযরত আবু কায়েস (রা.) যিনি একজন বড় মর্যাদা সম্পন্ন আনসারী সাহাবী ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার পুত্র কায়েস তার স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, অথচ তিনি তার বিমাতা ছিলেন। তখন তার বিমাতা তাকে বলেন, 'তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সৎ লোক। কিন্তু আমি তোমাকে আমার ছেলেরূপ গণ্য করে থাকি। আচ্ছা, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট যাচ্ছি। রাসুলুল্লাহ (স.) এর নিকট এসে তিনি (পুত্রের বিমাতা) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) তাকে বলেন, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও'। অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়, 'যাকে পিতা বিয়ে করেছে তাকে বিয়ে করা পুত্রের জন্য হারাম'। এ ধরনের আরও বহু ঘটনা সে সময় বিদ্যমান ছিল যাদেরকে এ কামনা হতে বিরত রাখা হয়েছিল। এক তো হলো এ আবু কায়েস (রা.) এর ঘটনা। তার স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে উবাইদিল্লাহ যামরা (রা.)।[১৯৯]

জাহেলিয়াতের যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এ নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা অভিহিত করেছেন।[২০০] আল-কুর'আনের অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্টতর পন্থা'।[২০১] এখানে এর চেয়েও বেশী বলেছেন যে, এটা অরুচিকরও বটে। অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। এর ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে

---

১৯৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৮৮
১৯৮ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২২
১৯৯ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ২০১১, খ.৪, পৃ. ৩২৬-২৭
২০০ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪০১
২০১ আল-কুর'আন, বনী ইসরাইল, ১৭ : ৩২

শত্রুতার সৃষ্টি হয়।[২০২] যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।[২০৩]

ইসলামী আইনে পিতার স্ত্রীকে পুত্রের বিয়ে করা ফৌজদারী অপরাধ বিশেষ

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, একাজ আল্লাহ তা'য়ালার অসন্তুষ্টির কারণ এবং অতি নিকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং যে একাজ করে সে ধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য। কাজেই তাকে হত্যা করা হবে এবং তার মাল 'ফাই' হিসেবে বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে।[২০৪]

ইসলামী আইনে ফৌজদারী অপরাধ বিশেষ এবং পুলিশের সরাসরি হস্তক্ষেপের উপযোগী ব্যাপার। আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম (স.) এই অপরাধে অভিযুক্তদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এবং সেই সাথে তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি (সরকার কর্তৃক) বাজেয়াপ্ত করার শাস্তিও দিয়েছেন। ইবনে মাজাহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে হতে জানা যায় যে, নবী করীম (সা.) মূলনীতি স্বরূপ বলেছেন, 'মুহাররাম আত্মীয়ের সাথে যে ব্যাক্তি ব্যভিচার করে, তাকে হত্যা কর'।[২০৫]

সুনানে ও মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) একজন সাহাবীকে ঐ ব্যক্তির দিকে প্রেরণ করেন যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। উক্ত সাহাবীর প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তিনি যেন তাকে হত্যা করেন ও তার মাল নিয়ে নেন। হযরত বারা ইবনে উমায়ের (রা.) নবী (স.) প্রদত্ত পতাকা নিয়ে আমার নিকট দিয়ে গমন করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'রাসূলুল্লাহ (স.) আপনাকে কোথায় পাঠিয়েছেন? 'তিনি বলেন, আমি ঐ ব্যক্তির দিকে প্রেরিত হয়েছি যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। তার গর্দান মারার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২০৬] বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটা উট হারিয়ে গেলে আমি তা অনুসন্ধান করতে থাকি। এ সময় কয়েকজন অশ্বারোহী আসে, যাদের কাছে পতাকা ছিল। মহানবী (স.) এর সাথে আমার নিকট সম্পর্ক আছে মনে করে কয়েকজন আরবী আমার চারপাশে ঘুরাঘুরি করতে থাকে। অতঃপর তারা একটি গম্বুজের কাছে যায় এবং সেখান থেকে এক ব্যক্তিকে বের করে এনে তার শিরশ্ছেদ করে। আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, সে তার সৎ মাকে বিয়ে করেছিল।[২০৭] ফিকহবিদদের মধ্যে এই সম্পর্কে মতবৈষম্য রয়েছে। ইমাম আহমদের মতে, এই ধরনের অপরাধীকে হত্যা করা ও

---

২০২ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩২৮
২০৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪০১
২০৪ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩২৮
২০৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ আল- কাযবীনী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং-২৫৬৪, পৃ. ৬১২,
২০৬ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, পৃ.৬১২, হাদীস নং-৪৪০০; ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৮
২০৭ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, পৃ. ৬১২, হাদীস নং-৪৩৯৯

তার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, কেহ মুহারবাম আত্মীয়ের সাথে ব্যভিচার করলে, তার উপর ব্যভিচারের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর হবে ,আর বিবাহ করে থাকলে তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।[২০৮]

মূলত সন্তানের জন্য তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার মাঝে তিনটি হেকমত ও রহস্য লুকায়িত রয়েছে। এ তিনটি হেকমত হচ্ছে এই,

এক. পিতার স্ত্রীর আসন হচ্ছে মায়ের আসনের মতো।

দুই. পুত্র পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পিতাকে তার সমকক্ষ যেন মনে না করে। স্বামীরা সাধারণত তার স্ত্রীর প্রথম স্বামীকে প্রকৃতিগত ও স্বভাবগভাবেই ঘৃণা ও অপছন্দ করে। এক্ষেত্রেও ছেলে তার পিতাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে।

তিন. পুত্রের জন্যে পিতার স্ত্রীর ওয়ারিস হওয়ার ধারণাকে অপনোদন করা। জাহেলী যুগে এ ধরনের ওয়ারিস হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিলো, এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য একটা বিষয়, যা একই প্রাণ থেকে উৎসারিত হওয়ার কারণে স্বামী স্ত্রীর মর্যাদাকে নীচু করে দেয়। তাদের একজনকে অপমানিত ও লজ্জিত করা অপরজনকে অপমানিত ও লজ্জিত করারই নামান্তর।[২০৯] পিতার স্ত্রী, কিংবা-পিতার তালাক দেয়া স্ত্রী হোক কিংবা স্ত্রীকে পিতা রেখে মরে গিয়ে থাকুক উভয় অবস্থায় একই বিধান। এর উপর আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, যে স্ত্রীর সঙ্গে পিতার সঙ্গম হয়েছে, হয় বিয়ে করেই হোক বা দাসী করেই হোক কিংবা সন্দেহের কারণেই হোক, ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করা পুত্রের জন্যে হারাম। পিতার স্ত্রী তো মা সমতুল্য, পিতার সাথে তার একবার বিয়ে হয়ে যাওয়াই এ হারাম হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। কেননা সন্তানের কাছে পিতার মর্যাদা অনেক বড় ও সম্ভ্রমপূর্ণ। পুত্রের জন্যে পিতার স্ত্রী চিরতরে হারাম হওয়ার কারণে তার প্রতি সন্তানের লোভ ও লালসা করাও চূড়ান্তভাবে হারাম হয়ে গেছে। ফলে পুত্র ও পিতার স্ত্রীর মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে স্থায়ী ও অবিচল-অপরিবর্তিত হয়ে থাকল।[২১০]

সূরা আন-নিসার ২৩ নং আয়াতে চৌদ্দ প্রকার নারীদেরকে 'মুহাররমাত' ঘোষণা করা হয়েছে। আয়াতটি হল:

---

২০৮ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ১০৩-৪
২০৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ৮৭
২১০ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে- 'তোমাদের মাতৃগণ, তোমাদের কন্যাগণ, তোমাদের ভগ্নিগণ, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, তোমাদের ভ্রাতৃ কন্যাগণ, তোমাদের ভগ্নি কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দগ্ধ ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিতা, কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তবে তোমাদের জন্যে কোন অপরাধ নেই; এবং যারা তোমাদের ঔরসজাত, সে পুত্রদের পত্নীগণ এবং যা অতীত হয়ে গেছে তদ্ব্যতীত দু' ভগ্নিকে একত্রিক করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল! করুণাময়'।[২১১]

আয়াতটির ব্যাখ্যা হল বংশজাত, দুগ্ধ পান সম্বন্ধীয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেসব স্ত্রীলোক পুরুষদের জন্যে হারাম এ আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, সাত প্রকারের নারী বংশের কারণে এবং সাত প্রকার নারী বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন।[২১২]

রক্ত সম্বন্ধীয় মুহররমাত

রক্ত সম্পর্ক দরুন যে কোন মুসলিম পুরষের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাগণকে বিবাহ করা নিষেধ:

১. أُمَّهَاتُكُمْ গর্ভধারিণী মা। এখানে মূল সূত্রের কথা বলা হয়েছে, যা যত ঊর্ধ্বে যাক না কেন। আপন ও সৎ উভয় প্রকার মা, অনুরূপভাবে দাদী-নানী (আপন ও সৎ) তদুর্ধ্ব[২১৩] সম্পর্কের মহিলা।

২. وَبَنَاتُكُمْ কন্যা। এখানে শাখা সূত্রের কথা বলা হয়েছে, যত নিচের দিগেই যাক না কেন। স্বীয় ঔরসজাত কন্যা, পুত্রের কন্যা ও মেয়ের কন্যা অর্থাৎ নাতনী ও তদনিম্ন[২১৪] সম্পর্কের মহিলা।

---

২১১ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২২

২১২ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩২৮

২১৩ কোন ব্যক্তির তদুর্ধ্ব বলতে সে 'পুরুষ' হলে সোজা লাইনে তার উর্ধ্বতন পুরুষগণকে এবং 'নারী' হলে সোজা লাইনে তার উর্ধ্বতন নারীগণকে বুঝাবে।

২১৪ কোন ব্যক্তির তদনিম্ন বলতে সে 'পুরুষ' হলে সোজা লাইনে তার অধস্তন পুরুষগণকে এবং 'নারী' হলে সোজা লাইনে তার অধস্তন নারীগণকে বুঝাবে।

৩. وَأَخَوَاتُكُمْ বোন- আপন হোক কিংবা মা'র দিক দিয়ে অথবা পিতার দিক দিয়েই হোক। এখানে পিতা-মাতার নিম্নগামী শাখা-প্রশাখার কথা বলা হয়েছে। সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনকে বিয়ে করা হারাম। একইভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনী ও তাদের কন্যা, নাতনী তদনিম্ন সম্পর্কের মহিলার সাথেও বিয়ে করা হারাম।

৪. وَعَمَّاتُكُمْ পিতার বোন, আপন হোক কিংবা অন্য যে রকমই হোক। এখানে দাদা-নানা তাদের ঊর্ধ্বস্তনদের সরাসরি শাখা-প্রশাখার কথা বলা হয়েছে। ফুফু (আপন ও সৎ) ও তদুর্ধ্ব সম্পর্কের মহিলা।

৫. وَخَالاَتُكُمْ খালা- মা'র বোন। খালা (আপন ও সৎ) ও তদুর্ধ্ব সম্পর্কের মহিলা।

৬. وَبَنَاتُ الأَخِ ভাইয়ের কন্যা

৭. وَبَنَاتُ الأُخْتِ বোনের কন্যা

উপরোক্ত ৬নং ও ৭নং ক্রমিকধারী নারীদের কন্যা, নাতনী ইত্যাদি ও তদনিম্ন সম্পর্কের মহিলাদেরকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ।

ইসলামে এসব মহিলাদের 'মাহারিম' বা 'মুহররমাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা মুসলিম ব্যক্তির জন্যে এরা চিরকালের তরে হারাম। কোন সময় এবং কোন অবস্থায়ই তারা হালাল নয়, এদের বিয়ে করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কের দিক দিয়ে পুরুষটিকেও 'মুহাররম' বলা হয়।[২১৫]

মুহাররমাত নারী হারাম হওয়ার কারণ

ক. সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষের প্রকৃতি স্বীয় মা, বোন, কন্যাকে স্বীয় যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করতে কখনই রাজি বা প্রস্তুত হতে পারে না। মানুষতো দূরের কথা, কোন পশুও ও তা করতে প্রস্তুত হয় না। খালা ও ফুফুর প্রতিও নিজের গর্ভধারিণী মার মতই সম্ভ্রম বোধ থাকে, তেমনি থাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি। অনুরূপভাবে চাচা এবং মামা ও যে কোন নারীর জন্য পিতার সমতুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র হয়ে থাকে।

খ. ইসলামী শরি'য়তে এসব মুহাররমাতের সম্পর্কে প্রতি যৌন লালসাবোধকে চিরতরে হারাম করা না হলে এদের পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠা অসম্ভব ছিল না, কেননা এদের পরস্পরের মধ্যে নিভৃত একাকীত্বে খুব বেশী মেলামেশা হয়ে থাকে স্বাভাবিক পরিবারিক জীবন যাপনের কারণে।

---

২১৫ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮-২৩৯, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৮৯ ; *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৬

গ. এসব নিকট-আত্মীয় পরস্পরের মধ্যে গভীর আবেগপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ, এ কারণে প্রত্যেকটি মানুষ তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করে। তাদের প্রতি গভীর, তীব্র সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগ অনুভব করে। এ কারণে প্রেম-প্রীতি সহকারে এর বাইরের মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনই বাঞ্ছনীয়। এতে করে নতুন আত্মীয়তা সূত্রে আপনজন, আত্মীয়-স্বজনের পরিধি সমাজের মধ্যে অনেক ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং ভালবাসা ও সহানুভূতি সম্পর্কের ক্ষেত্রও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। আল-কুর'আনে সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে'।[২১৬]

ঘ. এ সব নিকটাত্মীয় লোকদের পরস্পরের মধ্যে যে স্বাভাবিক আবেগ রয়েছে, তা স্থায়ী হয়ে থাকা একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য। তাদের ভালবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হতে পারে। কিন্তু তার বিপরীতে এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুযোগ থাকলে এদের পরস্পরের মতদ্বৈততা, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া-ফাসাদ হওয়া ছিল অবধারিত। তার ফলে পরিবারিক জীবনে দেখা দিত গভীর ভাঙন ও বিরাট বিপর্যয়। পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা এক অনিবার্য পরিণতি হয়ে দেখা দিত।

ঙ. এসবক নিকটাত্মীয় নারী- পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হলে তাদের যে বংশ সৃষ্টি হত, তা সর্বদিক দিয়ে দূর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কোন পরিবারে দৈহিক বা বিবেক-বুদ্ধিগত কোন দূর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে তা বংশানুক্রমের সংক্রমিত হয়ে সেই বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যেত।

চ. প্রত্যেক নারী তার পক্ষ সমর্থনকারী ও তার পক্ষে চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী পুরুষের মুখাপেক্ষী এবং তার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। তার স্বামীর সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্যতা তীব্র হয়ে উঠে। তখন স্বার্থরক্ষা ও তার পক্ষ সমর্থন করার জন্যে কেউ না থাকলে নারীর অসহায়ত্ব মর্মান্তিক হয়ে পড়ে। কিন্তু তার বিয়ে যদি এসব অতি আপনজনের মধ্যে কারো সাথে হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে কথা বলার কোন লোক কোথাও পাওয়া যাবে না। কেননা তখন তার আপন জনই তার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।[২১৭]

---

২১৬ আল-কুর'আন, আর-রুম, ৩০ : ২১
২১৭ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭

বৈবাহিক সম্বন্ধীয় দরুণ মুহাররমাত

বৈবাহিক সম্পর্কের দরুণ যে সকল মহিলাগণকে বিবাহ করা হারাম, তা নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১. وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী। কোন নারীর কন্যা বিয়ে করলেই সেই নারী তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে, সে কন্যার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কার্যকর হোক আর না-ই হোক, কেননা শাশুড়ি মা'র সমান। স্ত্রী উর্ধ্বগামিনী মূল সূত্র এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যেমন স্ত্রীর দাদী, নানী ও তদুর্ধ্ব সম্পর্কের মহিলা।

২. وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ পালিতা কন্যা অর্থাৎ যে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্পর্ক কার্যকর রয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা স্বামীর জন্যে হারাম। অর্থাৎ স্ত্রীর সর্বপ্রকার কন্যা, পৌত্রী ও তদনিম্ন সম্পর্কের মহিলা। এ সকল মহিলারা তখনি হারাম হবে যখন এই স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন ঘটবে। যদি সে সম্পর্ক বাস্তবভাবে কার্যকর না হয়ে থাকে, তাহলে তার কন্যা বিয়ে করায় কোন দোষ নেই। স্ত্রীর পিতা স্ত্রী বা দাদার স্ত্রী যত উর্ধ্বগামী হোক।

৩. وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী। এমনিভাবে স্ত্রীর পুত্রের স্ত্রী, পৌত্রের ও দৌহিত্রের স্ত্রী যত নিম্নগামী হোক। পালিত পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। কেননা ইসলামে কোন ছেলেকে লালন-পালন করলেও সে আপন ঔরসজাত ছেলে হয়ে যায় না। জাহেলিয়াতের যুগে এ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল, কিন্তু ইসলাম তা বাতিল করে দিয়েছে। কেননা তাতে বাস্তব ও প্রকৃত অবস্থাকে অস্বীকার করা হয়। তাতে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল গণ্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ

'তোমাদের মুখ ডাকা পুত্রকে প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেয়া হয়নি। কেননা তা তো শুধু তোমাদের মুখের কথা মাত্র'।[২১৮] এ তিন জনের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম বৈবাহিকতার কারণে। ধারাবাহিকতার দরুন যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, তাতে এ বিবাহ হারাম হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

৪. وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ দুই বোনকে একসঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ। স্ত্রী বিবাহধীনে থাকা অবস্থায় তার বোন বিয়ে করা স্বামীর জন্য হারাম।

জাহেলিয়তের যুগে এরূপ করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু ইসলাম তা হারাম করে দিয়েছে তার কারণ, দুই বোনের পারস্পরিক আপনত্বের সম্পর্ক এরূপ অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। অথচ ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে এ সম্পর্ককে অটুট ও অপরিবর্তিত রাখা। কিন্তু দুই বোন যখন সতীন হয়ে দাঁড়াবে, তখন এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে না, দুজন দুজনার শত্রুতে পরিণত হবে অতি

২১৮ আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৪

স্বাভাবিকভাবেই। রাসূলে করীম (স.) অতিরিক্ত এই নির্দেশ দিয়েছেন, 'একটি মেয়ে ও তার ফুফু এবং একটি মেয়ে ও তার খালাকে এক সঙ্গে স্ত্রী বানানো যাবে না'।[২১৯]

তিনি আরও বলেছেন, তোমরা যদি এরূপ কাজ কর তাহলে তোমরা নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করার অপরাধ করবে। অথচ ইসলাম এই নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কে কে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর। তাহলে তাতে এমন কাজ কি করে জায়েয হতে পারে, যা এই পরিণতির সৃষ্টি করে?[২২০]

দুগ্ধ পান সম্বন্ধীয় মুহাররামাত

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের অনুরূপ দুধপান সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকেও বিবাহ করা হারাম। দুগ্ধ সেবনের কারণে বিয়ে হারাম হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

'দুধ মাতা ও দুধ বোন ও তোমাদের জন্য হারাম'। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন,

اَلرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَاتُحَرِّمُ الولاَدَةُ

'বংশীয় সম্পর্ক যাদের সাথে বিবাহ হারাম করে, দুধ পানজনিত সম্পর্কও তাদের সাথে বিবাহ হারাম করে'।[২২১] মহানবী (স.) আরো বলেন,

يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ

'বংশীয় সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধপানজনিত সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম'।[২২২]

অতএব একই স্তনে লালিত শিশুরা পরস্পর দুধ সম্পর্কীয় ভাই-বোন, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হারাম। এ প্রকার মুহাররামাত নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:

১. দুধমা ও তার উর্ধতন মূল সূত্র।
২. দুধকন্যা ও তার মেয়ে এবং তদনিম্ন সম্পর্কের মহিলা। হাদীসে এসেছে, 'পুরুষের দুধকন্যা হচ্ছে সেই নারী যাকে তার স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক থাকাকালীন সময়ে দুধ পান করিয়েছে।[২২৩]

২১৯ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ্ হাদীস নং ৪৯১৯, খ. ২, পৃ. ৭৬৬,
২২০ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০
২২১ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নং- ৪৯০৮, খ.২, পৃ. ৭৬৪
২২২ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, মুহারমাত অধ্যায়, হাদীস নং ১১৪৬, খ. ১ পৃ. ২১৭
২২৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৯০

৩. দুধবোন ও তার অধস্তন কন্যা।

৪. দুধফুফু এবং খালা। (দুধখালা হচ্ছে দুধমাতার বোন, আর দুধ ফুফু হচ্ছে দুধ মায়ের স্বামীর বোন)

৫. স্ত্রীর দুধমাতা (যে তার স্ত্রীকে শৈশবে দুধ পান করিয়েছে) এবং ঊর্ধ্বতন মূল বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কারণে যেরূপ হারাম হয়ে যায়, একইভাবে এখানেও স্ত্রীর বিয়ে হবার সাথে সাথে তা হারাম হয়ে যাবে।

৬. স্ত্রীর দুধ কন্যা (যাকে স্ত্রী তার বিয়ের পূর্বে দুধ পান করিয়েছে) এবং তার অধস্তন সন্তানের কন্যারা আর এই হারাম হওয়া কার্যকর হবে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর থেকে।

৭. দুধপিতা বা দাদা ও তার ঊর্ধ্বতন স্ত্রী, (দুধ পিতা হচ্ছে সে যার স্ত্রী থেকে শিশুটি দুধ পান করেছে)।

৮. দুধ ছেলে ও তার তদনিম্ন স্ত্রী।

৯. স্ত্রী এবং দুধ বোন বা দুধফুফু বা খালা অথবা এমন কোন মহিলাকে একসাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করা, দুধ পান করার কারণে যার সাথে বিয়ে হারাম।

এই নয় প্রকারের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের মহিলাদের হারাম হওয়া কুর'আনের আয়াতে প্রমাণিত। অবশিষ্ট মহিলাদের হারাম হওয়া রসূলে করীম (স.) এর হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কারণে যা হারাম তা দুধ সম্পর্কের কারণেও হারাম। ইসলামী বিধান অনুসারে এসব মহিলাদের সাথে বিয়ে সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কুর'আন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য ও হারামের বিশেষ কোন কারণের কথা উল্লেখ করেনি। এক্ষেত্রে যে সমস্ত কারণে উল্লেখ করা হয় তা হচ্ছে, পরবর্তীদের উদ্ভাবন, তাদের অভিমত ও মূল্যায়ন। এ সমস্ত মহিলাদের সাথে বিয়ে নিষেধ হওয়ার সাধারণ কোন কারণ থাকতে পারে আবার বিশেষ শ্রেণীর মহিলার জন্যে বিশেষ কারণ অথবা কতেক শ্রেণীর মাঝে যৌথ কোন কারণ থাকতে পারে। এগুলো আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন।

উদাহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে বিয়ে হওয়া সন্তান সন্ততিকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে। কেননা দুর্বলতা ও বংশগত উপাদানগুলো এক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে শেকড় গেড়ে মযবুতভাবে বসে যায়। অপরপক্ষে বিয়ে শাদী যদি স্বীয় বংশের লোকদের মাঝে না হয়ে নতুন নতুন বংশের লোকদের সাথে হয়, তাতে নতুন নতুন রক্তের সঞ্চার হয় এবং উন্নতমানের উপাদান তাতে সংযোজন হয়। এর ফলে প্রজন্ম নিত্যনতুন উপাদান এবং প্রাণ সঞ্চার হয়।[২২৪]

---

২২৪ সাইয়েদ কতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৯০

শৈশবকালে যে পুরুষ ছেলে যে নারীর বুকের স্তন পান করেছে তার পক্ষে এ নারীকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এ দুগ্ধ পান করানোর কারণে সে তো তার জন্যে মা সমতুল্য হয়ে গেল। তার দেহ যে মাংসপেশী ও অস্থিমজ্জা গড়ে উঠেছে তাতে তার বুকের দুগ্ধ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুগ্ধ পানের দরুণ দু'জনের মধ্যে মা-সন্তানের এক নতুন আবেগপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। একথা সত্য যে, অনেক সময় এ সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তির অবচেতনায় তা বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে এবং প্রয়োজনের সময় তা প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

দুগ্ধ পানের দরুণ শরি'য়তের এ বিধান কার্যকর হবে যদি তা শৈশব কালে অর্থাৎ দুই বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পান করা হয়। কেননা এ বয়সেই নারীর বুকের দুগ্ধ শিশুর জন্য প্রথম খাদ্য হিসেবে গণ্য। শিশু যদি অন্তত পাঁচবার পেট ভরে দুগ্ধ সেবন করে থাকে, তবেই শরি'য়তের হুকুম কার্যকর হবে। আর তার লক্ষণ হচ্ছে এই যে, শিশুটি দুগ্ধ সেবন করতে করতে পেট ভরে খাওয়ার দরুন নিজেই পান করা ছেড়ে দেবে, স্তনের বোটা শিশুর মুখ থেকে আপনা-আপনি খসে পড়বে। এ পাঁচবার পানের শর্তটি হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।[২২৫]

পরস্ত্রী বিবাহ করা হারাম

অপরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কোন নারীকে বিয়ে করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে আল-কুর'আন।

আল-কুর'আন ঘোষণা করে, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ'।[২২৬]

যেসব মেয়ে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে আছে এই অবস্থায় অপর কোন স্বামী গ্রহণ করা তাদের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ একজন স্ত্রীলোককে অন্য কোন পুরুষের পক্ষে বিয়ে করা জায়েয হতে পারে কেবলমাত্র দু'টি অবস্থায়:

ক. তার বর্তমান স্বামী হয় মরে যাবে কিংবা তালাক দেবে এবং এভাবে তার স্বামীত্ব অপমৃত ও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

খ. অতঃপর স্ত্রীলোকটির জন্যে আল্লাহ তা'আলা যে ইদ্দতের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা পূর্ণ হবে এবং পূর্ববর্তী স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য পালিত হয়ে যাবে। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হলে তার সন্তান প্রসবেই এই মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেই মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হোক কি দীর্ঘ।

যে স্ত্রীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার জন্যে ইদ্দতের মেয়াদ হচ্ছে চার মাস দশদিন। আর তালাক প্রাপ্তা হলে তার ইদ্দতের মেয়াদ তিন হায়েয। তার গর্ভে কোন সন্তান নেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এ মেয়াদ একান্তই জরুরী। কেননা প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে তার গর্ভে সন্তান থাকার আশংকা থেকে যাবে।

---

২২৫ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯
২২৬ আল-কুর'আন, আন -নিসা, ৪ : ২৪

কাজেই দুই ধারার বংশের সংমিশ্রন প্রতিরোধে এ ইদ্দত পালন অপরিহার্য। তবে স্ত্রী যদি অল্প বয়স্কা বা হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা হয়, তাহলে তাদের ইদ্দত হচ্ছে মাত্র তিন মাসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তিন হায়েয শুকিয়ে যাওয়ার মেয়াদ পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে। তাদের গর্ভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্যে জায়েয নয় যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে'।[২২৭] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয হওয়ার আশা নেই তাদের সম্পর্কে তোমাদের মনে সন্দেহ হলে তারা তিন মাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। তাদেরও ইদ্দত এ মেয়াদ যাদের হায়েয বন্ধ হয়েছে এবং গর্ভবর্তী স্ত্রীদের ইদ্দত হচ্ছে গর্ভ প্রসব'।[২২৮] তিনি আরও বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় ও স্ত্রী রেখে যায়, সেই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন ইদ্দত পালনে রত থাকবে'।[২২৯]

উপরিল্লিখিত পনের প্রকারের নারীদের বিয়ে করা ইসলামে হারাম। কুরআন মজীদের সূরা আন-নিসার তিনটি আয়াতে তা একসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত নারীদের বিয়ে নিষিদ্ধকরণের যৌক্তিকতা

তাফসীর আল মানারে মুহাম্মদ রশিদ রেজা উপরে বর্ণিত নারীদের বিয়ে নিষিদ্ধকরণের দার্শনিক যৌক্তিকতা তুলে ধরে লিখেন, আল্লাহ তা'য়ালা মানব সমাজে বহু রকমের সম্পর্কের সৃষ্টি করেছেন, যাকে উপলক্ষ করে তারা পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে এবং যার দ্বারা তারা বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে ও সাফল্য অর্জনে পরস্পরে সহযোগিতা করে। এসব সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্ক হচ্ছে রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক। এই দুটো সম্পর্কেরই বিভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। রক্ত সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্ক হলো পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যকার ও সন্তানদের পরস্পরের মধ্যকার স্নেহ ও মমতার স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক।

স্নেহ-মমতার ধারা মায়ের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। ফলে শিশু পৃথিবীতে মাকেই সর্বপ্রথম ভালোবাসতে শেখে। মায়ের আগে আর কারো সাথে তার স্নেহ -মমতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়না। মায়ের পরে সে ভালোবাসে বাবাকে। কিন্তু তা মায়ের চেয়ে কম, যদিও সে মায়ের চেয়ে বাবাকে অধিক শ্রদ্ধা করে। তাই পিতামাতা ও সন্তানের মাঝে জন্মলগ্ন থেকেই সৃষ্ট এই সুগভীর মায়া-মমতা পার্থিব জীবনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও পবিত্র সম্পর্ক। এই মহৎ ও পবিত্র সম্পর্কে যদি কামোদ্দীপনার লেশমাত্রও মিশ্রণ থাকতো, তাহলে সেটা কি মানুষের সহজাত স্বভাব প্রকৃতির উপর আগ্রাসন হতোনা? এতে কি ঐ পবিত্রতম সম্পর্কটি বিনষ্ট হতোনা ? অবশ্যই হতো। আর এজন্যই আয়াতে মায়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি

---

২২৭ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৮
২২৮ আল-কুর'আন, আত-তালাক, ৬৫ : ৪
২২৯ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩৪

সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মায়ের পরই উল্লিখিত হয়েছে মেয়ের নিষিদ্ধ হওয়ার বিধি। সহজাত স্বভাবপ্রকৃতির উপর আগ্রাসন চালানো, তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও তার ক্ষতিসাধন করার প্রবণতা থেকে সাধারণভাবে মানুষকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। মানব সমাজে বিদ্যমান আর কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনে এমন পরিপূর্ণ সমতা ও এমন মমতা ও বিশ্বস্ততার অস্তিত্ব নেই। মোট কথা, ভাই-বোনের সম্পর্ক জন্মগত ও অটুট সম্পর্ক। ভাই ও বোন পরস্পরকে ভোগ করতে উৎসুক হয়না। তাই শরি'য়তের বিধানের বিচক্ষণতা এই যে, বোন বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যাতে স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা মেটাতে মানুষ ভাইবোনের পবিত্র সম্পর্ককে কলুষিত না করে ভিন্ন পথ খুঁজে নেয়। তাদের সাথে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বজায় রাখা ও তাদের সাথে কোন যৌন সম্পর্ক না হওয়া স্বভাবধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য্যেরই দাবী। এই দাবী বাস্তবায়িত হতে পারে ফুফু ও খালার বিয়ে নিধিদ্ধকরণেরই মাধ্যমে।[২৩০]

মুশরিক নারীকে বিবাহ করা হারাম

মুশরিক নারী বিবাহ করাও হারাম। মুশরিক নারী হচ্ছে তারা, যার মূর্তি পূজা করে। প্রচীন আরব ও ভারতীয় হিন্দু মুশরিকগণ এ পর্যায়ে গণ্য। এ প্রসঙ্গে মাহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'মুশরিক নারী ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিয়ে করবে না। জেনে রাখ, ঈমানদার দাসীও মুশরিক নারীর তুলনায় অনেক ভাল, সে তোমার যতই পছন্দসই ও মনলোভা হোক। তোমরা মুশরিকদের কাছে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দিবে না যতক্ষণ না, তারা ঈমান আনবে। কেননা একজন ঈমানদার দাসও মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, সে তোমাদের যতই পছন্দ হোক। ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে, আল্লাহ জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন তাঁর অনুমতিক্রমে।[২৩১]

এ আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছে যে, কোন মুসলিমের পক্ষে মুশরিক নারী বিয়ে করা জায়েয নয়। মুসলিম নারীর পক্ষেও জায়েয নয় মুশরিক পুরুষ বিয়ে করা। কেননা তওহীদী দ্বীন ও মুশরিকী ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ঈমানদার লোক তো জান্নাতের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় এবং মুশরিকরা নিয়ে যায় জাহান্নামে। মুসলিমগণ ঈমান আনে এক আল্লাহ, রাসূল, নবুয়ত, পরকালের প্রতি। পক্ষান্তরে মুশরেকগণ আল্লাহর সাথে শিরক করে, নবুয়ত অস্বীকার করে এবং পরকালকে করে অবিশ্বাস।

---

২৩০ মুহাম্মদ রশিদ রেজা, *তাফসীরুল মানার* (মিশর: দারুল মানার, ১৯৪৭),খ. ৪,পৃ. ৭০
২৩১ আল-কুর'আন,আল-বাকারা, ২: ২২১

অথচ বিয়ে হচ্ছে মনের শান্তি, স্থিতি, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির ব্যাপার। কাজেই তাতে এ দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবধারা একত্র সমাবেশ অসম্ভব।[২৩২]

অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে

মুসলিম নারীকে অমুসলিম পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম সে অমুসলিম আহলি কিতাব হোক কি অন্য কেউ। মুসলিম নারীর জন্য তা কোন অবস্থায় জায়েয নয়। এ পর্যায়ের কুর'আন হুকুম পূর্বেত্ত উদ্ধৃত হয়েছে। হুকুমটি এই, 'তোমরা তোমাদের মেয়ে মুশরিকদের কাছে বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করবে'।[২৩৩] হিজরত করে আসা মুমিন নারীদের সম্পর্কে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

'হিজরত করে আসা মহিলাদের তোমরা যদি মুমিন বলে জান, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফিরে পাঠিয়ে দিও না। কেননা এরা তাদের জন্য হালাল নয়, তারাও হালাল নয় এদের জন্য'।[২৩৪] এখানে আহলি কিতাবদের বাদ দিয়ে একথা বলা হয়নি। কাজেই মুসলিম মহিলাদের কাফির মুশরিক-অমুসলিম পুরুষদের কাছে বিয়ে দেয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন ভিন্নমতের অবকাশ নেই। এই প্রকার বিয়ে হারাম হওয়ার যুক্তিকতা হল এই যে, ইহুদি, খৃষ্টান (বা হিন্দু) ধর্ম অপর কোন ধর্মাবলম্বীর স্ত্রীর কোনরূপ অধিকার মর্যাদা বা স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়নি। তার অধিকার রক্ষা করা হবে বলে কোন প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়নি। এরূপ অবস্থায় ইসলাম কোন মুসলিম নারীকে অমুসলিম পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়ার অনুমতি দিয়ে তাকে এই কঠিন বিপদে কি করে ঠেলে দিতে পারে ? এই মুসলিম নারীর দ্বীনী আকীদা ও চরিত্র সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয় না এমন পুরুষের কাছে তাদের সমর্পণ করার নীতি গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

ইহুদি ও খৃষ্টান ইসলামকে আদৌ স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামের কিতাব এবং তার রসূলকেও তারা মানে না। তাহলে একজন ইসলামে বিশ্বাসী নারী কি করে এরূপ স্বামীর স্ত্রী সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে ? কেননা সে তো দ্বীন ও ইসলামী ইবাদত-বন্দেগী পালন করবে এবং ইসলমের মান-মর্যাদা, তার রীতি-নীতির বাস্তবতা রক্ষা করতে চেষ্টা হবে। শরি'য়তের হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং কর্তব্য গুলো পালন করবে। কিন্তু এরূপ স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। এ আলোকেই মুসলিম পুরুষের জন্য মূর্তি পূজারী মুশরিক নারী বিয়ে করাকে ইসলামে হারাম ঘোষণা করার যৌক্তিকতা বুঝাতে পারা

---

২৩২ আল্লামা ইউছুফ আল- কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
২৩৩ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২১
২৩৪ আল-কুর'আন, আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১০

যায়। কেননা ইসলাম শিরক ও মূর্তি পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী, তা পূর্ণমাত্রায় অস্বীকারকারী। ফলে এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাম্য পরম প্রীতি ও বন্ধুত্ব, ভালবাসা গড়ে ওঠা ও স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়।[২৩৫]

ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন

ব্যভিচারে অভ্যস্ত ও পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে এ পেশা অবলম্বনকারী নারী বিয়ে করা কোন ঈমানদার মুসলমানের জন্য জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকেও বিবাহ করেনা, এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না। মুসলমানদের প্রতি এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেয়া হয়েছে'।[২৩৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতে নিকাহ দ্বারা সঙ্গম বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে শুধুমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিকই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে।[২৩৭]

ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারী

ব্যভিচারে অভ্যস্ত ও বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে এ পেশা অবলম্বনকারী নারী বিয়ে করা কোন ঈমানদার মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। হযরত মুরসাদ ইবনে আবুল মুরসাদ (রা.) নবী করীম (স.)-এর কাছে এমন একটি বেশ্যাকে বিয়ে করার অনুমতি চেয়েছিলেন যার সাথে জাহেলিয়তের যুগে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এ মেয়েটির নাম ছিল 'ইনাক'। এ কথা শুনে নবী করীম (স.) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ সময় কুর'আনের আয়াত নাযিল হল: ব্যভিচারকারী পুরুষ ব্যভিচারকারী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারী নারীকে ব্যভিচারকারী বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না, ঈমানদার লোকদের জন্য এরা হারাম। নবী করীম (স.) সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন এবং তাঁকে বললেন: না, তুমি তাকে বিয়ে করবে না।

আলোচ্য আয়াত থেকে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, এখানে কেন মুশরিক নারী বা পুরুষের সাথে বিবাহের প্রসঙ্গ আনয়ন করা হয়েছে, অথচ সুস্পষ্টভাবে মুশরিক নারী-বা পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে

---

২৩৫ আল্লামা ইউছুফ আল- কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
২৩৬ আল-কুর'আন, আন-নূর, ২৪ : ৩
২৩৭ হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৯১

আবদ্ধ হওয়া মুমিন নারী-পুরুষের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মুহাম্মদ আছাদ এই ব্যাখ্যার বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তার মতে, আল-কুর'আন কখনই একজন বিশ্বাসীকে সে যত বড় অপরাধই করুক না কেন একজন যেনাকারী পুরুষ বা নারী যখন কৃত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করে পাপের প্রায়শ্চিত করে তখন একই ব্যক্তিকে পুনরায় শাস্তির সম্মুখীন করা যায় না। আলোচ্য আয়াতটি নিষেধাজ্ঞা সূচক নয় বরং ঘটনার বর্ণনামাত্র। আলোচ্য আয়াতে মুশরিক নর-নারীকে বিবাহ প্রসঙ্গটি ব্যপক রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৩৮]

উক্ত আয়াত হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, যেনাকারিণীর প্রতি শুধু যেনাকারী অথবা মুশরিক পুরুষেরই আগ্রহ থাকে। কোন সৎস্বভাবের লোক যিনাকারিনী বিবাহ করতে সম্মত হয় না। সুতরাং যদি কেউ স্ত্রীর ধর্ম এবং চরিত্র বিবেচনা না করে শুধু যেনাকারিনী স্ত্রী লাভের উদ্দেশ্যে তাকে কিংবা মুশরিককে বিয়ে করে, তবে এটা মুসলমানের জন্য হারাম।[২৩৯]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা কোন সতী নারীকে (যিনার) অপবাদ দেয়, তৎপরপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তবে এরূপ লোককে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো ও গ্রহন করো না, এবং এরাই হচ্ছে ফাসেক। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমাকরী অনুগ্রহশীল'।[২৪০]

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, আয়াতটির সূচনা ভাগে শরি'য়াতের কোন বিধান নয়, বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশেই এরূপ নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপরাগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়, কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না।

কারণ বিবাহের লক্ষ্য স্ত্রীর সাথে স্থায়ী স্নেহ-ভালবাসা, পরস্পারিক সহযোগিতামূলক দায়িত্ব-কর্তব্য, সৎ ও পবিত্র দাম্পত্য জীবন যাপনের মাধ্যমে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়া এবং তাদেরকে সৎ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু চরিত্রভ্রষ্ট মানুষ এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাত বিপদ মনে

---

২৩৮ মুহাম্মদ আসাদ, *দ্যা ম্যাসেজ অফ দ্যা কুর'আন* (জিব্রালটার : দার আল-আন্দালুস, ১৯৮০), পৃ. ৫৩৩
২৩৯ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, *বয়ানুল কুর'আন* (অনু. মাওলান নূরুর রহমান, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৮৫), পৃ. ৫৫৮
২৪০ আল-কুর'আন, আন-নিসা ৪ : ৪

করে। এদের ঝোঁক-প্রবণতা বিবাহের প্রতি নয়, তাই তাদের ঝোঁক ব্যভিচারিণী নারীর প্রতি এমনকি মুশরিক নারীর প্রতিও। তারা হালাল-হারামের ধার ধারেনা। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন মুমিন-মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। তার প্রতি আগ্রহ থাকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত কোন মুসলিম পুরুষ বা মুশরিক পুরুষের। একথা সর্বজনবিদিত যে, তারপরও যদি কেউ এরূপ বিবাহ করে তাহলে ব্যভিচারেরই নামান্তর। কারণ মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ আল-কুর'আনের অকাট্য আয়াত দ্বারা হারাম ঘোষিত হয়েছে।[২৪১]

আলোচ্য আয়াতে মুশরিক প্রসঙ্গটি এসেছে তুল্যার্থে। কারণ ব্যভিচারী ও মুশরিক ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বাসগত ও বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে। একজন ব্যভিচারী যেমন ইসলামের সুমহান আদর্শে বিশ্বাসী নয় বরং সে অনবরত যিনার মত জঘন্য পাপ কাজে লিপ্ত থাকে যা হত্যা-মিথ্যা প্রতারণা সহ সমস্ত ধরনের পাপ কাজের প্রতি ধাবিত করে তদ্রুপ একজন মুশরিকও ইসলামের সুমহান আদর্শে বিশ্বাসী নয়। কোন মুশরিকই ইসলামী শরি'য়তের নির্দিষ্ট সীমারেখায় বিশ্বাসী নয় বলে যিনাসহ যে কোন ধরণের জঘন্য পাপকাজে লিপ্ত হতে তার বিবেক-বুদ্ধি তাকে বাধা দান করেনা।[২৪২]

মোট কথা অসতী ও ব্যভিচারিণী নারীদেরকে বিয়ে করা সৎ ও পুণ্যশীল মুমিনদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে সে তওবা করলে তাকে বিয়ে করা বৈধ। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে একটি লোক প্রশ্ন করে, একটি অসতী নারীর সাথে আমার জঘন্য সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদেরকে তওবা করার তাওফীক দান করেছেন। সুতরাং এখন আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।' তখন কতগুলো লোক বলে উঠেন যে, ব্যভিচারিণী ও মুশরিক মহিলাকে শুধুমাত্র ব্যভিচারীই বিয়ে করতে পারে। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'না, এই আয়াতের অর্থ এটা নয়। তুমি ঐ মহিলাটিকে এখন বিয়ে করতে পার। যাও, কোন পাপ হলে তা আমার যিম্মায় থাকল।[২৪৩] হযরত ইবনে আব্বস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের ভাবার্থ হল, মুসলমানদের জন্য ব্যভিচার হারাম ।[২৪৪]

আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

ইসলাম পুতঃ পবিত্র ও সৎচরিত্র একজন পুরুষ বা নারীকে কোন ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর ঘৃণিত ও কলুষিত মন এবং তার বিবিধ রোগ জীবাণু জর্জরিত দেহের প্রভাবাধীন করতে চায়নি।[২৪৫] ব্যভিচারে

২৪১ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩৪৭
২৪২ সাইয়্যেদ সাবেক , প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮৭; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ১০০
২৪৩ হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৯৫
২৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
২৪৫ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৭

অভ্যস্ত নর-নারীর পাপাচারটি এত জঘন্য প্রকৃতির যে, এতে লিপ্ত অপরাধী ব্যক্তি মুসলিম জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য এবং মুসলিম সমাজকে সর্বপ্রকার কলুষতা হতে মুক্ত রাখার জন্য এদের সাথে মুসলিম জামাতের সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে। এই বিচ্ছিন্ন চাবুকমারা বা তার চেয়েও একটি কঠোর মনোজাগতিক সামাজিক শাস্তি।[২৪৬]

ইবনে রুশদ বলেন, মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ। এই আয়াতে মর্ম অনুধাবনে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, উক্ত আয়াত দ্বারা ব্যভিচার নিষিদ্ধ না বিয়ে নিষিদ্ধ বুঝানো হয়েছে ? অধিকাংশ আলিমদের মতে, আয়াতটিতে ব্যভিচারীর বিয়ের প্রতি ইংঙ্গিত করা ও তার নিন্দা করা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়নি।[২৪৭] ভাষাবিদদের মতে, এ কথার তাৎপর্য এই যে, ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ উক্তরূপ অপরাধের কারণে অপরাধী বিধায় পবিত্র মুমিন ব্যক্তিগণ স্বভাবতই তাদের থেকে ভীষণভাবে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়।[২৪৮]

প্রতিটি নর-নারী নিজ নিজ স্বভাব-রুচি, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য মন-মানসিকতা, নিয়ত ও দৃষ্টি অনুপাতে জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।[২৪৯] নিম্নোক্ত আয়াতটি ও এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

'দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত।[২৫০]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরুষের জন সোভা পায়, তাই চরিত্রহীনা নারী চরিত্রবান পুরুষের জন্য বিবাহযোগ্য হতে পারেনা। কেননা তা কুর'আনে বর্ণিত চূড়ান্ত আদেশের লঙ্ঘন। অনুরূপভাবে সচ্চরিত্রবান পুরুষ সচ্চরিত্রবর্তী নারীদের জন্য। অতএব কোন চরিত্রবান পুরুষই কোন চরিত্রহীনা নারীর জন্য বিয়ের যোগ্য হতে পারে না। কেননা তা কুর'আনের বিশেষ ঘোষণার পরিপন্থী।[২৫১] এ প্রসঙ্গে আল্লামা আল-কাসেমী লিখেন, এ আয়াত প্রমাণ করে যে,

২৪৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ. ৮৬
২৪৭ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৯০,
২৪৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৮৫
২৪৯ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৫
২৫০ আল-কুর'আন,আন-নূর, ২৪ : ২৬
২৫১ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কাশেমী, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৪৪৪৭

ব্যভিচারী মোটামুটিভাবেও ঈমানদার নয়, যদিও তাকে মুশরিক বলা যায় না। আয়াতটির শেষ শব্দ থেকে জানা যায় ঈমানই ব্যভিচারী পুরুষ স্ত্রীকে বিয়ে করতে ঈমানদার লোকদের বাধা দেয়- নিষেধ করে। যে তা করবে সে হয় মুশরিক হবে, নয় ব্যভিচারী। সে ধরনের ঈমানদার সে নয়, যে ধরনের ঈমান এ ধরনের বিয়েকে নিষেধ করে, ঘৃণা জাগায়, কেননা যেনা- ব্যভিচার বংশ নষ্ট করে। আর যেনাকারীর সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনে পাপিষ্ঠের সাথে স্থায়ীভাবে একত্রে সহবাস করা অপরিহার্য হয়। অথচ আল্লাহ এধরণের সম্পর্ক, সংস্পর্শকে চিরতরের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।[২৫২] এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, 'ব্যভিচারী ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করেনা, চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করেনা, যখন সে সূরা পান করে তখনও মু'মিন থাকে না।[২৫৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন যে, ব্যভিচারীর উপর চাবুক লাগানো হয়েয়ে, সে তার অনুরূপ এর সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।[২৫৪] ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে মুসলমানদের জন্য ব্যভিচার হারাম। হযরত কাতাদাহ (রা.) সহ প্রমুখ মনীষীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, অসতী ও ব্যভিচারিনী বিয়ে করা মুসলমানদের উপর হারাম।[২৫৫] যেমন অপর এক আয়াতে এসেছে, যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয়। এবং উপপত্নি গ্রহণকারিণী ও নয়।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তওবা না করা পর্যন্ত ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। চাই সে স্বাধীনা হোক অথবা ক্রীতদাসী। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ছাড়া অন্যকে বিবাহ করে না। আর ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেই বিবাহ করে না। মুসলমানদের জন্য এরকম বিবাহ হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহ সাধারণত মাকরুহ্ (যদি সে তওবা না করে)। কেননা বিবাহের জন্য নারীকে পবিত্র হওয়া শর্ত করা হয়েছে। মোহর পরিশোধ করার শর্তও করা হয়েছে এ কারণে। নারীকে পবিত্র হতে হবে বিবাহের সময় এবং মোহরানাও পরিশোধ করতে হবে ওই একই সময়ে।[২৫৬]

---

২৫২ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৭৪৪৬

২৫৩ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ৬৫১৪, পৃ.১০০১

২৫৪ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নং ২০৫১, পৃ. ২৮০

২৫৫ ইমামদুদ্দিন ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৯২

২৫৬ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৯০,

পরিশেষে বলা যায় যে, অজ্ঞতার যুগে বিমাতা ও দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাকে আরববাসীরা হালাল মনে করত। পিতার মৃত্যুর পর তারই বিবাহিত স্ত্রীকে নিজ পুত্রের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা একটি সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

আল-কুর'আন এই দুই শ্রেণীর নারীসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের কিছু সংখ্যক নারীকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে বিবাহ-শাদীর উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সমাজ জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক-সম্বন্ধের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আল-কুর'আন ঘোষিত এই সকল নারীকে মুহাররামাত বলা হয়। মুহাররামাতকে বিবাহ করার নিষেদ্ধাজ্ঞার পিছনে শারীরিক, মানসিক, স্নায়ুবিক ও আবেগগত কার্যকরণ সম্পর্কের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আপন জ্ঞাতি ও জাতি গোষ্ঠির মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অনেক ক্ষতিকর পরিণতির তথ্য আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় উঠে এসেছে। তাই আল-কুর'আন বর্ণিত সুনির্দিষ্ট সংখ্যক নারীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের নিষেদ্ধাজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও তালাক আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

◊ স্বামী -স্ত্রীর যৌথ অধিকারসমূহ
◊ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য
◊ দেনমোহরের অধিকার
◊ ভরণ-পোষণের অধিকার
◊ স্ত্রীর প্রাপ্য নৈতিক অধিকারসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আনে তালাক আইন

◊ তালাকের সংজ্ঞা
◊ আল-কুর'আনে বিবাহ ভঙ্গের পূর্বশর্ত
◊ তালাক সম্পর্কে আল-কুর'আন
◊ তালাকের প্রকারভেদ
◊ ইদ্দত আইনের সংক্ষিপ্ত সার
◊ আল-কুর'আনে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ব্যবস্থাপত্র ও পুনর্বাসন পদ্ধতি

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও তালাক আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য। কেননা পরিবার হচ্ছে সমাজ প্রাসাদের প্রথম ইট, সমাজ সংস্থার প্রথম একক। একজন পুরুষ ও একজন নারী যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবাহের মাধ্যমে একত্রে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে শুরু করে, তখনই একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই পুরুষ ও নারীই হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী। এই দুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক যতই সুষ্ঠু-সম্প্রীতি ও সহৃদয়তাপূর্ণ ও আন্তরিক হবে, পরিবারটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ততই দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হবে। এই পরিবারের ফসলই হচ্ছে সন্তান-সন্ততি ভবিষ্যতের প্রজন্ম। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত ও অপ্রীতিকর হলে শুধু যে পরিবারটিই অশান্তিপূর্ণ ও বিপর্যস্ত হবে, তা-ই নয়। তার তিক্ততা সংক্রমিত হয়ে গোটা সমাজকেই বিষাক্ত বানিয়ে দিবে। তাই স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সাম্য এবং পরিবার প্রধান হিসেবে স্বামীর অতিরিক্ত অধিকারের কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, স্ত্রীদের অধিকার ঠিক ততটাই, যতটা প্রচলিত নিয়মে তাদের কর্তব্য। তবে তাদের উপর পুরুষের একমাত্র মর্যাদাধিক্য রয়েছে। স্ত্রীদের অধিকার স্বামীদের উপর-স্ত্রীদের কর্তব্য স্বামীদের প্রতি। অন্য কথায় স্ত্রীদের নিকট স্বামীদের প্রাপ্য ততটা, যতটা তাদের প্রতি স্বামীদের কর্তব্য এবং স্বামীদের উপর স্ত্রীদের অধিকারও ততটা, যতটা তাদের প্রতি তাদের কর্তব্য। এ পর্যায়ে পূর্ণ সমতা ও অভিন্নতার নীতি আল কুর'আন ঘোষণা করেছে।

দাম্পত্য অধিকার

বিয়ের ফলশ্রুতিতে ইসলামী পারিবারিক আইনে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে স্বতই কিছু মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। যখন আকদ বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়, তখন তার যথাবিহিত ফল বাস্তব রূপ লাভ করে এবং তার দাবি অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর অধিকারগুলো অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এই অধিকারগুলো তিন রকম। ক) স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ অধিকারসমূহ, খ) স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার, গ) স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার। স্বামী ও স্ত্রী নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে দাম্পত্য অধিকার সুনিশ্চিত করে তারা উভয়ে জীবনের অনাবিল সুখ, মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে করে। নিম্নে এসব অধিকারসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল:

স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ অধিকারসমূহ

এক. যৌন সম্ভোগ : যৌথ সম্ভোগ এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরস্পরকে তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করার বৈধতা। স্বামী স্ত্রীর অন্যতম যৌথ অধিকার। স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে যৌন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করার অধিকার ও প্রাপ্যতা বৈধ, স্ত্রীর জন্যও স্বামীর কাছ থেকে সেই যৌন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা বৈধ। পরস্পরকে এভাবে ভোগ করা ও একে অপর দ্বারা দৈহিক মিলনের সুখ লাভ করা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার। এ অধিকার উভয়ের একত্রে অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতিত অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা যৌন মিলন একাকী হতে পারেনা।

বিবাহিত নর-নারীর জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্য এবং তাদের দৈহিক, মানসিক ও যৌন স্বাস্থ্য অটুট, অক্ষুন্ন রাখার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিয়মিতভাবে দৈহিক মিলন অপরিহার্য। এর মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের আত্মিক বন্ধন খুবই সুখের হয়। উভয়ে অনাবিল সুখ ও প্রশান্তি লাভ করে। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন নির্ঝঞ্ঝাট, ঝামেলাহীন ও স্বর্গ-সুখের হয়। বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সীমিত কিছু ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আল-কুর'আন স্ত্রী সহবাসের অনুমতি প্রদান করে। যে সকল কারণে সহবাস নিষিদ্ধঃ-

ক. وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 'আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করবে না মসজিদসমূহে ই'তিকাফ করতে থাকা অবস্থায়'।[১] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ই'তিকাফকারী স্ত্রী সঙ্গম করলে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।[২]

খ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ 'রোযার রাত্রিতে স্ত্রী সম্ভোগ তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে'।[৩] সকল জ্ঞানীদের নিকট আয়াতে الرَّفَثُ শব্দের অর্থ الجماع বা স্ত্রী সঙ্গম।

গ. فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ 'ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ কর'।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া সকল অবস্থাতেই স্বামী স্ত্রী পরস্পরে নিজ নিজ সহবাস স্বত্ত্বের অধিকার প্রতিপালনে খুবই যত্নবান ও সজাগ থাকা উচিত। বর্তমান আধুনিক সমাজে দাম্পত্য জীবনে নানাবিধ বিপর্যয় দেখা যায়। পরকিয়া প্রেম, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় মোটেই সচেতন নয়।

---

১ আল কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ১৮৭

২ আবু-বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুর'আন* (মিশর : ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি) খ. ১, পৃ. ৫২৯

৩ আল কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ১৮৭

দুই. স্বামীর পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র স্ত্রীর জন্য চিরতরে অবৈধ। অনুরূপ স্বামীর জন্য ও স্ত্রীর মা, মেয়ে পৌত্র ও দৌহিত্রী চিরতরে হারাম।

তিন. বিয়ের পর স্বামী- স্ত্রী পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। আকদ সম্পন্ন হওয়া মাত্রই স্বামী- স্ত্রী উভয়ে উভয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের উত্তরাধিকার স্বত্ব অর্জন করে। বিয়ের পর সহবাস ছাড়াও যদি দুজনের কেউ মারা যায়, তবে অপরজন তার উত্তরাধিকারী হবে।

চার. স্বামী-স্ত্রীর থেকে জন্মপ্রাপ্ত সকল সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বামীর বিছানায় যে সন্তান জন্ম নিবে, তা ঐ স্বামীর বংশধর হিসেবে স্বীকৃত হবে।

পাঁচ. দম্পতি পরস্পরের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে, যাতে উভয়ের মধ্যে পূর্ণ শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে।[৪]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

আল-কুর'আন স্বামীকে পরিবারের কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। এই কর্তৃত্ব প্রদানের বহুবিদ যুক্তিসংঙ্গত ও বিবেকসম্মত কারণ রয়েছে। তাই স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে সংসার ও পারিবারিক জীবনে স্বামীর কর্তৃত্বকে স্বেচ্ছায় ও নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া এবং দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করা। এই প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা হল:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে কারণে পূণ্যবাণ স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ'।[৫]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী লিখেন, পুরুষের অধিক মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ নেতৃত্বের অধিকার। স্ত্রীকে মোহরানা দান, যাবতীয় ব্যয়ভার বহন, তার সাথে গভীর মিলমিশের সাথে

৪ সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্‌হুস সুন্নাহ* (অনু. আকরাম ফারুক ও অন্যান্য, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৫), খ. ২, পৃ. ১৩৩-১৩৪; ড. জামাল আল বাদাবী, *ইসলামের সামাজিক বিধান* (অনু. মাওলানা মনোয়ার হোসাইন, ঢাকা : ফাহিম বুক ডিপো, ২০০৮), পৃ. ১২০

৫ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৩৪

শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা, নামাজ- রোজা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য তাগিদ করার কাজ স্বামীই করে থাকে। তার বিনিময়ে স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা, স্বামীর পরিবার-পরিজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং যাবতীয় কাজে-কর্মে স্বামীর আদেশ পালন করে চলা,স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার কোনটাই ভঙ্গ না করা।[৬]

স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকারসমূহ

স্বামীর নিকট স্ত্রীর যেসব অধিকার রয়েছে, তা দু'প্রকারের: ১. বস্তুগত ২ নৈতিক। বস্তুগত অধিকার হল, দেনমোহর ও ভরণ-পোষণ, আর নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ভালবাসা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, সদ্ব্যবহার, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা ইত্যাদি। নিম্নে স্ত্রীর অধিকার সমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল।

দেনমোহরের অধিকার

মোহর বা মোহরানা নারী জাতির অনুকূলে ইসলামের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। বিশ্বের অন্য কোন জাতি বা সমাজ নারী সম্প্রদায়ের প্রতি এ রকম বাস্তব সম্মান দেখায়নি। জাহেলিয়াতের যুগে নারীর কোন স্বীকৃত সামাজিক অধিকার ছিল না। এমনকি তার অভিভাবক তার নিজস্ব সম্পত্তি পর্যন্ত যথেচ্ছা ভোগ দখল করতো, তাকে তার মালিকানা হস্তগত করার সুযোগও দিতনা, তা ব্যবহারও করতে দিতনা। ইসলাম তার উপর থেকে এসব নির্যাতন দূর করে এবং তার জন্য দেনমোহর ধার্য করে। এটা ইসলামী আইনের বিধান দেনমোহর অবশ্যই প্রদেয়। দেনমোহর একান্তভাবে স্ত্রীর পাওনা। এ দায়িত্ব থেকে কারো অব্যাহতি নাই। তার পিতা বা কোনো ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কেও তার সম্মতি ব্যতীত তার কাছ থেকে দেনমোহরের কিছু নেয়ার অনুমতি দেয়নি ইসলাম।

আল-কুর'আনে দেনমোহর শব্দের ব্যবহার

স্ত্রীর সম্মানার্থে ইসলামী শরি'য়ত কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে যে অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি স্বামী স্ত্রীকে প্রদান করে তাকে দেনমোহর বলে। আল-কুর'আনে এই শব্দকে اجر 'আজর' বলা হয়েছে। আজর শব্দের অর্থ পুরস্কার বা প্রতিদান। আল-কুর'আন صدقة 'সাদুকাহ্' শব্দও ব্যবহার করেছে। যে মূল থেকে সাদুকাহ্ শব্দ উদ্ভূত হয়েছে তার অর্থ সত্য। আল-কুর'আন فريضة 'ফারীযা' শব্দও ব্যবহার করেছে। এর অর্থ অবশ্য পালনীয়। আল-কুর'আনে نكاحا 'নিকাহান', طولا 'তাওলান' শব্দদ্বয়ও মোহর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৭]

---

৬ আবু-বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবি, প্রাগুপ্ত, খ.১, পৃ. ২১৬

৭ ড. আব্দুল করিম আল-জাইদান, *আল-মুফাস্সাল ফি আহকামিল মার'আতি ও বায়তিল মুসলিম* (বৈরুত : রিসালাহ পাবলিশার্স, ২০০০), পৃ. ৫০

আল-কুর'আনের আলোকে দেনমোহরের বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার পূর্বে দেনমোহর সংক্রান্ত কিছু প্রত্যয়ের (Concept) ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

মোহরের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

এক. বিবাহ চুক্তির অনুষঙ্গরূপে অর্থ কিংবা অন্য সম্পত্তি, যা স্ত্রী পাওয়ার অধিকারী হয় তাকে দেনমোহর বলে।[৮]

দুই. المهر هو المال الذى يجب فى عقدالنكاح على الزوج لزو جته اما اما بالتسمية او بالعقد

'মোহর সেই সম্পদ যা স্বামীর উপর স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য অত্যাবশকভাবে ধার্য্য করা হয়'।[৯]

তিন. فهو (الصداق) اسم للمال الذى يجب للمراة فى عقد النكاح فى مقابلة الاستمتاع بها وفى الوطئ بالشبهة او نكاح فاسد او نحو ذلك'

'দেনমোহর হচ্ছে এমন আর্থিক লাভ যা কোন নারী লাভ করে তাকে ভোগ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ফলশ্রুতিতে, তা যে কোন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে হতে পারে। সেটা বৈধ বিবাহ হোক বা ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহ হোক'।[১০]

চার. -انه اسم للمال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة البضع اما بالتسمية او بالعقد

দেনমোহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বোঝায়, যা বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে, নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে'।[১১]

মোহরে মিছল এর সংজ্ঞা

পাত্রীর সমপর্যায়ের নারীদের জন্য নির্ধারিত মোহরকে 'মোহরে মিছল' (যথাযোগ্য মোহর) বলে। বিবাহের চুক্তিতে মোহরের উল্লেখ না থাকলে অথবা মোহর ধার্য না হয়ে থাকলে উপযুক্ত পরিমাণ মোহর নির্ধারণের জন্য স্ত্রীর পিতৃকুলের অন্যান্য মহিলার মোহরের পরিমাণ কত ছিল তা বিবেচনা করতে হবে। ঐ সময়ে স্ত্রীর সহোদরা ও বৈমাত্রেয় বোনদের এবং তাদের অবর্তমানে তার ফুফুদের মোহরের

---

৮ বোরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল মুরগিনানী, *আল-হিদায়া* (ইউপি : আশরাফী বুক ডিপো, ১৪০১ হি.), খ. ১, পৃ. ৩২৩

৯ ড. আব্দুল করিম আল-জাইদান, *আল-মুফাস্সাল ফি আহকামিল মার'আতি ও বায়তিল মুসলিম* (বৈরুত : রিসালাহ পাবলিশার্স, ২০০০), পৃ. ৫০

১০ আবদুর রহমান আল-যাজারি, *কিতাব আল-ফিকহ্ আলাল-মাজাহিব আল- আরবায়া* (বৈরুত : দার ইহইয়াউ আল-তুরাস আল-ইসলামী, ১৯৭৩), খ. ৪, পৃ. ৯৪

১১ ইবনে আবেদীন, *রাদ্দুল মুখতার 'আলাল দুররুল মুখতার* (পাকিস্তান : করাচি এডুকেশনাল প্রেস, তা.বি), খ.২, পৃ. ৪৫২

সমপরিমাণ মোহর নির্ধারণ করতে হবে।[১২] মোহরে মিছল হচ্ছে সেই মোহর, যা কোনো স্ত্রীর বয়স, সৌন্দর্য, অর্থবিত্ত, বুদ্ধিমত্তা, ধর্ম, কুমারীত্ব, অ-কুমারীত্ব, বসবাসের স্থান এবং অন্য যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে মোহরের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, সেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে বিবাহের আকদের সময় তার সমকক্ষ মহিলাদের সমান মোহর পাওয়ার যোগ্য হয়।[১৩]

আল-কুর'আনে দেনমোহর

বিয়ের ক্ষেত্রে মহরানা দেয়া ফরয বা ওয়াজিব। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে যৌন-স্বাদ গ্রহণ কর, তার বিনিময়ে তাদের 'মোহরানা' ফরয মনে করেই আদায় করো'।[১৪] আয়াতটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

ক. তাফসীরে মাহাসিনুল তা'বীলে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা পুরুষরা বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য সম্পাদন করে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ, তার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্য মোহরানা পুরোপুরি তাদের নিকট আদায় করে দাও, আদায় করো এ হিসেবে যে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে'।[১৫]

খ. এই আয়াতে দেনমোহর পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ইচ্ছায় দেনমোহরের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে পারে। স্বামীরা যেহেতু তাদের স্ত্রী থেকে আনন্দ ও উপকার পায়, তাই তাদের জন্য দেনমোহরের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা স্বামীদেরকে অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে।[১৬] একই প্রসঙ্গে অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'এবং নারীদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে কর এবং তাদের মোহরানা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রদান কর'।

উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে দেনমোহর দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। এজন্যে 'মোহরানা' হচ্ছে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। প্রথম আয়াতে আযাদ ও স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করা সম্পর্কে নির্দেশ এবং দ্বিতীয় আয়াতে দাসী বিয়ে করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। অত্র দু'আয়াতে বিয়ের বিনিময়ে দেনমোহর দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে।

---

১২ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী* আইন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), খ.১, পৃ. ৪৫৪

১৩ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪১

১৪ আল-কুর'আন, আন- নিসা, ৪ : ২৪

১৫ মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন আল-কাসেমী, *মাহাসিন আত-তা'বীল* (মিশর : ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি), খ.৫, পৃ.১৫২

১৬ গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ১৩১

আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখেছেন, দুটি আয়াতেই মহান আল্লাহ দেনমোহরকে বিনিময় স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময়সূচক ও একটি বস্তুর বিপরীতে অপর একটি বস্তু দানের কারবারের মতই ধরে দিয়েছেন। অতএব এটাকে স্বামীর 'অনুগ্রহের দান' মনে না করে একটির পরিবর্তে অন্যটি প্রাপ্তির মত ব্যাপার মনে করতে হবে। অর্থাৎ দেনমোহরানার বিনিময়ে স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহারের অধিকার লাভ।[১৭] একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم

'এবং সধবা নারীগণ ছাড়া আর সব মহিলাকেই তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে'।[১৮]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী লিখেন, 'আল্লাহ মহান হুকুমদাতা যিনি স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহার হালাল করেছেন ধন-মালের বিনিময়ে ও বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতা রক্ষার্থে, ব্যভিচারের জন্য নয়। আর একথা প্রমাণ করে যে, বিয়েতে দেনমোহর দেয়া ওয়াজিব অর্থাৎ ফরয'।[১৯] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। হ্যাঁ, তবে স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে উক্ত মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা তৃপ্তি সহকারে উপভোগ কর'।[২০]

আয়াতটির বিশ্লেষণ হল, স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর তাদের প্রাপ্য জিনিস হিসেবে কোন বিনিময় ছাড়াই দাও। কোনো রূপ বল প্রয়োগ, লজ্জা, দ্বিধা ও ধোকা, প্রতারণা ছাড়া মোহরের মালিকানা লাভ করার পর তা থেকে যদি কিছু তারা দেয়, তবে তা নির্দ্বিধায় ভোগ করতে ও গ্রহণ করতে পারো। এতে কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু যদি স্ত্রী তার সম্পদের কোনো অংশ লজ্জায়, ভয়ে বা প্রতারণার কারণে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা হালাল হবে না।[২১]

উক্ত আয়াত হতে স্ত্রীদের মহরানা প্রদান করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে কিছু নীতিমালা ও বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। এ সকল বিধি-বিধান নিম্নরূপ :

ক. এই আয়াতে দেনমোহর প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে। এই আদেশ প্রথমত স্বামীর উপর প্রযোজ্য। স্বামীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেনমোহর প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দেনমোহরের ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন

---

১৭ আবু-বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কোরআন* (মিশর : ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি), খ.১, পৃ. ৩৮৭

১৮ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৪

১৯ আবু-বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবি, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৮৭

২০ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৪

২১ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩৪

অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসন্তুষ্টি থাকলে চলবে না। অবশ্য দেনমোহর খুব বেশি হওয়া উচিত নয়। অন্যথায় স্বেচ্ছায় এবং নির্দ্বিধায় দেনমোহর দেয়ার যে বিধান আছে তা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হবে।[২২]

খ. মোহরের একচ্ছত্র অধিকারীনী হচ্ছে স্ত্রীগণ, তাদের অভিভাবকগণ নয়। যদি অভিভাবকগণ মোহর আদায় করে থাকে তবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে-সেই মোহরের প্রকৃত হকদার স্ত্রীলোককে পৌঁছিয়ে দেয়া।[২৩]

স্ত্রীর জন্য ধার্য করা এই মোহর একদিকে যেমন তার অর্থনৈতিক স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তেমনি তা তার মনকে পরিতুষ্ট করে এবং তার উপর স্বামীর কর্তৃত্বের অধিকার ও ক্ষমতাকে মেনে নিতে উদ্ধুদ্ধ করে। সেই সাথে এ দ্বারা উভয়ের সম্পর্ক মজবুত হয় এবং মায়া -মমতা গভীরতর হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে'।[২৪]

এই আয়াত মোহরের মধ্যে নারীর সুস্পষ্ট ও ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণ করে। জাহেলী সমাজে বিভিন্ন পন্থায় এই অধিকার হরণ করে স্ত্রীর উপর নানভাবে যুলুম ও অবিচার করা হতো, এ আয়াত সেদিকেই ইংগিত করে। জাহেলী সমাজের কিছু কু-প্রথা নিম্নরূপঃ

ক. স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তারা তার হাতে পৌঁছাতো না, স্ত্রীর অভিভাবকরা তা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। নারী যেন বিক্রিযোগ্য সামগ্রী আর তার অভিবাবক হচ্ছে সেই বিক্রয়ের অধিপতি। এটা ছিলো অবশ্যই একটা নির্যাতনমূলক প্রথা বা রেওয়াজ।

খ. অভিভাবক তার অধীনস্থ কোনো মহিলাকে অপর ব্যক্তির কাছে এ শর্তে বিয়ে দিত যে, সেও তার কাছে তার মেয়েকে বিয়ে দিবে। এখানে নারীর অদল- বদল চতুস্পদ জন্তুর অদল বদলের মতো। ইসলাম এই বিয়েকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এবং আগ্রহ ও পছন্দের ভিত্তিতে দুটি আত্মার মিলনকেই বিয়ের ভিত্তি বলে নির্ধারণ করেছে, আর মোহরকে সাব্যস্ত করেছে নারীর অধিকার ও প্রাপ্য হিসেবে। শুধু নারীই তা গ্রহণ করবে, তার অভিভাবক নয়।

দান ও উপহার সামগ্রী যেমন স্বেচ্ছায় ও খুশী মনে কাউকে দেয়া হয় ঠিক তদ্রূপ এই মোহরও স্বামী তার স্ত্রীকে খুশী মনেই দিবে। অতঃপর স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তার মোহরের কিছু অংশ অথবা পুরো অংশ তার স্বামীকে দিয়ে দিতে চায়, তবে সে অধিকারও তার থাকবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর খুশী

২২ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

২৩ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (র.), *তাফসীর খাযাইনুল ইরফান* (চট্টগ্রাম : গুলশান-ই- হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, ২০১০), পৃ. ১৫৬

২৪ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৩৪

মনে ছেড়ে দেয়া ও মাফ করে দেয়া মোহর গ্রহণ করা এবং হালাল মনে করে তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করা স্বামীর জন্যে সম্পূর্ণ বৈধ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও বন্ধন হবে এরূপ পূর্ণ সন্তুষ্টি ও নিরংকুশ সম্পর্ক।[২৫]

যে সব অবস্থায় সম্পূর্ণ মোহর দেয়া ওয়াজিব

১. যখন প্রকৃত অর্থে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটে। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে রাশি রাশি অর্থ দিয়ে থাক এবং তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিওনা। তোমরা কি তা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচারের মাধ্যমে ফেরত নিবে ? কিভাবে তোমরা তা ফেরত নিবে অথচ তোমরা পরস্পরে সংগম করেছো এবং সে নারীরা তোমাদের কাছ থেকে কঠোর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে' ?[২৬]

২. স্বামী স্ত্রীর কোন একজন যদি যৌন মিলনের পূর্বেই মারা যায়। এটা সর্বসম্মত মত।[২৭]

৩. ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে, স্বামী যখন তার স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করা যায় এমন নিভৃত সাক্ষাতে মিলিত হয়, তখনই নির্ধারিত সম্পূর্ণ মোহর প্রাপ্য হয়ে যায়। এই নিভৃত সাক্ষাতকার দ্বারা উভয়ের এমন জায়গায় সাক্ষাত বুঝায় যেখানে তাদের উপস্থিতি কেউ টের পাবে না মর্মে উভয়ে নিশ্চিত থাকে। তাদের দু'জনের কেউ এমন অবস্থার উপণীত থাকেনা যা শরি'য়ত অনুযায়ী যৌন মিলনের অন্তরায়।[২৮] ইমাম মালেক বলেছেন, স্বামী যখন সংগমের উদ্যোগ নিয়ে স্ত্রীর উপর চড়াও হয় এবং স্ত্রী সহবাসের উপযুক্তভাবে শুয়ে পড়ে তখন কার্যত সহবাস না করলেও মোহর প্রাপ্য হয়ে যায়।[২৯]

অর্ধ-মোহরের প্রাপ্যতা

আকদের সময় মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকলে এবং সহবাসের আগে স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর উপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন,

---

২৫ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৫৪
২৬ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২০-২১
২৭ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪০
২৮ প্রাগুক্ত।
২৯ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪০

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'যদি তোমরা স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, এবং এর আগেই এদের জন্য মোহর নির্ধারণ করে থাকো, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক দিতে হবে। তবে (প্রাপ্ত বয়স্কা) স্ত্রীরা অথবা বিয়ের আকদ যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সে (স্বামী বা ওলি) ক্ষমা করে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তোমরা ক্ষমা দিবে এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে মহানুভবতা দেখাতে ভুলে যেওনা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন'।[৩০] তবে যে মোহর তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক দিতে হবে। সংগমের উপযুক্ত নিভৃত সাক্ষাতকার দ্বারা অর্ধ মোহরের বেশি প্রাপ্য হয় না। স্পর্শের আগে তালাক দেয়া হলে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। আর স্পর্শের অর্থ হলো প্রকৃত ও পূর্ণ যৌন মিলন। নিছক নিভৃতে সাক্ষাৎ করলেই যৌন মিলন হয়না। কাজেই সে ক্ষেত্রে পুরো মোহর প্রাপ্য হয় না। স্বামী যদি দাবী করে, সে স্ত্রীকে স্পর্শ করেছে, তবে তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, যখন কোনো পুরুষের নিকট তার স্ত্রী আসে, অতঃপর সে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং দাবি করে, সে তাকে স্পর্শ করেনি, তখন তার উপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে। আব্দুর রাজ্জাক ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, স্ত্রীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত পুরো মোহর স্বামীর নিকট প্রাপ্য হবে না।[৩১]

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মোহর প্রাপ্তির অধিকার

মোহরানা স্ত্রীর স্থায়ী অধিকার। কোন অবস্থাতেই এই মোহরানার অধিকার ক্ষুন্ন হয় না। এমনকি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মোহরানা অনাদায় থাকলে স্বামীকে অনতিবিলম্বে মোহরানা পরিশোধ করার জন্য আল-কুর'আন নির্দেশ দিয়েছে।

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

'যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করেছ অথবা তাদের জন্য মোহরানা ধার্য করেছ, তাদের তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই।[৩২] একই প্রসঙ্গে অন্যত্র এসেছে,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

৩০ আল-কুর'আন, আল বাকারা, ২ : ২৩৭
৩১ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪০
৩২ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩৬

'তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের দোষ নাই'।[৩৩] একই প্রসঙ্গে অন্যত্র এসেছে,

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

'যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ অথবা তাদের জন্য মোহর ধার্য করেছ, তাদের তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত সংস্থানের ব্যবস্থা করবে'।[৩৪] একই প্রসঙ্গে অন্যত্র এসেছে,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মোহর ধার্য করে থাক তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয়; এবং মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।[৩৫] এই দুই আয়াতে তালাকের সাথে দেনমোহরের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। বিবাহের পরও যদি দেনমোহর নির্ধারিত না হয় এবং সে অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে স্বামী দেনমোহর দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু তবুও এক্ষেত্রে স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা স্বামীকে করতে হবে। কি পরিমাণ অর্থ এ ব্যাপারে দিতে হবে তা নির্ভর করবে স্বামীর অবস্থার উপর। তবে যত বেশি দেয়া যায় তত বেশি পুণ্যের কাজ হবে। বিবাহ নিষ্পন্ন এবং দেনমোহর নির্ধারিত হওয়ার পর কিন্তু স্বামী-স্ত্রীরূপে মিলিত হবার পূর্বে যদি তালাক হয়ে যায় তবে নির্ধারিত দেনমোহরের অর্ধেক দিতে হবে। এখানেও অবশ্য মাফ করে দেবার বিধান আছে। নারী এবং পুরুষ উভয়কেই এই সময় উদার হবার আহবান জানানো হয়েছে।[৩৬]

এই আয়াতের টিকায় মাওলানা আকরম খাঁ লিখেন, তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ অনন্যাপায় অবস্থায়। কিন্তু এটা দ্বারা সমাজ জীবন নানা দিক দিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির

---

৩৩ আল-কুর'আন, আন -নিসা, ৪ : ২৪
৩৪ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩৬
৩৫ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩৭
৩৬ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

সঞ্চার হয়, সেগুলির যথাসম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থায়াও কুর'আন মজীদে বর্ণিত হয়েছে। উপরের আয়াত দুটিও সেই সব ব্যবস্থার অন্তর্গত।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোহরানার প্রাপ্যতা

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে মোহরানা পাওয়ার অধিকারী:

১। বিবাহের সময় যে স্ত্রীর মোহর নির্ধারিত হয়েছে এবং যার নির্ধারিত সহবাসও হয়েছে, এরূপ স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহরের অধিকারিণী, তা কোন অংশ গ্রহণ করার বা পরিশোধ না করার অধিকার স্বামীর থাকবে না। তিন তোহর বা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত তাদেরকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

২। যার মোহর নির্ধারিত হয় নাই ও যার সাথে স্বামীর সহবাসও ঘটে নাই, সেই শ্রেণীর স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে স্বামীর উপর মোহর সম্বন্ধে কোন আইনগত দায়িত্ব বর্তায় না বটে, কিন্তু এদের জন্য 'নিজের অবস্থা অনুসারেও বিহিতভাবে কোন একটা সংস্থান করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য হবে। সূরা আল-বাকারার ২৩৬ নং আয়াতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা আল আহযাবের ৪৯ নং আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী এই শ্রেণীর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দত পালন করতে হয় না।[৩৭]

৩। মোহর নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু সহবাস ঘটেনি। সূরা আল-বাকারার ২৩৭ নং আয়াতে বর্ণিত বিধান মতে এরা নির্ধারিত মহরানার অর্ধেক পাওয়ার অধিকারিণী হবে।

৪। মোহর নির্ধারিত হয়নি, অথচ সহবাস হয়েছে এরূপ পরিস্থিতিতে সূরা আন-নিসার ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত বিধান মতে সম্পূর্ণ মোহর পরিশোধ করতে হবে। সূরা আল-বাকারার ২৩৭ নং আয়াতের শেষভাগ বলা হয়েছে যে, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার প্রাপ্য অর্ধেক ছেড়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে স্বামী ও স্ত্রীকে অর্ধেকের স্থলে সম্পূর্ণ মোহর দিয়ে দিতে পারে-বরং এটাই হবে সুসঙ্গত ও সুসংযত কাজ। এরূপ তালাকের ফলে স্ত্রীর মনে দারুণ আঘাত লাগার কথা। তালাকের ঘটনার দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারবর্গের মধ্যে এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারই কিছুটা প্রতিকারের জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন। এর সারমর্ম এই যে, স্ত্রী যদি আত্মসম্মান জ্ঞানের ফলে ঐরূপ হঠকারী স্বামীর প্রদত্ত মোহরের অর্ধাংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, বা মাফ করে দেয় এবং পক্ষান্তরে স্বামী যদি নিজের অন্যায় কাজের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হিসেবে সম্পূর্ণ মোহরই স্ত্রীকে দিয়ে দেয়, তাতে কোন অন্যায় তো হবেই না, বরং এখানে তাকে খোদাভিরুতার কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮]

---

৩৭ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর,অতঃপর তাদেরকে সম্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নাই। অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দিবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দিবে'। দ্র. আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৪৯

৩৮ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

মোহরের পরিমাণ

ইসলামী শরি'য়ত মোহরের কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। কেননা মানুষের দারিদ্র ও ধনাঢ্যতার মান বিভিন্ন রকমের। তাদের সচ্ছলতা ও অনটনের স্তরেরও রকমফের রয়েছে। আবার প্রত্যেক পক্ষেরই নিজস্ব কৃষ্টি, অভ্যাস ও ঐতিহ্য সংস্কৃতি রয়েছে। তাই সীমা নির্ধারণ না করে প্রত্যেকের নিজ নিজ সাধ্য ও ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থাভেদে এবং নিজ নিজ গোত্রের রীতি- প্রথার আলোকে তা স্থির করে নিবে। এ সংক্রান্ত সকল ভাষ্য এবং ইংগিতই দেয় যে, স্থায়ী মূল্য আছে এমন কিছুই মোহর হিসেবে দেয়া উচিত। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। একটা ধাতব আংটি, কিংবা এক ঝুড়ি খোরমা কিংবা কুর'আনের কোন শিক্ষাও মোহর হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তাতে উভয় পক্ষ একমত হয়।[৩৯] আধুনিক কালে ' এমন যে কোন জিনিস মোহর হিসাবে ধার্য হতে পারে যার মধ্যে মাল তথা সম্পদ এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং যা হারাম নয়। যেমন- নগদ টাকা-পয়সা, ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য, জায়গা-জমি কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদি।[৪০]

আমের বিন রবিয়া থেকে বর্ণিত, বনু ফাযারার জনৈক মহিলা এক জোড়া জুতাকে মোহর হিসেবে গ্রহণ করে বিয়ে করে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি কি এক জোড়া জুতার বিনিময়ে নিজেকে সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছ ? সে বললো, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (স.) তাকে অনুমতি দিলেন।[৪১] কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ীন নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে মহরানার একটা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম এবং সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই সম্পর্কে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

'তোমরা যদি এক স্ত্রী গ্রহণের সংকল্প কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না'।[৪২]

শা'বী, ইবরাহীম নখয়ী ও অন্যান্য তাবেয়ীও এ মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, জুফার, হাসান ইবনে জিয়াদেরও এই মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ

---

৩৯ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩৫

৪০ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৫৪

৪১ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), *সুনানে তিরমিযী* (ঢাকা: মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ, তা.বি), কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১১১২, পৃ. ২১১

৪২ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২০

সাইদ খুদরী (রা.) হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আতা প্রমুখ ফকীহ্ বলেছেন, 'বিয়ে কম পরিমাণ মোহরানায়ও শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ হয়ে বেশী পরিমাণ মোহরানায়ও'।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এক 'নাওয়াত' পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা বাবদ দিয়েছিলেন। তার মূল্য বড়জোর তিন দিরহাম মাত্র। আর কেউ বলেছেন পাঁচ, কেউ বলেছেন দশ দিরহাম। ইমাম মালিক বলেছেন, নিম্নতম মোহরানার পরিমাণ হচ্ছে এক 'দীনারের এক-চতুর্থাংশ।[৪৩] এসব হচ্ছে ইসলামের বিশেষজ্ঞ মনীষীদের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ইজতিহাদ। এর মূলে কুর'আন ও সুন্নাহ্র কোন অকাট্য দলীল নেই।

প্রকৃত বিয়েতে দেনমোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কিছু বেঁধে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। বরং যা কিছু ধার্য করা হবে তা একদিকে যেমন স্ত্রীর প্রাপ্য আল্লাহর দেয়া অধিকার, অপরদিকে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ স্ত্রীর অঙ্গের অধিকার হালাল করার একটি পুরস্কারও বটে। অতএব তা ধার্য করতে হবে তাকে ঠিক ঠিকভাবে ও যথাসময়ে স্ত্রীর নিকট আদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। এজন্যে ইসলামে যেমন মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি এ জিনিসকে একমাত্র মেয়েদেরই প্রাপ্য ও তাদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে পিতা বা ওলী-গার্জিয়ানের কোন হক নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মোহরানা যখন স্ত্রীদের জন্যে আল্লাহর বিশেষ দান, তখন তা আদায় করা স্বামীদের পক্ষে ফরয এবং তা হচ্ছে স্ত্রীদের আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার। বিয়ে হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর বিনিময়মূলক একটি বন্ধন। বিয়ের পর একজন অপরজনকে নিজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। প্রতেকে অপরজনের থেকে যেটুকু উপকার লাভ করে, তাই হচ্ছে অপর জনের ফায়দার বিনিময়-বদল। আর মোহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'য়ালা তা স্বামীর উপর অবশ্যই দেয়া ফরয করে দিয়েছেন। এজন্যে যে, বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর উপর খানিকটা অধিকার সম্পন্ন মর্যাদা লাভ করে থাকে।

ভরণ-পোষণের অধিকার

জীবন যাপনের ব্যয় দ্বারা এখানে স্ত্রীর খাদ্য, বাসস্থান, সেবা ও চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা বুঝানো হয়েছে। স্ত্রী নিজে ধনী হলেও স্বামীর নিকট এগুলো তার প্রাপ্য। কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এটি অপরিহার্য তথা ওয়াজিব প্রমাণিত। কুর'আন দ্বারা এটি ওয়াজিব প্রমাণিত হয়

---

৪৩ আবু বকর আহমাদ আল-জাস্‌সাস (র.), *আহকামুল কুর'আন* (বৈরূত : দার আল কিতাব আর আরাবী, ১৩৫৫হি.), খ.২, পৃ. ১৭০

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা:

১. মহান আল্লাহ বলেন,

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ

'সন্তানের পিতার কর্তব্য হলো, প্রসূতির যথাবিধি ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়না'।[৪৪] এ আয়াতে 'যথাবিধি ভরণ-পোষণ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে, শরি'য়তের বিধি ও স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাদ্য ও পোষাক যা প্রয়োজনের চেয়ে কমও বেশি নয়। সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, আহার সংস্থান ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী-যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোন পিতাকেই তার শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে- এমন মান বা পরিমাণ তার উপর চাপানো যাবে না।[৪৫]

আলোচ্য এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালন করা স্ত্রীর কাজ; আর তার ও তার সন্তানের ভরণ পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব স্বামীর। এর ফলে স্ত্রীরা খোরপোশের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এর প্রভাব তাদের মনে ও জীবনে সুদূরপ্রসারী হবে।[৪৬] রাসূলে করীম (স.) স্বামীদের লক্ষ্য করে তাই ইরশাদ করেছেন,

اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ

'স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে'। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) আরো বলেন, যখন তুমি আহার করবে, তখন তাকেও খেতে দেবে। আর যখন তুমি যা পরবে, তখন তাকেও তা পরাবে এবং তাকে গালমন্দ করবে না ও মারধর করবে না।[৪৭]

কেবল মাত্র মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের বদলে সহানুভূতিমূলক নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য।[৪৮]শোভনীয় মান অনুপাতে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য, যেন সে নিশ্চিন্তে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পারে'।[৪৯]

১. এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুর'আনে ঘোষণা করেছেন,

---

৪৪ আল-কুর'আন, আল বাকারা, ২: ২৩৩

৪৫ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪৫

৪৬ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, *ফতহুল কাদির* (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৩), খ.১, পৃ. ২১৮

৪৭ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.) *আবু দাউদ* (ঢাকা : মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ, তা.বি), হাদীস নং ২১৪৫, পৃ. ২৯২

৪৮ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১৯০

৪৯ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

'যে লোককে অর্থ-সম্পদে সাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসেবেই তার স্ত্রী-পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয়-উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন'।[৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেন, 'এ আয়াতে সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুপাতে ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাদের আয়-রোজগার সংকীর্ণ, সচ্ছল নয়, তারা আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার বেশী করার কোন দায়িত্ব তাদের নেই'।[৫১]

ইসলামী শরি'য়তে স্ত্রীদের জন্যে খরচ বহনের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে কিনা- এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বলেছেন, স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোন পরিমাণ শরি'য়তে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা বিচার-বিবেচনার উপরই নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচনীয়। সচ্ছল অবস্থার স্ত্রীর জন্য সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরূপভাবে অভাবগ্রস্ত স্ত্রীর জন্য অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ- পোষণের নিম্নতম দায়িত্ব পালন করবে।[৫২] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে তোমরা বাস করো, তোমাদের তালাক প্রদত্ত স্ত্রীদেরকেও সেরূপ গৃহে বাস করতে দাও। তাদেরকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে উত্যক্ত করবেনা। আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে তাদের গর্ভের সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে'।[৫৩] সুন্নাহ বা হাদিস দ্বারা স্ত্রীদের ভরণ- পোষণ (নাফকা) ওয়াজিব প্রমাণিত হয় নিম্নো হাদিসমূহ দ্বারা:

১. রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জে বলেছেন, 'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর বাণী দ্বারা এবং তাদের সাথে যৌন মিলন বৈধ করেছ আল্লাহর বাণী দ্বারা। তাদের কর্তব্য, তারা যেন তোমরা পছন্দ করনা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা

---

৫০ আল-কুর'আন, আত-তালাক, ৬৫ : ৭
৫১ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৩৯
৫২ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসিরে মাজহারী* (ইউপি : জাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি), খ.৯, পৃ. ৩৩১
৫৩ আল-কুর'আন, আত- তালাক, ৬৫ : ৬

মাড়াতে না দেয়। যদি মাড়াতে দেয়, তবে তাদেরকে এমন প্রহার করো, যা তাদের জন্য অনিষ্টকর হবে না। সর্বাবস্থায় তাদের ভরণপোষণ বিধিসম্মতভাবে করা তোমাদের কর্তব্য'।[৫৪]

২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী (উৎবা-কন্যা) রাসূলে করীম (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.), আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজন মত গ্রহণ করে থাকি। এ কাজ জায়েয কিনা ? তখন নবী করীম (স.) তাকে বললেন, সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানাদির প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।[৫৫]

৩. মুয়াবিয়া আল কুশাইরী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ, আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কী কী অধিকার ? তিনি বললেন, তুমি নিজে যখন খাবে, তখন তাকেও খাওয়াবে, নিজে যে পোশাক পরবে, তখন তাকেও পরাবে, মুখের উপর মারবেনা, তাকে ভর্ৎসনা করতে হলে এবং সাময়িকভাবে সম্পর্ক বর্জন করতে হলে বাড়িতে রেখেই করবে।[৫৬]

ইজমা দ্বারা এটি ওয়াজিব প্রমাণিত হয় এভাবে, ইবনে কুদামা বলেন, স্বামীরা যদি প্রাপ্ত বয়স্কা হয়, তবে তাদের স্ত্রীদের ভরণপোষণ করা দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। অবশ্য স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর ভরণপোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব নয়। ইবনুল মুনযির প্রমুখ বলেন, এর মধ্যে এই শিক্ষাটা পাওয়া যায় যে, স্ত্রী স্বামীর কাছে অধীনস্থ। সে তাকে কাজ করা ও আয় রোজগার করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই তার জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহ করা স্বামীর কর্তব্য।[৫৭]

ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

শরি'য়ত স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে, শুধু এজন্য যে, বিশুদ্ধ বিয়ের আকদের দাবি অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর অধীনস্থ এবং তার দাবি ও অধিকারের নিকট আটক হয়ে থাকে, যাতে সে তাতে স্থায়ীভাবে ও সার্বক্ষণিকভাবে ভোগ করতে ও তার দ্বারা নিজের যৌন আবেগ চরিতার্থ করতে পারে। সে তার আনুগত্য করতে, তার বাড়িতে সর্বক্ষণ অবস্থান করতে, তার সংসার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করতে এবং তার সন্তানদের লালন পালন করতে বাধ্য। এর বিনিময়ে স্বামী তার সকল প্রয়োজন মেটাতে ও তার ভরণপোষণ করতে ততক্ষণ বাধ্য, যতক্ষণ তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকে এবং কোন

৫৪ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম* (কলকাতা : দার আল-ইশায়াদ ইসলামীয়া, তা.বি), কিতাবুল হজ্জ, খ.১, পৃ. ৩৯৭

৫৫ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (র.), *সহীহ্ বুখারি* (কলকাতা : দার আল-ইশায়াদ ইসলামীয়া, তা.বি), কিতাব আল- নাফকাত, হাদীস নং ৫১৫৫, খ.২, পৃ. ৮০৮

৫৬ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪৬

৫৭ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪৬

অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ এবং এমন কোন কারণ না ঘটে, যা ভরণপোষণের অন্তরায়। এ ব্যাপারে প্রচলিত ও সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, 'অন্যের অধিকার রক্ষার্থে ও সেবার্থে যাকে যাকে আটক রাখা হয়, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর বর্তায়, যে নিজ স্বার্থে তাকে আটক রাখে।

ভরণ-পোষণের হকদার হওয়ার শর্তাবলী

নিম্ন লিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে স্ত্রী ভরণ পোষণের হকদার সাব্যস্ত হয় :

১. বিয়ের আকদ সঠিক ও বিশুদ্ধ হতে হবে।

২. স্ত্রীর স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

৩. স্বামীর সন্তুষ্টি অনুযায়ী স্ত্রীর স্বামীকে যৌন মিলন করতে দিতে হবে ।

৪. স্বামী যেখানে বাসস্থান স্থানান্তর করতে চায়, সেখানে যেতে স্ত্রীর আপত্তি থাকবে না। (অবশ্য স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী তার ক্ষতি সাধন করতে চায়, কিংবা স্থানান্তরে গেলে নিজের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে সে শংকিত হয়, তাহলে স্ত্রী অসম্মত হতে পারে।

৫. উভয়ে যৌন মিলনে সক্ষম হতে হবে।

এসব শর্তের একটিও যদি অপূর্ণ থাকে তবে ভরণপোষণ দেয়া ওয়াজিব হবেনা। কেননা আকদ যদি বিশুদ্ধ না হয়, বরং অবৈধ বা অশুদ্ধ হয়, তাহলে তো স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ অনিবার্য ও ওয়াজিব হয়ে যায়, যাতে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় রোধ করা যায়।[৫৮]

আলোচনার সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীতে অতি স্বাভাবিকভাবেই কর্মবন্টন করে দেয়া হয়েছে। যে যৌন মিলনের সুখ ও মাধুর্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমানভাবে ভোগ করে, তার সুদূরপ্রসারী পরিণতি কেবল স্ত্রীকেই ভোগ করতে হয় প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী। পুরুষকে তার কোন ঝুঁকিই গ্রহণ করতে হয় না। এ হচ্ছে এক স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। কাজেই স্ত্রী প্রকৃতির এই দাবি পূরণে সতত প্রস্তুত থাকবে, আর স্বামী তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্যে দায়ী হবে। মূল ব্যাপারে সমান অংশীদারিত্বের এটা অতি স্বাভাবিক দাবি।

স্ত্রীর প্রাপ্য নৈতিক অধিকারসমূহ

আল-কুর'আন স্বামীর নিকট স্ত্রীর বস্তুগত অধিকার প্রাপ্তির সুনিশ্চয়তার বিধানের পাশাপাশি তার নৈতিক অধিকারগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। স্ত্রীর নৈতিক অধিকারগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

সদ্ব্যবহার: স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সর্বপ্রথম যে কর্তব্য তা হল, তার সাথে ভদ্রজনোচিত আচরণ করা। সদ্ব্যবহার করা, প্রচলিত নিয়মে তার সাথে আচরণ করা, যতদূর সম্ভব এমন আচরণ করা, যা তার মনে স্বামীর প্রতি মমত্ব জন্মায় এবং তার পক্ষ থেকে বিরক্তিকর কিছু পাওয়া গেলে তার প্রতি ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ বলেন,

---

৫৮ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪৬

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'স্ত্রীদের সাথে প্রচলিত নিয়মে ভালো ব্যবহার কর। তোমাদের যদি তাদেরকে অপছন্দ কর। তাহলে মনে রেখো, তোমরা হয়তো কোনো জিনিসকে অপছন্দ করবে, অথচ আল্লাহর তার মধ্যে প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন'।[৫৯]

মাওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন, 'স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার ও তাকে নিয়ে ভালভাবে বসবাস করার অর্থ হচ্ছে কার্যত তাদের প্রতি ইনসাফ করা, তাদের অধিকার সমূহ রীতিমত আদায় করা এবং কথাবার্তায় ও আলাপ-ব্যবহারে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন। আর তারা তাদের কুশ্রীতা কিংবা খারাপ স্বভাব-চরিত্রের কারণে যদি তোমাদের অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের জন্যে ধৈর্যধারণ কর, তাদের না বিচ্ছিন্ন করে দিবে, না তাদের কষ্ট দিবে, না তাদের কোন ক্ষতি করবে।[৬০]

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ আয়াতে স্বামীদেরকে এক ব্যাপক হেদায়েত দেয়া হয়েছে। স্বামীদের প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা যাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে তার প্রতি সব সময়ই খুব ভাল ব্যবহার করবে, অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। আর প্রথমেই যদি এমন কিছু দেখতে পাও যার দরুন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে ঘৃণার্হ হয়ে পড়ে এবং যার কারণে তার প্রতি তোমার মনে প্রেম-ভালবাসা জাগার বদলে ঘৃণা জেগে উঠে, তাহলেই তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করা না। বুদ্ধির স্থিরতা ও সজাগ বিচক্ষণতা সহকারে শান্ত থাকতে ও পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সেই সঙ্গে একথাও বোঝা উচিত যে, কোন নারীই সমগ্রভাবে ঘৃণার্হ হয় না। যার একটি দিক ঘৃণার্হ, তার এমন আরো সহস্র গুণ থাকতে পারে, যা এখনো তোমার সামনে উদঘাটিত হতে পারেনি।

কেননা, কোন নারীই সম্পূর্ণরূপে মন্দের প্রতিমূর্তি হয় না। কিছু দোষ থাকলে অনেকগুলো গুণও তার থাকতে পারে। সেই কারণে কোন কিছু খারাপ লাগলে অমনি অস্থির, চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া স্বামীর উচিত নয়। তার অপরাপর ভাল দিকের উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া এবং সেজন্য অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। আল্লামা আহমাদুল বান্না এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'কোন মুমিনের উচিত নয় অপর কোন মুমিন স্ত্রীলোক সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃণা পোষণ করা, যার ফলে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিতে পারে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে মেয়েলোকটির ভাল গুণের খাতিরে তার দোষ ও মন্দদিক ক্ষমা করে দেয়া আর তার মধ্যে ঘৃণার্হ যা আছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা, বরং তার প্রতি

---

৫৯ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ১৯
৬০ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫০

ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করা। হতে পারে তার স্বভাব-অভ্যাস খারাপ; কিন্তু সে বড় দ্বীনদার কিংবা সুন্দরী রূপসী বা নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পন্না অথবা স্বামীর জন্যে জীবন সঙ্গিনী'।[৬১]

স্ত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের স্বরূপ

স্ত্রীদের উপর অন্যায়ভাবে, অকারণে ও উঠতে-বসতে আর কথায়-কথায় কোনরূপ দুর্ব্যবহার, মারধর করতে শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত করা হয়নি, ইসলাম আরো অগ্রসর হয়ে স্ত্রীদের প্রতি সক্রিয়ভাবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বামীদেরকে। এ পর্যায়ে কুর'আন বলেছে, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'স্ত্রীদের সাথে যথাযথভাবে খুব ভাল ব্যবহার করবে'।[৬২] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাসেমী লিখেছেন, 'স্ত্রীদের সাথে কার্যত ইনসাফ করে আর ভাল ও সম্মানজনক কথা বলে একত্রে বসবাস কর, যেন তোমরা স্ত্রীদের বিদ্রোহ বা চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে না বস। এ ধরনের কোন কিছু করা তোমাদের জন্য আদৌ হালাল নয়'।[৬৩] আল্লামা আলুসী লিখেছেন, 'তাঁদের সাথে ভালভাবে ব্যবহার কর। আর 'ভালভাবে' মানে এমনভাবে যা শরি'য়ত ও মানবিকতার দৃষ্টিতে অন্যায় নয়-খারাপ নয়'। এ 'ভালভাবে' কথার মধ্যে এ কথাও শামিল, স্ত্রীকে মারধর করবে না, তার সাথে কথাবার্তা বলবে না এবং তাদের সাথে সদা হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্তে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে'।[৬৪]

তাফসীরকারীদের মতে এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি ঘরের কাজ কর্ম করতে অক্ষম হয় বা তাতে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে স্বামী তার যাবতীয় কাজ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য।[৬৫] স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, 'যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল'।[৬৬] অপর এক হাদীসে স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসুলে করীম (স.) এর নিজের ভূমিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক সে, যে তার পরিবার ও স্ত্রী-পরিজনের পক্ষে ভাল। আর আমি আমার নিজের পরিবারবর্গের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল। তোমাদের সঙ্গী স্ত্রী বা স্বামী যদি মরে যায়, তাহলে

---

৬১ আল্লামা আহমাদুল বান্না, *বুলুগুল আমানী* (দিল্লি : মাকতাবাতি ইশায়াতিল ইসলাম, তা.বি.), খ.১২, পৃ. ২৩২
৬২ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১৯
৬৩ মুহাম্মদ জামালুদ্দিন কাসেমী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১১৫৮
৬৪ আল্লামা আবুল ফজল শিহাবুদ্দিন আস-সাইয়্যেদ মাহমুদ আল-আলুসি আল বাগদাদী, *রুহুল মা'য়ানী* (মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৫), খ.৪, পৃ. ২৪৩
৬৫ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৩
৬৬ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত- তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৬২, খ.১, পৃ. ২১৯

তার কল্যাণের জন্যে তোমরা অবশ্যই দোয়া করবে'।[৬৭] হযরত আবু যুবাব (রা.) বলেন, একদা নবী করীম (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন,

لاَتَضْرِبُوْاَمَاءَ اللهِ

'তোমরা আল্লাহর দাসীদের মারধোর কর না'। তখন হযরত উমর ফারূক (রা.) রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

ذَئِرْنَ النِّسَاءُعَلى اَزْوَاجِهِنَّ

আপনার এ কথাটি শুনে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। তখন নবী করীম (স.) তাদেরও মারবার অনুমতি দিলেন। একথা জানতে পেরে বহু সংখ্যক মহিলা রাসূলের ঘরে এসে উপস্থিত হল এবং তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অভিযোগ পেশ করল। সব কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, لَقَدْ طَافَ بِالِ مُحَمَّدْ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولئِكَ بِخَيَارِكُمْ

বহু সংখ্যক মহিলা মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের নিকট এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে গেছে। মনে হচ্ছে, এসব স্বামী তোমাদের মধ্যে ভাল লোক নয়।[৬৮] অন্য কথায়,

بَلْ خِيَارُكُمْ مَنْ لاَ يَضْرِبُهُنَّ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُنَّ اَوْيُوَدُّ بِهِنَّ وَلاَيَضْرِبُهُنَّ ضَرْبَاشَدِيْدًا يُوَدِّىْ اِلى شِكَايَتِهِنَّ

বরং তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের মারপিট করে না বরং তাদের অনেক কিছুই তারা সহ্য করে নেয়। (অথবা বলেছেন) তাদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা পোষণ করে, তাদের কঠিন মার মারে না এবং তাদের অভাব-অভিযোগগুলো যথাযথভাবে দূর করে।[৬৯]

গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ

পারিবারিক সামাজিক জাতীয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু করা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়ই সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে।

কুর'আন মজীদে এ কারণেই স্ত্রীর সাথে সব ব্যাপারেই পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানকে কতদিন দুধ পান করানো হবে তা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

---

৬৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ আল- কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাযাহ* (ঢাকা : মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ, তা.বি), কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নং ১৯৭৭, পৃ. ১৪২

৬৮ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ২১৪৬, পৃ. ২৯২

৬৯ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

'স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের'।[৭০]

আল্লামা আহমাদুল মুস্তফা আল-মারাগী এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন, 'কুর'আন মজীদ সন্তান পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতামাতার একজনকে অপর জনের উপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি- এ কথা যদি তোমরা চিন্তা ও লক্ষ্য কর, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবে'।[৭১]

রাসূলে করীম (স.) এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম ওহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে-ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অপনোদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) এর নিকট সমস্ত ঘটনা খোলাখুলি বর্ণনা করে বলেন, আমি এই সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি। এ কথা শুনে জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনাকে কখনই এবং কোনদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। অপরের বোঝা বহন করে থাকেন অর্থাৎ এতিম, বিধবা, অন্ধ ও অক্ষমদের খাওয়া পড়া ও থাকার সুবন্দবস্ত করে থাকেন। কপদর্কহীন গরীবদের জন্যে আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এজন্যে আল্লাহ কখনই শয়তানদের আপনার উপরে জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোন অমূলক চিন্তা-ভাবনাও আপনার উপর চাপিয়ে দেবেন না। আর এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়েতের কার্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।[৭২]

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কাফিরদের তীব্র বিরোধিতার কারণে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা সম্ভব হল না, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবী নানা করণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে রাসূল (স.) তাঁদেরকে এখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে তাঁর এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম (স.) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হন। তখন তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে অবস্থানরতা তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা) এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সব কথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং

---

৭০ আল-কুর'আন, আল বাকারা, ২ : ২৩৩

৭১ আল্লামা আহমাদুল মুস্তফা আল-মারাগী, *তাফসিরে আল-মারাগী* (মিশর : মুস্তফা আল-বাবী আল- হালবী, ১৯৪২), খ.২, পৃ. ১৮৮

৭২ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছদ : রাসূলুল্লাহ (স.) উপর ওহী নাযিলের পদ্ধতি, হাদীস নং ৩, পৃ. ৩; শাইখ মোহাম্মদ খাদরী মুহাম্মদ বিন আফিফিল বা'সুখী, *নূরুল ইয়াকিন ফি সিরাতিল মুরসালিন* (দামেস্ক-বৈরুত : মুওয়াস্ সাসাতু উলুমুল কুর'আনি, ১৯৮৭) পৃ. ২৬

যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবিগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং সে কাজ করতে লেগে যাবেন’।[৭৩]

সুনাম রক্ষা করার অধিকার

প্রত্যেক নারী ও পুরুষের অধিকার রয়েছে তাদের সুনাম রক্ষা করা, তবে নারীর সুনাম সর্বক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইসলামী আইন নারীর এই পবিত্র অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। কঠিন শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী আইন ব্যবস্থা নারীর উপর হতে নৈতিক অপবাদের আশঙ্কা দূর করতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহপাক পবিত্র আল-কুর'আনে ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘যারা সতী নারীর প্রতি (যেনা মিথ্যা) অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তোমরা তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, যারা সতী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি যেনার (মিথ্যা) অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[৭৪] ইসলামী আইনে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের জন্য তিন প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমত, তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। দ্বিতীয়ত, সে সারা জীবনের জন্য মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে এবং আদালতে কখনও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তৃতীয়ত, পরকালে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং কঠোর শাস্তির শিকার হবে। বর্ণিত আয়াতে এই শ্রেণীর অপবাদ রটনাকারীদের উপর দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করে নারী জাতির ইজ্জত-আব্রু ও সুনামের সংরক্ষণ করেছে।

বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীর পুনরায় বিবাহ করার অধিকার

স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা তালাক বা অন্যবিধ কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হলে প্রত্যেক বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। ইসলাম শুধু বিধবাদেরকে পুনর্বিবাহের অধিকারই প্রদান করে নাই, বরং এর জন্য উৎসাহও প্রদান করেছে।

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

---

৭৩ শাইখ মোহাম্মদ খাদরী মুহাম্মদ বিন আফিফিল বা'সুখী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৭৪ আল-কুর'আন, আন- নূর, ২৪ : ২৩

'স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তর তা গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে, কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না। নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করবার সংকল্পও করো না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ সহনশীল'।[৭৫]

হায়েযের সময় স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'হে রাসূল লোকে আপনাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, উহা অসশুচি। সুতরাং তোমারা রজঃস্রাব কালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সঙ্গম করবে না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তওবাকারী এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন'।[৭৬]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হায়েযের সময় স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ। নারীকুলের জন্য এই নিষেধ একটি অধিকার। যে স্বামী এই অধিকার ভঙ্গ করে সে অপরাধী, ঋতুস্রাবকে বলা হয়েছে আযা। আযা শব্দের অর্থ বিরক্তিকর, হায়েয বা ঋতু নিঃসন্দেহে বিরক্তিকর, কিন্তু হায়েযা বা ঋতুমতি কখনো বিরক্তিকর নয়। তাই ঋতু অবস্থায়ও তাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা চলে না।

ইসলামে বিবাহের মূল দর্শন হল- নারী-পুরুষ দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনে চিরদিন একসাথে জীবন যাপনের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যৌন আস্বাদনের পথ চির উন্মুক্ত। একজন অপরজনের সুখ-দুঃখের চির সহচর হয়ে থাকার অটুট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই ঘটেছে তাদের যৌনমিলন। বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে দৃঢ়তা, স্থিতিশীলতা ও ঐকান্তিকতা ছিল নর-নারীর আদিম ও শাশ্বত ধারনা। পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হওয়ার অর্থই ছিল-তারা চিরন্তন দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল।

---

৭৫ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২: ২৩৫
৭৬ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২২

অতঃপর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ঐকান্তিকতার পরিবেশে চিরকাল তারা একজন অপরজনের হয়ে থাকবে। তারা হবে পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন একজন অপরজনকে কখনো ত্যাগ করবে না। একজনের বিপদে অপরজন বিপন্ন রোধ করবে। একজনের সুখে অপরজন অকৃত্রিমভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে এই ছিল তাদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি। এক কথায় তারা শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থতাই লিপ্ত হবে না। তারা হবে অবেচ্ছেদ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। একমাত্র ইসলামই জাহেলী সমাজের হীন দৃষ্টিকোণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটিয়ে আদল ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুর'আনে তালাক আইন

আল-কুরআন তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ বিধিবদ্ধ করেছে পারিবারিক জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী ও স্ত্রী-উভয়কে বাঁচাবার জন্যে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে ভাঙ্গন দেখা দেয়, পরস্পরে মিলে মিশে ঠিক স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্যময় জীবন যাপন যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, পারস্পরিক সম্পর্ক যখন হয়ে পড়ে তিক্ত, বিষাক্ত। এক জনের মন যখন অপর জন থেকে এমনভাবে বিমুখ হয়ে যায় যে, যার ফলে বিয়ের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের শুভ মিলনের আর কোন আশাই থাকে না, ঠিক তখনই এ চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়। ইসলাম একটি স্বভাব ধর্ম। তাই তালাক ব্যবস্থা ইসলামের স্বভাব ও প্রকৃতির ধর্মেরই প্রতিফলন। স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধন অন্য কিছু নয় বরং দুটি আত্মা ও মনের মিলন। মনের মিলন যখন দূরীভূত তখন বিবাহ বন্ধনের গ্রন্থি দ্বারা স্বামী- স্ত্রীকে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। তাই বিবাহের রশিকে কেটে দিয়ে পরস্পরের অস্তিত্বকে রক্ষা করাই প্রকৃতির দাবী। প্রকৃতির এই দাবীর প্রতি ইসলাম সমর্থন ব্যক্ত করেছে তালাক প্রবর্তনের মাধ্যমে।

তালাকের সংজ্ঞা

ক. তালাক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'حل الوثائق' বা বন্ধন খুলে দেয়া। শরি'য়তের পরিভাষায় 'তালাক' অর্থ 'حل عقدة النكاح' বা বিয়ের বন্ধন খুলে দেয়া। ইমাম সারাখসি বলেন, তালাক শব্দের অর্থ হলো ازالة القيد অর্থাৎ বন্ধন মুক্ত হওয়া। طلاق শব্দটি طلق ধাতু থেকে উদ্ভূত যা থেকে اطلاق (ইতলাক) শব্দটি এসেছে। যার অর্থ হলো স্বাধীনতা।[৭৭] ইতলাক অর্থ ছেড়ে দেয়া, মুক্ত করা ও নিক্ষেপ করা। কয়েদীকে মুক্ত করা ও ছেড়ে দেয়ার অর্থে ইতলাক শব্দটির ব্যবহার হয়। তাই শরি'য়তের পরিভাষায় দাম্পত্য সম্পর্কের অবসানকে বলা হয় তালাক।[৭৮]

খ. পারিভাষিক অর্থ: বিভিন্ন ফকিহগণ তালাকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তালাকের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। এরূপ কিছু প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

এক. الطلاق هو رفع قيد النكاح

'বিয়ের বাঁধনকে তুলে ফেলা। বাঁধন তুলে ফেলার অর্থ বিয়ের বাধ্যবাধকতার পরিসমাপ্তি ঘটানো, চাই সেটা তাৎক্ষণিক অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক হোক অথবা ভবিষ্যত প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হোক'।[৭৯]

---

৭৭ আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ১৯২৪), খ. ৬, পৃ. ২
৭৮ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৯৭
৭৯ ইবনে আবেদীন, *রাদ্দুল মুখতার 'আলাল দুররুল মুখতার* (পাকিস্তান : করাচি এডুকেশনাল প্রেস, তা.বি), খ.২, পৃ. ৫৭০

দুই. وفى الشرع رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص او بكناية وغير هما

'শরি'য়তে সুনির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে অথবা রূপক শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহের বন্ধন মুক্ত করাকে তালাক বলা হয়'।[৮০]

তিন. رفع قيد النكاح فى الحال او المال بلفظ مخصوص

'বিবাহের বন্ধন চুক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে অথবা ভবিষ্যতে প্রকাশ্য শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে বাতিল করাকে তালাক বলা হয়'।[৮১]

চার. وشرعا رفع قيد النكاح فى الحال بالبائن او المال بالرجعى بلفظ مخصوص

'নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে চিরতরে বিবাহ বন্ধকে ছিন্ন করা অথবা ভবিষ্যতে তালাক প্রত্যাহার করার শর্তে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে তালাক বলা হয়'।[৮২]

পাঁচ. الطلاق صفة حكمية ترفغ حلية متعة الزوج بزوجته

'তালাক এমন একটি কৌশলগত গুণ যার দ্বারা স্বামী স্বীয় স্ত্রী থেকে ভোগ-ব্যবহারের বৈধতা স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেয়'।[৮৩]

ছয়. حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

'তালাকের শব্দ অথবা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা'।[৮৪]

সাত. الطلاق : هوحل قيد النكاح او بعضه

'বিবাহের বন্ধন সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ছিন্ন করাকে তালাক বলা হয়।[৮৫]

সংজ্ঞা বিশ্লেষণ

'তালাক শব্দের অর্থ পরিত্যাগ' বিচ্ছিন্ন' বন্ধনমুক্ত' বা মুক্তি। নির্দিষ্ট বাক্যের সাহায্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করাই তালাক। স্বামী কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বাক্যে অথবা ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ অথবা পরিণামে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করাকে 'তালাক বলে।[৮৬]

---

৮০ কামাল উদ্দিন ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর* (কায়রো : ১৩৫৬ হি.), খ. ৩, পৃ. ২১
৮১ আবদুল গনী আল-মাদানী, *আল-লুবাব* (কায়রো : দারুল কাওমিয়্যা, ১৩৮৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩৭
৮২ মাহমুদ আল-নাসাফী, *কানজুল দাকায়ীক* (দিল্লী : দারুল ইশাআতিল ইসলামিয়া, ১৩৪৮ হি.), পৃ. ১১৪
৮৩ মুহাম্মদ আল-মাগরিবী আল-মালিকী ইবনে আব্দুর রহমান, *মুয়াহিক আলজালিল* (কায়রো : দারুল কাওমিয়্যা, ১৩২৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৮
৮৪ আল খতীব মুহাম্মদ আল শারবিনী আল-শাফেয়ী, *মুগনী আল মুহতাজ* (কায়রো : দারুল কাওমিয়্যা, ১৯৩৩), খ.৩, পৃ. ২৭৯
৮৫ শরীফ আল-দ্বীন আল-হাম্বলী আল-মাকদিসি, আল-ইকনা (কায়রো : দারুল কাওমিয়্যা, তা.বি), খ.৪, পৃ. ৩
৮৬ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৭৪

তালাক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

যে লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ইসলাম অত্যন্ত যত্নবান ও আগ্রহী, তার একটি হলো দাম্পত্য বন্ধনকে টেকসই, স্থিতিশীল ও অটুট রাখা। বৈবাহিক বন্ধন সারা জীবনব্যাপী স্থায়ী হওয়ার জন্যই সম্পাদিত হয়ে থাকে, যাতে স্বামী-স্ত্রী তাদের গৃহকে তাদের জন্য একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, যার ছায়ায় নিজেরা দু'জনে শান্তিতে বসবাস করবে এবং তাদের সন্তানদেরকে সুযোগ্যভাবে তৈরি করবে। এ কারণেই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও অটুট সম্পর্কসমূহের অন্যতম। মহান আল্লাহ কর্তৃক স্বামী স্ত্রীর চুক্তিকে 'মজবুত অঙ্গীকার' বলে আখ্যায়িত করাই এ সম্পর্কের পবিত্রতার সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ সূরা নিসার ২১ তম আয়াতে বলেন,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

'(তোমাদের স্ত্রীরা) তোমাদের নিকট থেকে মজবুত অঙ্গীকার আদায় করেছে।'[৮৭]

যেহেতু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এভাবে মজবুত ও অটুটরূপে আখ্যায়িত হয়েছে, তাই এতে কোনো ধরনের ব্যাঘাত ঘটা এবং এর মর্যাদা হানি হওয়া উচিত নয়। যে জিনিস এ সম্পর্ককে দুর্বল ও এর মর্যাদা খাটো করে, তা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। কেননা এর ফলে বিয়ের সার্থকতা ও স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। মহানবি (স.) বলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা তালাকের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেন নাই।[৮৮] মহানবি (স.) আরো বলেন, 'সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য'।[৮৯] এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা খাত্তাবী লিখেছেন, 'তালাক ঘৃণ্য হওয়ার অর্থ আসলে সেই মূল কারণটির ঘৃণ্য হওয়া, যার দরুণ একজন তালাক দিতে বাধ্য হয়। আর তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হওয়া– মিলমিশের অভাব হওয়া। মূল তালাক কাজটি ঘৃণ্য নয়। কেননা এ কাজটিকে আল্লাহ তা'য়ালা মুবাহ্ করে দিয়েছেন। আর রাসূল (স.) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে 'রাজয়ী' তালাক দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত'।[৯০]

---

৮৭ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২১

৮৮ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, বাব ফী কারাহিয়াতিত তালাক, হাদীস নং ২১৭৭

৮৯ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, বাব ফী কারাহিয়াতিত তালাক, হাদীস নং ২১৭৮; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাযাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ২০১৮

৯০ ইমাম আবু সুলায়মান হামদ বিন মুহাম্মদ আল-খাত্তাবী, *মা'আলিম আস-সুনান* (লেবানন : দারুল কিতাব আল-ইসমিয়াহ, ২০০৯), খ.১, পৃ. ২৩১

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল কাহলানী ছানআনী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হালালের মধ্যেও কিছু কাজ এমন রয়েছে, যা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। আর এসব হালাল কাজের মধ্যে 'তালাক' হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য'।[৯১]

বস্তুত আল্লাহ তা'য়ালা তালাককে শরি'য়ত সম্মত করেছেন। কেননা পারিবারিক জীবনে এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তবে বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীর কোন গুরুতর দোষ-ক্রুটি ব্যতীতই তালাক দেয়া একান্তই এবং মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে ইসলামের মনীষীগণ সম্পূর্ণ একমত।

প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ ইবনে আবেদীন বলেছেন, তালাক মূলত নিষিদ্ধ মানে হারাম; কিন্তু দাম্পত্য জীবনে সম্পর্ক যখন এতদূর বিষজর্জর হয়ে পড়ে যে, তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখন তা অবশ্যই জায়েয হবে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা কেবলমাত্র তখনই সঙ্গত হতে পারে, যখন তাদের উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতিতে এতদূর পার্থক্যের সৃষ্টি হবে, পরস্পরের মধ্যে এতদূর শত্রুতা বেড়ে যাবে যে, তারা মিলিত থেকে আল্লাহর বিধানকে পালন ও রক্ষা করতে পারেই না। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হলে তালাক তার মূল অবস্থায়ই থাকবে-মানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারামই বিবেচিত হবে। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন,

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

'স্ত্রীরা যদি স্বামীদের কথামত কাজ করতে শুরু করে, তাহলে তখন আর তাদের উপর কোন জুলুমের বাহানা তালাশ করো না -তালাক দিও না'।[৯২]

বাস্তবিকই, কোন প্রকৃত কারণ না থাকা সত্ত্বেও যারা স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারা মহা অপরাধী সন্দেহ নেই। এদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (স.) বলেছেন, 'তোমাদের এক-একজনের অবস্থা কি হয়েছে ? তারা কি আল্লাহর বিধান নিয়ে তামাসা খেলছে ? একবার বলে, তালাক দিয়েছি, আবার বলে, পুনরায় গ্রহণ করেছি'।[৯৩] এদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা বিয়ে কর, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা সেসব স্ত্রী-পুরুষকে (ভালবাসেন না) পছন্দ করেন না, যারা নিত্য নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত'।[৯৪]

আল-কুর'আনে বিবাহ ভঙ্গের পূর্বশর্ত

অনুমতিযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্য আল্লাহর কাছে তালাক অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়। যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে, উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি চরমে পৌঁছে, পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে,

---

৯১ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আস-সুনআনী, *সুবুল আস-সালাম* (দিল্লী : দারুল ইশাআতিল ইসলামিয়া, তা.বি), খ.৩, পৃ. ১৬৭
৯২ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৩৪
৯৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাযাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক।
৯৪ আবু বকর আল- জাস্‌সাস, *আহকামুল কুর'আন* (বৈরুত : দার ইহ্ইয়াউত্ তুরাস আল-আরাবী, ১৯৯২), খ.৩, পৃ. ১৩৩

তখন উভয়পক্ষকে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পুনরায় আপোষের শেষ চেষ্টা করে দেখতে আল-কুর'আন পরামর্শ দেয়। কুর'আনুল কারীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে, তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ' সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত'।[৯৫]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু বকর আল-জাসশাস বলেন, তোমাদের স্বামী স্ত্রীর পরস্পরে সম্পর্ক সমন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়- সম্পর্ক মধুর নেই বলে ধারণা জন্মে, তখন প্রকৃত ব্যাপার তদন্ত করা এবং উভয়ের অবস্থা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য ।[৯৬] একই প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের অন্যত্র এসেছে,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

'কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ নিষ্পত্তি শ্রেয়'।[৯৭]

উপরোক্ত দুটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত পারা যায় এবং যে ভাবে পারা যায় বিবাহ বন্ধন অব্যাহত রাখাই বাঞ্ছনীয় এক সাথে ঘর সংসার করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরিণতিতে তালাক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া কাম্য নয়। এরূপ অবস্থায় আল-কুর'আন নির্দেশ দিচ্ছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয় পরিবার হতে একজন করে সালিস নিযুক্ত করে উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করে দেওয়া সর্বাধিক উত্তম কাজ।[৯৮]

উভয় পক্ষ থেকে একজন করে মধ্যস্থতাকারী দম্পতির মধ্যে আপোষের চেষ্টা করবেন। তারা ঘটনার বিস্তারিত বিষয়াদি প্রকাশ হয়ে পড়ার মত বিব্রতকর অবস্থা সরাসরি পরিহার করে চলার ব্যবস্থা করবেন। তালাকের প্রতি ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও সামাজিক অসম্মতি ছাড়াও উপরোক্ত বিধিমালা তালাকের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছে।

---

৯৫ আল-কুর'আন,আন-নিসা, ৪ : ৩৫
৯৬ আবু বকর আল- জাস্সাস, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫২
৯৭ আল-কুর'আন,আন-নিসা, ৪ : ১২৮
৯৮ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

তালাক সম্পর্কে আল-কুর'আন

মীমাংসার সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেলে কেবল তখনি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। বিনা কারণে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে মযলুম স্ত্রীর ফরিয়াদ আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। তালাক সম্পর্কে আল-কুর'আনের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

১. 'ইলা' (শপথের মাধ্যমে সহবাস বর্জন) প্রথা:

ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরব সমাজে নারী জাতির উপর যে সব যুলুম-অত্যাচার হতো ইলা তালাক ছিল তার অন্যতম। রাগান্বিত হয়ে স্বামী বলত, আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না। ক্রোধবশত স্ত্রীর সাথে মিলিত না হওয়ার কসম করে বসলে সেই কসমের কারণে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়ার অধিকার সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে যেত। শপথের মাধ্যমে সহবাস বর্জনের প্রথাকে 'ইলা' বলা হত। শপথ করে এই কথা বলার পর স্বামী আর স্ত্রীকে তত্ত্বাবধান করত না এবং তালাকও দিত না। ফলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারত না। আরব দেশে প্রচলিত 'ইলা' প্রথাকে বাতিল করে আল-কুর'আন ঘোষণা করেছে, স্ত্রীকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঝুলিয়ে রাখা চলবে না। চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে হবে নতুবা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'যারা স্ত্রীর সাথে সঙ্গত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাসে অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[৯৯] এই আয়াতে সেই সব স্বামীর কথা বলা হয়েছে যারা স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করে অথচ স্ত্রীকে তালাক দেয় না। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে, তারা চার মাসের মধ্যে তাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে, তা না করলে বিবাহ ভেঙ্গে ফেলবে। পরিষ্কার এরশাদ হয়েছে যে, 'শপথের পর সহবাস করলে আল্লাহ ক্ষমাশীল'।

وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১০০]

'এখানে তালাক দেয়ার সংকল্পের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ইলার' চার মাস অতিক্রান্ত হলেও তালাক কার্যকর হবে না যতক্ষণ না তালাকের ঘোষণা দেয়া হয়। অতএব, চার মাসের কম হলে ইলা হবে না। আবার চার মাস অতিক্রান্ত না হলেও ইলা হবে না। চার অতিক্রান্ত হলেই কেবল ইলা বিধিবদ্ধ হবে।[১০১]

---

৯৯ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৬
১০০ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৭

২. ইদ্দত ও তালাকের রিজঈ সংক্রান্ত বিধান : আল-কুর'আন আরো ঘোষণা করেছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

'তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায়, তবে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী'।[১০২]

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এখানে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী বলতে সকল প্রকার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে বোঝানো হয়েছে। সে তালাক বাইন হোক বা রিজঈ হোক তালাক প্রাপ্তা গর্ভবতী হোক অথবা গর্ভ মুক্ত হোক সম্ভোগে হোক অথবা না হোক-সকল প্রকার তালাক প্রাপ্তা নারীই এর অন্তর্ভুক্ত।[১০৩] স্ত্রীর তুহরের সময়ে, (অন্য সময়ে নয়) স্বামী তাকে তালাক দিতে পারে। এই সময় স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে স্ত্রী তিন ঋতুকাল (প্রায় তিন মাস) অপেক্ষা করবে। এই সময়ের মধ্যে স্বামীর মনের মেঘ কেটে গিয়ে সেখানে ভালবাসার পূর্ণচন্দ্র উদিত হতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রী মধ্যে মধুর মিলন আসতে পারে। এই সময়ের মধ্যে যদি স্ত্রী অনুভব করে যে, তার গর্ভে সন্তান আছে তবে সে এই তথ্য প্রকাশ করবে। অনাগত কিন্তু সম্ভাব্য সন্তানের আশায় তাদের মধ্যে আবার মিলন ঘটে যেতে পারে।[১০৪]

তালাকের প্রকারভেদ

আল-কুর'আন দুই প্রকার তালাকের কথা ঘোষণা করেছে,

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

'তালাক দু'বার। এরপর হয় ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখা হবে, নচেৎ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিদায় করা হবে'।[১০৫]

---

১০১ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৫১২
১০২ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৮
১০৩ কাযী আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫১৭
১০৪ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০২
১০৫ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৯

উদ্ধৃত আয়াতটির শানে নুযূল

পূর্বে আরব দেশে বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে বহু প্রকার কু-প্রথা প্রচলিত ছিল। তার ফলে স্ত্রীলোকেরা জীবনে নানা অবিচারে-অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আসছিল। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিত তাকে নির্যাতিত করার উদ্দেশ্য। তখন তালাকের কোনও মেয়াদ নির্ধারিত ছিল না। ফলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গ্রহণ করে আবার তালাক দিত। এ আয়াতটি হযরত আসমা (রা.) নামক একজন আনসারী নারীর সমন্ধে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে তালাকের ইদ্দত ছিলনা। সর্বপ্রথম ইদ্দতের নির্দেশ এই স্ত্রীলোকটি তালাকের পরেই অবতীর্ণ হয়।[১০৬]

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, যে তালাক শরি'য়তসিদ্ধ তা একবারের পর আর একবার হতে পারে। স্বামীর জন্য প্রথম তালাকের পরও ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখার অর্থ তালাক প্রত্যাহার করা, স্ত্রীকে বৈবাহিক বন্ধনে পুনবর্হাল করা এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা। আলোচ্য আয়াতে রিজঈ তালাকের কথা বলা হয়েছে। কেননা রিজঈ তালাক প্রদান না করা হলে স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে পুর্নবহল করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়।[১০৭] অতএব আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল তালাক হয় দুবার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে বস্তুত ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়।[১০৮]

অবশ্য তিন তালাকের সাথে রিজঈ তালাকের যে পার্থক্য, তা পবিত্র কুর'আন দ্বারাই প্রমাণিত। তৃতীয় তালাক স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বামীর জন্য তাকে হারাম করে দেয়। তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেই স্বামী থেকে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর পক্ষে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা বৈধ নয়। এমনকি প্রথম স্বামীর জন্য তাকে হালাল করার উদ্দেশ্য বিয়ে হলে সেই বিয়ে দ্বারাও উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয় না।[১০৯] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

১০৬ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬২৯
১০৭ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২১৮
১০৮ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬১৮
১০৯ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২১৮

'অতঃপর যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সঙ্গত না হবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় এবং তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করতে সমর্থ হবে তবে তাদের পূনর্মিলনে কারও কোন অপরাধ হবে না। এইগুলি আল্লাহর সীমারেখা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন'।[১১০]

তালাক আইনের সার-সংক্ষেপ

ইসলামী শরি'য়তে তালাকের সুযোগ রাখা হয়েছে একটি অপরিহার্য ও নিরুপায়ের উপায় হিসাবে। অতএব যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে এর ব্যবহার হওয়া উচিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে বিভিন্ন উপায়ে এর সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। কোন প্রকারই সংশোধন সম্ভব না হলে কেবল তখনই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ইসলাম সর্বপ্রথম দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য সকল প্রকার বিরোধ ও মনোমালিন্য শান্তিপূর্ণভাবে বিদূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে বিরোধসমূহের মীমাংসা করা সম্ভব

ইসলামে এ তালাক দানের একটা নিয়মও বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, স্বামী স্ত্রীর তুহর (হায়েয না থাকা) অবস্থায় একবার এক তালাক দিবে। এ তালাক লাভের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে এ অবস্থায় মিলন করতে পারবে না। এরূপ তালাক দান ও ইদ্দত পালনের নিয়ম করার কারণ হল এতে করে উভয়েরই স্নায়ু মণ্ডলীর সুষ্ঠু এবং তাদের অধিক সুবিবেচক হয়ে উঠার সুযোগ হবে। চূড়ান্ত বিচ্ছেদের যে কি মারাত্মক পরিণাম তা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পাবে। স্পষ্ট বুঝতে সক্ষম হবে যে, তালাকের পর তাদের সন্তান-সন্ততির ও ঘর-সংসারের কি মর্মান্তিক দুর্দশা হতে পারে। ফলে তারা উভয়েরই অথবা যে পক্ষ তালাকের জন্যে অধিক পীড়াপীড়ি করেছে ঝগড়া-বিবাদ ও বিরোধ-মনোমালিন্য সম্পূর্ণ পরিহার করে আবার নতুনভাবে মিলিত জীবন যাপন করতে রাজি হতে পারে। এ সাময়িক বিচ্ছেদ তাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসার তীব্র আকর্ষণও জাগিয়ে দিতে পারে।

যদি তাই হয়, তাহলে এক-এক তালাককে 'তালাক রিজয়ী' বা 'ফিরিয়ে পাওয়ার অবকাশ পূর্ণ তালাক' বলা হবে। তিন মাস ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পুনর্মিলন সাধন করতে হবে। এতে নতুন করে বিয়ে পড়াতে হবে না (যদিও ইমাম শাফে'ঈর মতে মুখে অন্তত ফিরিয়ে নেয়ার কথা উচ্চারণ করতে হবে)। কিন্তু যদি এভাবে তালাক দেয়ার পর তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এ তালাক বায়েন তালাক হয়ে যাবে। তখন যদি ফিরিয়ে নিতে হয়, তাহলে পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে ও নতুন করে দেন-মোহর ধার্য করতে হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বাধীন– সে ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে

১১০ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩০

পুনরায় গ্রহণ করতেও পারে, আর ইচ্ছা না হলে সে অপর কোন ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতেও পারে। প্রথম স্বামী এ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে কোনরূপ জবরদস্তি বা চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না এবং তার অপর স্বামী গ্রহণের পথে বাধ সাধতেও পারবে না।

এক তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যেই স্ত্রীকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয়, আর স্বামী-স্ত্রী জীবন যাপন শুরু করার পর আবার যদি বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে প্রথমবারের ন্যায় আবার পারিবারিক আদলতের সাহায্যে মীমাংসার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। এবারও যদি মীমাংসা না হয় তাহলে স্বামী তখন আর এক তালাক প্রয়োগ করবে। তখনও প্রথম তালাকের নিয়ম অনুযায়ীই কাজ হবে।
দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় আর তারপর বিরোধ দেখা দেয়, তখনো প্রথম দুবারের ন্যায় মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। আর তা কার্যকর না হলে স্বামী তৃতীয়বার তালাক প্রয়োগ করতে পারে। আর এই হচ্ছে তার তালাক দানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ক্ষমতা। অতঃপর স্ত্রী তার জন্যে হারাম এবং সেও তার স্ত্রীর জন্যে চিরদিনের জন্যে হারাম হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে কুর'আন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

'তালাক দু'বার। এরপর হয় ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখা হবে, নচেত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিদায় করা হবে'।[১১১] তালাক দুবার দেয়া যায়, তার পরে হয় ভালভাবে স্ত্রীকে গ্রহণ করা হবে, না হয় ভালভাবে সকল কল্যাণ সহকারে তাকে বিদায় দেয়া হবে। এ 'বিদায় করে দেয়া হবে' থেকে তৃতীয় তালাক বোঝা গেল। তা মুখে স্পষ্ট উচ্চারণের দ্বারাই হোক, কি এমনি রেখে দিয়ে এক 'তুহর' কাল অতিবাহিত করিয়েই দেয়া হোক, উভয়ের পরিণতি একই।[১১২] নবী করিম (স.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আয়াতে তো মাত্র দু'বার তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে তৃতীয় তালাক কোথায় গেল ? তখন নবী করিম (স.) বললেন, 'কিংবা ভালভাবে বিদায় করে দেয়া হবে'- আয়াতাংশেই তৃতীয় তালাকের কথা নিহিত রয়েছে।[১১৩] এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

'স্বামী ও স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তার ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে তাদের দুজনকেই নিশ্চিত ও স্বচ্ছন্দ করে দিবেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা বাস্তবিকই বিশালতা দানকারী, সুবিজ্ঞ

---

১১১ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৯
১১২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১
১১৩ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫২৪

বিজ্ঞানী'।[১১৪] এ আয়াতের তাৎপর্য হল স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক সম্পর্ককে সুষ্ঠু, নির্দোষ ও মাধুর্যপূর্ণ করে নিতে না পারে এবং শেষ পর্যন্ত যদি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটেই যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিবেন। একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তারা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। স্বামী অপর এক স্ত্রী গ্রহণ করে এবং স্ত্রী অপর এক স্বামী গ্রহণ করে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে।[১১৫]

তিন তালাকের প্রমাণ

তিন তালাকের প্রবক্তাগণ আল-কুর'আন থেকে দলিল গ্রহণ করেন। যেমন :

ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

'যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে অতঃপর সেই স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না, যতক্ষণ অন্য স্বামীকে বিয়ে না করে'।[১১৬]

খ) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

'আর যদি তোমরা তাদের মোহরানা নির্ধারণ করে সহবাসের পূর্বে তালাক দাও তাহলে তাদের জন্য অর্ধেক মোহর নির্ধারিত থাকবে।[১১৭]

গ) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء

'তোমরা যদি স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে তাতে কোনো দোষ নেই'।[১১৮] এসব আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এক, দুই বা তিন তালাক এক সাথে বা আলাদা আলাদাভাবে, যেভাবেই দেয়া হোক, বৈধ হবে ও কার্যকর হবে। কেননা এখানে তালাকের সংখ্যায় কোনো পার্থক্য করা হয়নি।[১১৯]

---

১১৪ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ৩০
১১৫ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২
১১৬ আল-কুর'আন, আল বাকারা, ২ : ২৩০
১১৭ আল-কুর'আন, আল বাকারা, ২ : ২৩৭
১১৮ আল-কুর'আন, আল বাকারা, ২ : ২৩৬
১১৯ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২১৭

তিন তালাকের পরিণতি

এক, দুই ও তিন তালাক হয়ে যাওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়। অতঃপর এতদুভয়ের পুনরায় স্বামী হিসেবে মিলিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। এ সময় অবস্থা দাঁড়ায় এরূপ যে, স্বামী সেই স্ত্রীর স্বামী নয় এবং স্ত্রী সেই স্বামীর স্ত্রী নয়। যারা ছিল পরস্পরের জন্যে সম্পূর্ণ হালাল, তালাক সংঘটিত হওয়ার পর তারাই পরস্পরের জন্যে হারাম হয়ে গেছে। এ হারাম হওয়ার কথা কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকারার ২৩০ নং আয়াতের প্রথমাংশ থেকেই প্রমাণিত হয়। তা হল:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ

'স্বামী যদি স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক ও দিয়ে দেয়, তাহলে অতঃপর সেই স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না'। তৃতীয়বার তালাক দানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং তারা পরস্পরের জন্যে হারাম হয়ে যায়। এরূপ ঘটনার মূলে একটি বিশেষ মানসিক কারণ নিহিত হয়েছে। কেননা এ তৃতীয়বারের তালাকেও যদি তালাক সংঘটিত না হত, যদি একজন অন্য জনের হারাম হয়ে না যেত, তাহলে স্বামীরা স্ত্রীদের বৈবাহিক জীবন নিয়ে মারত্মক ছিনিমিনি খেলার সুযোগ পেত। স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে তার পাওনা অধিকার দিত না অথচ সে তার কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারলে অন্যত্র বিবাহিত হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করতে পারত। সে কারণে ইসলামী শরী'য়াতে এ মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যথায় অবস্থা দাঁড়াত এই যে, একবার একজনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হলে জীবনে কোন দিনই তার বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হত না। ফলে পূর্ণ স্ত্রীত্বের অধিকারও যেমন তার কাছে পেত না, তেমনি তার কাছ থেকে চলে গিয়ে অপর একজনকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করাও সম্ভব হত না।[১২০]

তালাকের প্রকারভেদ

আল-কুর'আনের উপরোক্ত তালাকের আইন হতে ফকিহ্গণ তালাকের প্রকারভেদ নির্ণয় করেছেন । নিম্নে তা বর্ণনা করা হল :

ক) পদ্ধতিগত দিক হতে তালাক দুই প্রকার। ১. সুন্নাত তালাক ও ২. বিদঈ তালাক।

খ) ফলাফলের দিক হতেও তালাক দুই প্রকার। ১. রিজঈ তালাক ও ২.বাইন তালাক।

গ) সুন্নাত তালাক আবার দুই প্রকার। ১. আহ্সান তালাক ও ২.হাসান তালাক।

ঘ) বাইন তালাকও দুই প্রকার। ১. বাইন তালাক সুগরা ও ২. বাইন তালাক কুবরা (বা মুগাল্লাযা তালাক)।

---

১২০ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

সুন্নাত তালাক

মহানবি (স.) ঠিক যে সময় এবং যে পদ্ধতিতে তালাক দিতে শিক্ষা দিয়েছেন তদনুরূপ তালাককে 'সুন্নাত তালাক' বলে।[১২১] সুন্নাত তালাকের অর্থ এই নয় যে, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ তালাক স্বয়ং কোন ইবাদত নয় যার কারণে কোন পূণ্য আশা করা যেতে পারে।[১২২] বরং এর অর্থ মহানবী (স.) ও তার সাহাবীগণ সুন্নাত নিয়মে তালাক দেয়া পছন্দ করেছেন। এর বিপরীত পন্থায় তালাক উচ্চারণ করলে তা পদ্ধতিগতভাবে অনুমোদন যোগ্য নয় এবং তা পাপ কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।[১২৩] সুন্নাত তালাক হলো সেই তালাক, যা শরি'য়তের নির্দেশিত পন্থায় দেয়া হয়। সহবাসকৃত স্ত্রীকে ঋতু পরবর্তী পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করে তালাক দেয়াকে সুন্নতি তালাক বলা হয়।[১২৪]

হাসান তালাক

হাসান তালাক সহবাস বর্জিত তুহরে স্ত্রীকে এক রিজঈ তালাক দেওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুহরে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক প্রদানকে 'হাসান তালাক' বলে।[১২৫]

বিদঈ তালাক

স্বামী তার স্ত্রীকে একই তুহরে এক বা একাধিক শব্দে একাধিক তালাক দিলে অথবা সহবাসকৃত তুহরে এক তালাক দিলে একে 'বিদঈ তালাক' বলে।

বিদঈ তালাক আবার দুই প্রকার : কালগত ও সংখ্যাগত। কালগত তালাকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে রিজঈ তালাক দিলে এটা বিদঈ তালাক হিসেবে গণ্য। এই অবস্থায় স্ত্রীকে রুজআত করা (ফিরিয়ে নেয়া) ওয়াজিব (অপরিহার্য)। অনুরূপভাবে সংখ্যাগত তালাকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে তুহরে সহবাস হয়েছে সেই তুহরে একত্রে দুই বা তিন তালাক দিলে এটাও বিদঈ তালাকের অন্তর্ভুক্ত, তা এক বাক্যে দেয়া হোক অথবা পৃথক বাক্যে ।[১২৬]

রিজঈ তালাক

জাকিউদ্দিন শাবান রিজঈ তালাকের সংজ্ঞায় বলেন,

---

১২১ ড. তানজীল- উর- রহমান, *অ্যা কোড অফ মুসলিম পারসোনাল ল* (করাচি : হামদর্দ একাডেমী, ১৯৭৮), খ. ১, পৃ. ৩১৩
১২২ ইবনে নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক* (কায়রো, দারুল কিতাবিল ইসলামী, ১৩১১ হি.), খ.৩, পৃ. ২৫৬
১২৩ ইমাম'আলা উদ্দীন আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সানা'ই* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩২৮ হি.) খ.৩, পৃ. ৮৮-৮৯
১২৪ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৭৫
১২৫ প্রাগুক্ত।
১২৬ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৭৬

فَهُوَالَّذِىْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَه اِعَادَةِالْمُطَلَّقَةِ اِلَى الزَّوْجِيَةِ مِنْ غَيْرِحَاجَةٍ اِلى عَقْدٍ جَدِيْدٍ مَادَامَتْ فِى الْعِدَّةِ رَضِيَتْ اَوْلَمْ تَرْضِ

'রিজঈ তালাক হচ্ছে সেই তালাক, যার পরও স্বামী তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে নতুন আক্‌দ অনুষ্ঠান না করেই ইদ্দতকালের মধ্যেই সম্মত হোক আর নাই হোক ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার পায়'।[১২৭]

মূলত 'তালাক' শব্দ উচ্চারণপূর্বক স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দিলে এবং এর সাথে 'বাইন্' শব্দ যোগ না করলে একে 'রিজঈ তালাক' বলে। স্ত্রীকে ইদ্দত চলাকালে ফিরিয়ে না নিলে ইদ্দত শেষে এর 'বাইন তালাকে' পরিণত হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক দিল, কিন্তু এর সাথে 'বাইন' শব্দ উল্লেখ করল না, এই অবস্থায় রিজঈ তালাক হবে। হায়েয অবস্থায় বা সহবাসকৃত তুহরে রিজঈ তালাক সংঘটিত হতে পারে।[১২৮]

বাইন তালাক সুগরা

বাইন তালাক সুগরা অর্থাৎ ছোট বাইন তালাক হচ্ছে,

هُوَالَّذِىْ لاَ يَسْتَطِيْعُ الزَّوْجُ بَعْدَه اِعَادَةَ الْمُطَلَّقَةِ اِلَى الزَّوْجِيَةِ اِلَّابَعْدَ عَقْدٍ جَدِيْدٍ

'সে তালাক, যার পর স্বামী তালাক দেয়া স্ত্রীকে নতুন বিয়ে অনুষ্ঠান না করে ফিরিয়ে নিতে পারে না। ফলে এ তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে নতুন করে বিয়ের আকদ হতে হবে।[১২৯]

তালাক শব্দের সাথে, 'বাইন' শব্দ যোগ করে স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক প্রদান করলে একে 'বাইন তালাক সুগরা' বলে। এই ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সহবাসও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ইদ্দত চলাকালে বা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতিতে 'তাহলীল' ব্যতীত সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়।[১৩০]

বাইন তালাক কুবরা (মুগাল্লাযা তালাক)

বড় বাইন তালাক হচ্ছে,

هُوَالَّذِىْ لاَيَسْتَطِيْعُ الزَّوْجُ بَعْدَه اِعَادَةَ الْمُطَلَّقَةِ اِلَى الزَّوْجِيَةِ اِلاَّبَعْدَ اَنْ تَتَزَوَّجَ بِرَجُلٍ اٰخرزَوْجًا صَحِيْحًا وَيَدْ خُلَ بِهَا دُخُوْلاً حَقِيْقًا لَمْ يُفَارِقُهَااَوْ يَمُوْتَ عَنْهَا وَتَنْقَفِىْ عِدَّتُهَامِنْهُ

১২৭ জাকিউদ্দিন শাবান, *আয-যাওয়াজ ওয়াত তালাক ফিল ইসলাম* (মিশর : দারুল কাওমিয়া, ১৯৬৪), পৃ. ১০২
১২৮ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৭৬
১২৯ জাকিউদ্দিন শাবান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১৩০ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৭৬

সে তালাক, যার পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। পারে কেবল একটি অবস্থায়। আর তা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকটি অপর এক স্বামী গ্রহণ করবে সহীহ পন্থায় এবং সে তার সাথে প্রকৃতভাবেই সহবাস ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে। এরপর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হবে কিংবা সেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে রেখে মৃত্যু বরণ করলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হবে।[১৩১]

একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক শব্দে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলে একে 'বাইন তালাক কুবরা' বা 'মুগাল্লাযা তালাক' বলে।[১৩২]

স্ত্রীর তালাক প্রদানের অধিকার

আল-কুর'আন মূলত স্বামীকেই তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। খোলা তালাক ও তাফভীজ তালাক এই প্রকারের তালাকের অন্তর্ভুক্ত। খোলা হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক কোন বস্তুগত জিনিস পাওয়ার বিনিময়ে নিজের স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকতে রাজি নয়। সে জন্যে সে তালাক নিতে চায়; কিন্তু স্বামী তালাক দিতে ইচ্ছুক নয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে স্বামীকে তালাক দিতে রাজি করে নেয়। ইসলামে একে বলা হয় 'খুলা তালাক' এবং শরি'য়তে এরূপ তালাক প্রদানের অবকাশ রয়েছে।[১৩৩] বিবাহ যে শুধু স্বামী ছিন্ন করতে পারে তা নয়, স্ত্রীও সে অধিকার রাখে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'এরূপ অবস্থায় যদি তারা দু'জন আল্লাহর নির্ধারিত বিধান পালন করতে পারবে না বলে ভয় করে, তাহলে তাদের দু'জনের মাঝে এ সমঝোতা হওয়ায় কোন দোষ নেই। স্ত্রী স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক গ্রহণ করবে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে'।[১৩৪]

এ আয়াত থেকে খুলা তালাকের সুযোগ প্রমাণিত হয় এবং এও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি টাকা-পয়সার বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করে এবং স্বামী সে অর্থ গ্রহণ করে তবে তাতে কোন দোষ হবে না। শুধু কুর'আন নয়, আল-হাদীস দ্বারাও খোলা তালাকের বিধান প্রমাণিত। সাবিত ইবনে কায়েস (রা.) এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলেন, সাবিতের মধ্যে আমি কোন দোষ দেখি না, কিন্তু তাকে আমার ভাল লাগে না। রাসূলুল্লাহ তাকে বলেন, দেনমোহর স্বরূপ তুমি যে খেজুরের বাগান সাবিতের কাছে

---

১৩১ জাকিউদ্দিন শাবান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১৩২ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৭৬
১৩৩ মওলানা আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯
১৩৪ আল-কুর'আন, আল- বাকারা, ২: ২২৯

থেকে নিয়েছ, তা ফেরত দিতে রাজি আছ কি ? সাবিতের স্ত্রী হাঁ বাচক উত্তর দিলে রাসূলুল্লাহ সাবিতকে ডেকে পাঠান এবং খেজুরের বাগানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার আদেশ দেন। এই হাদীসের আলোকে ইসলামী আইন বিশারদগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার স্ত্রীদেরও আছে। যে কারণে স্বামী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে সেই কারণে স্ত্রীও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। দেনমোহর বাবদ যা পাওয়া গেছে তা ফিরিয়ে দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এই অধিকারকে ‘খুলা’ বলা হয়।[১৩৫]

তাফবীয তালাক

স্বামী তার তালাকের অধিকার স্ত্রীর উপর অর্পণ করতে পারে এবং এই অধিকারবলে স্ত্রী নিজেকে তালাক প্রদান করলে উক্ত তালাককে ‘তাফবীয তালাক’ বলে। স্বামী স্ত্রীকে তালাকদানের অধিকার অর্পণের পর সে নিজেকে তালাক দিতে পারে। বিবাহ বন্ধন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় বা পরবর্তী কোন সময় স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করতে পারে। স্বামী এই অধিকার বাতিল করতে পারে না।[১৩৬] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً

‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা কর, তবে এসো আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই।[১৩৭] আলোচ্য আয়াত দ্বারা তালাকের তাফবীযের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) তার পবিত্র স্ত্রীদেরকে তালাকে তাফবীয বা অর্পিত তালাকের অনুমোদন দিয়েছিলেন।[১৩৮]

ইদ্দত আইনের সংক্ষিপ্ত সার

ইদ্দত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ‘সংখ্যা গঠন’ কিংবা ‘সংখ্যাকে কথায় প্রকাশকরণ’। একে অপেক্ষাধীনকাল বলে অভিহিত করা হয়। কোন নারীর বিবাহের পরিসমাপ্তি ঘটলে তাকে পুনর্বার স্বামী গ্রহণ করার পূর্বে যে সময়-কাল অপেক্ষা করতে হয় তাকেই ইদ্দত বলে।[১৩৯] শরি'য়তের পরিভাষায় সেই সময়কে ইদ্দত বলা হয়, যে সময় স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের

---

১৩৫ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
১৩৬ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৬
১৩৭ আল-কুর'আন, আল আহযাব, ৩৩ : ২৮
১৩৮ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.), *তাফসীরে মাযহারী* (ইউপিঃ জাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি), খ.৯, পৃ. ৪৭৮
১৩৯ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন নারী বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় দুটি। এক. স্বামী মৃত্যুবরণ করলে। এই ইদ্দতকে 'ইদ্দতে ওফাত' বলা হয়। দুই. বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে কোন নারী যে সময় সীমার মধ্যে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না তাকে ইদ্দত বলে। এই ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

'হে নবী (আপনি মানুষদেরকে জানিয়ে দিন) যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা কর। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার কর না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবে'।[১৪০]

আয়াতটির শানে নুযূল

আলোচ্য আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে 'রাজ 'আত' (স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা) নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) আরো ইরশাদ করলেন, 'অতঃপর যদি তালাক দিতে চাও, তবে 'তুহর' ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় তালাক দাও'।[১৪১]

ইদ্দত আইনের প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর সকল আইনেই এরূপ অপেক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু ইসলামী আইনে এই সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা ব্যাপকতর। এই অপেক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো পিতৃত্ব স্থাপন করা, স্ত্রী গর্ভধারণ করছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং ইদ্দতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে বলেছেন যে, 'এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় তিনি তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিবেন'। অর্থাৎ তালাক প্রদানের পর স্বামী-স্ত্রী অনুতপ্ত হবে এবং চিন্তাভাবনা করে স্বামী তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে

---

১৪০ আল-কুর'আন, আত -তালাক, ৬৫ : ১

১৪১ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (র.), *তাফসীর খাযাইনুল ইরফান* (অনু. আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, চট্টগ্রাম : গুলশান-ই- হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, ২০১০), পৃ. ১০০৪

ইদ্দতকালের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে।[১৪২] সহীহ্ কিংবা ফাসিদ বিবাহের পরিসমাপ্তির পর যদি উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে ইদ্দত অবশ্য-পালনীয়। এ ইদ্দত পালন করার পর নতুন বিবাহ বৈধ হয়। মুসলিম বিবাহ স্বামীর মৃত্যু কিংবা বিবাহ-বিচ্ছেদের সাথে সাথেই পরিসমাপ্ত বলে পরিগণিত হয় না। কোন কোন ব্যাপারে বিবাহ এরূপ সমাপ্তির পরও ইদ্দতকাল অতিক্রম পর্যন্ত কার্যকরী বলে ধার্য হয়। বিবাহ সমাপ্ত হওয়ার সময় স্ত্রী যে স্থানে বসবাস করছে, ইদ্দত পালনকালে সে স্থানে বসবাস করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। অবশ্য তার স্বামীর গৃহেই বসবাস করবে-এরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

ইদ্দত পালন কখন প্রয়োজন

এক. বিবাহ মৃত্যুক্রমে পরিসমাপ্ত হলে গর্ভবতী নয়, এমন মহিলাদের জন্য এই ইদ্দত চারমাস দশ দিন। স্বামীর মৃত্যুক্রমে বিবাহের পরিসমাপ্তি ঘটলে এবং বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ অর্থাৎ সহীহ্ হলে ইদ্দত অবশ্য পালন করতে হবে। কিন্তু বিবাহ যদি ফাসিদ হয়, অর্থাৎ অসম্পূর্ণভাবে বৈধ হয়, তাহলে স্ত্রী সহবাস কিংবা নির্জন মিলন হলেই শুধু ইদ্দত পালন করতে হবে, অন্যথায় নয়।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন তারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বদ্ধে সবিশেষ অবহিত’।[১৪৩]

আলোচ্য আয়াতে স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য বিধবা নারীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মৃত স্বামীর প্রতি শোক প্রকাশের জন্য এই সময় সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জননী উম্মে হাবিবা ও জননী জয়নাব বিনতে জাহাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন, যে নারী আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসিনী, তার পক্ষে জায়েয হবে না কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে, মৃত স্বামীর জন্য তাকে শোক প্রকাশ করতে হবে চার মাস দশ দিন।[১৪৪]

আরবদের মধ্যে একটি প্রচলন ছিল, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে বসবাসের অযোগ্য একটি ঘরে স্থান দেয়া হতো। তাকে নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতে হতো। সুগন্ধি দ্রব্য এক বছর স্পর্শ করতে পারত না।

১৪২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮), খ.৮, পৃ. ৫৫৮

১৪৩ আল-কুর'আন, আল-বাকারাহ, ২ : ২৩৪

১৪৪ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৫৫৬

তাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অনেক বঞ্চনার সম্মুখিন হতে হত। আল-কুর'আন জাহেলী যুগের এসকল নিকৃষ্ট প্রথাকে বিলুপ্ত করে নারীকে দিয়েছে নিরাপদ পারিবারিক জীবনের নিশ্চয়তা।[১৪৫]

দুই. তালাকক্রমে কিংবা অন্য ধর্ম গ্রহণ দ্বারা স্বামী বিবাহের পরিসমাপ্তি ঘটালে উক্ত বিবাহ সহীহ্ কিংবা ফাসিদ যাই হোক না কেন, তাহলে স্ত্রী সহবাস কিংবা নির্জন মিলন হলেই শুধু ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু (ক) ঐ উভয় প্রকার বিবাহে যদি স্ত্রী সহবাস কিংবা নির্জন মিলন না হয়ে থাকে কিংবা (খ) স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে নাই, এরূপ ক্ষেত্রে যদি উক্ত স্বামী-স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হয়, তাহলে ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় না। এ সম্পর্কে আল-কুর'আনে এসেছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

'তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায়, তবে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী'।[১৪৬]

আলোচ্য আয়াতে তালাক প্রাপ্তা ঋতুবতী স্ত্রীর ইদ্দত তিনটি ঋতুকাল হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ঋতুবতী স্ত্রীর ইদ্দত পালনের পিছনে হেকমত হল তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর মনে নতুন করে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ উজ্জীবিত রাখা। পাশাপাশি স্ত্রীর গর্ভে ভ্রুণ আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ গর্ভস্থ সন্তানের দায়- দায়িত্ব কোন দম্পত্তি এড়িয়ে চলতে পারে না। এই ইদ্দত কালীন সময়ে স্বামী এবং স্ত্রীকে দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পরিশেষে তারা যদি দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায়, তাহলে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে স্বামীকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

তিন. যেসব নারী বয়সে সল্পতা হেতু এখনো ঋতুবতী হয়নি অথবা বেশি বয়স হবার কারণে ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এরূপ তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হলো তিন চান্দ্র মাস।

চার. গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত। এ সম্পর্কে আল-কুর'আনে এসেছে,

---

১৪৫ প্রাগুক্ত, ৫৬৬
১৪৬ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৮

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।

ইদ্দত পালন কখন আবশ্যক নয়

ক) বিবাহ যদি সহীহ্ হয় এবং উক্ত বিবাহ তালাক দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়, এবং স্ত্রী সহবাস না হয়, কিংবা স্বামী-স্ত্রী সম্ভোগকল্পে কখনও বৈধ নির্জনতা উপভোগ না করে থাকে, তাহলে ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় না।

খ) বিবাহ যদি ফাসিদ হয় এবং উক্ত বিবাহ তালাক কিংবা মৃত্যুক্রমে পরিসমাপ্ত হয়, এবং স্ত্রী সহবাস না হয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রী সম্ভোগকল্পে বৈধ নির্জনতা উপভোগ করুক না করুন ইদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন হয় না।

গ) ব্যভিচারী সঙ্গমের জন্য কোন ইদ্দত পালন করতে হয় না।[১৪৭] এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে এসছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে করবে, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে, তখন তাদেরকে তোমাদের জন্যে কোন ইদ্দত পালন করতে হবেনা।[১৪৮]

ইদ্দত পালন আরম্ভ হবে

ক) স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেঃ মৃত্যুর তারিখ হতে, বিবাহ সহীহ্ কিংবা বাতিল যাই হোক না কেন।
খ) তালাকের ক্ষেত্রে (১) সহীহ্ বিবাহ হলে তালাকের সময় হতে; (২) ফাসিদ বিবাহ হলে যেদিন হতে তার বিবাহ (আদালত কর্তৃক কিংবা অন্যভাবে) বিচ্ছিন্ন হয়, সে দিন হতে ইদ্দত পালন করতে হয়।[১৪৯]

---

১৪৭ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
১৪৮ আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৪৯
১৪৯ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

ইদ্দতকালের বাধা-নিষেধ

ক) স্ত্রী কোন বিবাহ করতে পারে না।

খ) স্বামীর যদি চারটি স্ত্রী থাকে, তাহলে তালাক-প্রাপ্তা চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দতকালের মধ্যে সে অন্য বিবাহ করতে পারবে না, তাকেও এই চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হবে।

গ) তালাক- প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতকালের মধ্যে স্বামী ঐ স্ত্রীর মুহাররমাত এরূপ সম্বন্ধের কাউকে বিবাহ করতে পারবে না।

ঘ) স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে কিংবা তার সম্পত্তি হতে কোন কোন ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ আদায় করতে পারবে।

ঙ) সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতে পারে না। কিন্তু 'মরযুল-মউত' অর্থাৎ মৃত্যু-ব্যাধির ক্ষেত্রে কোন কোন পরিস্থিতিতে এরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারে।[১৫০]

তালাকের সংখ্যা

কোন স্বামী তার স্ত্রীকে সমগ্র দাম্পত্য জীবনে সর্বাধিক তিন তালাক দিতে পারবে।[১৫১]

তালাকের যোগ্যতা

প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। তালাকদাতাকে স্বামী বা তার প্রতিনিধি হতে হবে এবং উভয়েরই প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী হওয়া অপরিহার্য।[১৫২]

তালাকের পদ্ধতি

সুস্পষ্ট বাক্যে অথবা পরোক্ষ বক্তব্যে অথবা ইশারা ইংগিতে অথবা লিখিতভাবে প্রদত্ত তালাক সংঘটিত হবে। সুস্পষ্ট বাক্যে স্ত্রীকে তালাক দিলে তা সংঘটিত হবে, তালাকদাতার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। পরোক্ষ বক্তব্যে (যেমন তোমার ব্যাপার তোমার হাতে, তুমি ইদ্দত পালন কর, তুমি আমার উপর হারাম ইত্যাদি) তালাক দিলে তা স্বামীর নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। সুস্পষ্ট ইংগিতে বোবার প্রদত্ত তালাক সংঘটিত হবে এবং লিখিতভাবে তালাক দিলে এবং মুখে উচ্চারণ না করলেও তালাক কার্যকর হবে।[১৫৩]

তালাকের সাক্ষী

তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। কুর'আন মজীদে তালাকের সাক্ষী সম্পর্কে বলা হয়েছে,

---

১৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
১৫১ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
১৫২ প্রাগুক্ত।
১৫৩ প্রাগুক্ত।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

'তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা তাদের সসম্মানে রেখে দিবে অথবা সসম্মানে ত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্যে হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষী দিও'।[১৫৪] কিন্তু ফকীহগণের মতে তালাকদানের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক নয়, মুস্তাহাব। (উত্তম)

তালাক আইনের বিধি-নিষেধ

হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম: তালাক দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে যে কোন সময়ই তালাক দেয়া জায়েয নয়। তার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা আবশ্যক। শরি'য়তের দৃষ্টিতে তার জন্য উপযুক্ত সময় হচ্ছে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী যখন হায়েয নিফাসের অবস্থায় নয়। এবং এমন পবিত্র অবস্থায় যখন তার সাথে সঙ্গম করেনি। তবে স্ত্রী গর্ভবর্তী হলে ও তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়লে তখন ভিন্ন কথা। এরূপ শর্ত এ জন্যে আরোপ করা হয়েছে যে, হায়েয বা নিফাস অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা থাকে। স্ত্রী সঙ্গম থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় স্বামী তার প্রতি মনক্ষুন্ন বা ক্ষুব্ধ থাকতে পারে। এ কারণেই তাকে তালাক দিতে উদ্যত হয়ে থাকতে পারে। এই সম্ভাবনার কারণে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বামী তালাক দেয়ার জন্যে স্ত্রীর সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। পবিত্র হওয়ার পর সঙ্গম করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দিবে।[১৫৫]

যে তুহরে স্ত্রী সহবাস করা হয়েছে সে অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম: স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া যেমন হারাম, অনুরূপভাবে যে পবিত্র অবস্থায় সঙ্গম করেছে, তখন তালাক দেয়াও হারাম। কেননা এ সঙ্গমের দরুন গর্ভের সঞ্চার হয়েছে কিনা, তা তো কারো জানা নেই। কেননা স্বামী যদি জানতে পারে যে, স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে তাহলে সে হয়ত তাকে তালাক দিতই না। গর্ভ হওয়ার কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেয়ার সিদ্ধান্ত করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু স্ত্রী যখন পবিত্রাবস্থায় থাকবে ও তখন স্বামী তার সাথে সঙ্গম করেনি অথবা স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে ও সে গর্ভ প্রকাশমান হয়ে পড়েছে, এরূপ অবস্থায় তালাক দেয়ার অর্থ, স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। কাজেই এরূপ অবস্থায় তালাক দেয়ার অনুমতি আছে।[১৫৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নবী করীমের জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ে নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাকে

---

১৫৪ আল-কুর'আন, আত-তালাক, ৬৫ : ২

১৫৫ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ২৮২

১৫৬ প্রাগুক্ত।

বল, সে যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে তার পবিত্র অবস্থায় ইচ্ছা করলে যেন তালাক দেয় সঙ্গমের পূর্বেই।[১৫৭]

একসাথে এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়া হারাম। যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করছে তার উপর স্বামী তিন বার তালাক দেয়ার ক্ষমতা লাভ করে। আলেমগণ সর্বসম্মত রায়ে বলেছেন, এক বাক্যে তিন তালাক দেয়া কিংবা পরপর ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে পবিত্রতার মেয়াদে তিন তালাক দেয়া স্বামীর উপর হারাম। তারা বর্ণনা করেন যে, একবারে তিন তালাক দিয়ে ফেললে পরে অনুতপ্ত হলে প্রতিকারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শরি'য়ত পর্যায়ক্রমে ও বিরতি সহকারে একাধিক তালাকের ব্যবস্থা করেছে, যাতে অনুতাপ ও অনুশোচনার ক্ষেত্রে প্রতিকার করতে পারে। তাছাড়া এ দ্বারা স্ত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা এ দ্বারা স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৫৮]

ঋতু অবস্থায় অথবা যে তুহরে স্ত্রী সহবাস করা হয়েছে-এই দুই অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কাজেই আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ অর্থাৎ যদি তালাক দিতেই হয় তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে 'স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করতে হবে। আর যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সেই তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য নির্ধারিত তহুর ঠিক করার একটি বিশেষ কারণ এই যে, এ সময়ের মধ্যে স্বামীর রাগ কমেও যেতে পারে, এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ফিরে এসে তালাক দেয়ার ইচ্ছা শেষ হয়ে যেতে পারে।[১৫৯]

আল-কুর'আনে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ব্যবস্থাপত্র ও পুনর্বাসন পদ্ধতি

জাহেলী যুগে বিবাহ ব্যবস্থা কোন প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি ছিল না। একজন পুরুষের জন্য স্ত্রীর সংখ্যাও নির্ধারিত ছিল না। ছিল না তালাক ব্যবস্থার রীতি পদ্ধতি। একজন স্বামী যতবার ইচ্ছা ততবার তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো। এমনকি একশতবার বা তার চেয়ে অধিকবার তালাক দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তালাক প্রাপ্তা নারীর নূন্যতম মানবিক মর্যাদা প্রদান করা হতো না। ইসলাম সর্বপ্রথম বিবাহ ও তালাক ব্যবস্থাকে সুউচ্চ মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তালাক প্রাপ্তা নারীর মৌলিক

---

১৫৭ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), *তিরমিযী* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), খ. ২, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ১১৭৫

১৫৮ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২১৪

১৫৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), খ.১, পৃ. ৬১৭

অধিকার সুনিশ্চিত করে তার পুনর্বাসনে যুগান্তকারী সামাজিক বিধিবিধান প্রদান করেছে। নিম্নে আল-কুর'আনে বর্ণিত অধিকার সমূহ বর্ণনা করা হল :

এক. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায়, তবে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী'।[১৬০]

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর যেমন দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, তেমনি তাদের কিছু অধিকারও রয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে অপেক্ষা করা তথা ইদ্দত পালন করা। এবং তাদের গর্ভাশয়ে কোন সন্তান আছে কিনা তা গোপন না করা। আর তাদের স্বামীদের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য যেন সৎ থাকে। স্ত্রীকে ফেরত নিয়ে তার উপর কোনরূপ প্রতিশোধ, অত্যাচার ও মারধর করা চলবে না। নারীদের উপর পরুষের মর্যাদা আছে। এই উক্তিতে স্ত্রীকে ইদ্দতকালে স্বামীর তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।[১৬১]

দুই. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

এই তালাক দু'বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তন্মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়, যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে

---

১৬০ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৮
১৬১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ২৪৭

নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। এইসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা উহা লংঘন করো না। যারা এইসব সীমারেখা লংঘন করে তারাই জালিম।[১৬২]

আলোচ্য আয়াতে স্বামীদের সীমাহীন তালাক প্রদানের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। সেই সাথে তালাক প্রদানের পর্যায় ক্রমিকভাবে তিন তালাক প্রদানের রীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীদের মর্যাদা সমুন্নত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্বামী- স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যে, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 'বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে'। এই নীতিমালা স্ত্রীদের বারবার তালাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন নিয়ে দীর্ঘ কাল ছিনিমিনি খেলার অবকাশ চিরতরে রহিত হয়েছে। ফলে, এখন থেকে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে। কারণ বিধিমত রেখে দিবে। এই নীতিমালা দ্বারা ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীর শরি'য়ত সম্মত যাবতীয় অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তার বিধান করা স্বামীর উপর কর্তব্য। আর যদি ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করা না হয় তা হলে তা বাইন তালাকে পরিণত হবে। তখন নতুন করে মহরানা নির্ধারণ পূর্বক স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ফেরত নেয়া যাবে না।[১৬৩]

আলোচ্য আয়াতে দুটি রিজিঈ তালাকের (যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়) কথা বলা হয়েছে। উক্ত দুটি তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর চূড়ান্ত তালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরতরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পর 'অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে'- এই নীতিমালার আলোকে ঝগড়া-বিবাদ, রাগ-বিশৃঙ্খলা পরিহার করে ভদ্রতা ও সৌজন্যতার সাথে স্ত্রীর মানবিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তাকে বিদায় দিতে হবে।[১৬৪] স্ত্রীর বিদায়কালে দাম্পত্য জীবনে কখনো মোহরানা বাবদ বা খোরপোশষ বাবদ কিংবা উপহার উপঢৌকন বাবদ স্বামী স্ত্রীকে যা কিছু দিয়েছে তার কোন কিছুই ফেরত নেয়া সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ।[১৬৫] পাশাপাশি আলোচ্য আয়াতে স্ত্রীর খুলা তালাকের বিধান প্রবর্তন করে তালাক অর্পণে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারে সমতা আনায়ন করা হয়েছে। একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

---

১৬২ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২২৯
১৬৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৪৮
১৬৪ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৪৯ ; মুফতি মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬২২
১৬৫ মুফতি মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬১৮

'যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দিবে। কিন্তু অন্যায়রূপে তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকিয়ে রাখিও না। যে এরূপ করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কিতাব এবং হিকমত যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যা দ্বারা তিনি তোমাদিককে শিক্ষা দেন তা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়'।[১৬৬]

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে বাইন তালাক সংগঠিত হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রাখা যাবে না। যেমন স্ত্রীর কাছ থেকে কোন পণও চাওয়া যাবে না। তাকে যার সাথে ইচ্ছা হয় বিয়ে করতে ও বাধা দেয়া যাবে না।[১৬৭]

চার. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত কাল পূর্ণ করে, তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদিগকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হয়। এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না'।[১৬৮]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনর্বিবাহে বাধা দেয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজে কখনো দেখা যায় যে, প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশত উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরি'য়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। এরূপ অন্যায়কেই এ আয়াত দ্বারা প্রতিরোধ করা

---

১৬৬ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩১
১৬৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৫৩; মুফতি মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬৩১
১৬৮ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩২

হয়েছে।[১৬৯] আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রত্যেক প্রাপ্তা বয়স্কা স্বাধীন নারীদের স্বামী নির্বাচনের অধিকার ও স্বাধীনতা দান করে নারী জাতির মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[১৭০]

পাঁচ. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى

'যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানগণকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না'।[১৭১]

অত্র আয়াতে প্রত্যেক প্রসূতি মায়ের দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধপান সম্পর্কে বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। নবাগত শিশুর শারিরীক, মানসিক বিকাশ ও বর্ধন মায়ের দুধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নবাগত শিশুর স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে প্রসূতি মায়ের যথোপযুক্ত ভরণ- পোষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বিরোধ এ সকল দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা নবজাতককে দু'বছর দুধপান করানোকে তার মাতার উপর ফরজ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রসূতি মায়ের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার সুনিশ্চত করা নবজাতক শিশুর পিতার উপর ফরজ করে দিয়েছেন। এই দায়িত্ব পালনে স্বামী ও স্ত্রী তথা নবজাতকের পিতা ও মাতা উভয়ের সমান অংশীদার।

স্তন্য দানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।[১৭২] এ বিষয়ে আল-কুর'আন বলে, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

---

১৬৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), খ.১, পৃ. ৬৩৫

১৭০ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসিরে মাজহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫১

১৭১ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩৩

১৭২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬৪২

'(গর্ভবতী তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সন্তান প্রসব হয়ে গেলে) 'যদি তারা তোমাদের সন্তানদের কে স্তন্য দান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে এবং এ সম্পর্কে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পরে জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্য দান করবে'।[১৭৩]

ছয়. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

'যদি তারা (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করবে।[১৭৪] আলোচ্য আয়াতে গর্ভবতী নারীদের যথোপযুক্ত ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তানের পরিপুষ্টি গর্ভবতীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই আল-কুর'আনের ঘোষণা শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিপুষ্টি, বিকাশ ও বর্ধনের প্রক্রিয়া শুরু করে মায়ের গর্ভে শিশুর অবস্থানকালীন সময় হতে। এবং এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘোষণা করে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুই বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে শিশুর বিকাশের এই প্রক্রিয়াকে 'Pre-natal period' ও 'Post-natal period' দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আল-কুর'আন চৌদ্দশত বছর পূর্বেই গর্ভবতী নারী, গর্ভস্থ শিশুর এবং নবজাতক শিশুর শারীরিক-মানসিক পরিপুষ্টি, বিকাশ ও বর্ধনের স্বাস্থ্যবিষয়ক সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে মানবিক মূল্যবোধকে উচ্চকিত করেছে।

সাত. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

'স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহ প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে যা গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ জানেন যে, তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না। নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করোনা এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ ক্ষমা-পরায়ণ, সহনশীল।[১৭৫] আলোচ্য আয়াতে ইদ্দত পালনকারিনী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি আকার ইঙ্গিতে বিয়ের পয়গাম পাঠাতে কিংবা তাকে মনে মনে

১৭৩ আল-কুর'আন, আত-তালাক, ৬৫ : ৬
১৭৪ আল-কুর'আন, আত-তালাক, ৬৫ : ৬
১৭৫ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৩৫

বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করাকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ইদ্দত পালনরত অবস্থায় সংগোপনে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া তথা সম্ভোগের প্রস্তাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[১৭৬]

এখানে তালাকপ্রাপ্তা নারীর পুনর্বিবাহে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে তার প্রতি কোনরূপ লালস দৃষ্টি ফেলতে না পারে-এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তাই ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বন্ধনকে নিষিদ্ধ করে ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা নারীকে প্রকাশ্য বিবাহের প্রস্তাব প্রদানের মাধ্যমে বিবাহকে সামাজিক পবিত্র বন্ধন হিসেবে আল-কুর'আন ঘোষণা করেছে।

সাত. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

'তালাক প্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ-পোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য'।[১৭৭] অত্র আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দত পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করা স্বামীর উপর ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিত্তশালী ও অবিত্তশালীরা তাদের স্ব-স্ব আর্থিক যোগ্যতানুসারে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে, যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দিবেন।[১৭৮]

আট. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

'তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। তারাও যেন স্বামী গৃহ থেকে বের না হয়, যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়'।[১৭৯] অত্র আয়াতে তালাক প্রাপ্তা ইদ্দত প্রাপ্ত পালনকারিনী স্ত্রীকে স্বামী গৃহ থেকে বহিষ্কার করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বামী যেরূপ ঘরে বাস করে, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকেও সেরূপ ঘরে বসবাসের সংস্থানের জন্য আল-কুর'আন নির্দেশ জারি করেছে,

---

১৭৬ আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.), প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৭১
১৭৭ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৪১
১৭৮ আল-কুর'আন, আত -তালাক, ৬৫ : ৭
১৭৯ আল-কুর'আন, আত- তালাক, ৬৫ : ২

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও (তালাকপ্রাপ্তা) বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না'।[১৮০] অত্র আয়াতে যে পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না হয়ে যায়। সে পর্যন্ত ইদ্দতের দিনগুলিতে স্বামীগৃহে বসবাস করা স্ত্রীর অন্যতম অধিকার, এটা কোন কৃপা নয়। ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় স্বামী গৃহ থেকে বের হওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা স্বামী গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয়। আল্লাহ তা'য়ালার হক, যা ইদ্দত পালনকারিনীর উপর ওয়াজিব। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকালে স্বামীর গৃহে যখন বসবাস করবে, তখন তাকে তিরষ্কার করা অথবা তার অভাব পূরণে কৃপণতা করা, কিংবা কোনরূপ উত্যক্ত করা, যাতে সে স্বামী গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এসমস্ত গর্হিত কাজ সম্পূর্ণ হারাম।

উপরে বর্ণিত আয়াত সমূহে দ্বারা প্রমাণিত হয়, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, ও তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রী, গর্ভস্থ শিশু সন্তান, নবজাতক শিশুর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-কুর'আন ন্যায়ানুগ, সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা বিশ্বমানব সমাজকে উপহার দিয়েছে।

তালাক সম্পর্কে অমুসলিম মণীষীদের অভিযোগ ও এর জবাব

ইহুদি পন্ডিত Robert Roberts তালাক সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতিগুলো উপস্থাপন করেন,

1. The right of divorce is confined entirely to the husband, and anything beyond this must be looked for in the works of the Muhammedan jurists, who, it must be admitted, have to some extent made up for the one-sided treatment of the subject by the prophet.[১৮১]

'আল-কুর'আন তালাকের অধিকার সম্পূর্ণ স্বামীর হাতে ন্যাস্ত করেছে। এর বাইরে মুসলিম আইনজ্ঞগণ নবী মুহাম্মদ (স.) প্রদত্ত নীতিমালার মাধ্যমে তালাক আইনের একপেশে বিধি ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছেন'।

Robert Roberts'র উক্তিটির সংক্ষিপ্ত জবাব হল আল-কুর'আন শুধু স্বামীকেই নয় বরং স্ত্রীকেও খুলা তালাক ও তাফভীজ তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলোচিত

১৮০ আল-কুর'আন, আত- তালাক, ৬৫ : ৬
১৮১ Robert Roberts, Ibid, p.19

তালাক আইনটি অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, আল-কুর'আন অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে তালাকের বিধি-বিধান প্রণ৯য়ন করেছে। পাশাপাশি তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও পুনর্বাসনে যুগান্তকারী মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

2. When we now consider this separation of the sexes, and how thus a man may marry a woman whom he has never seen. One can easily understand mow such a man may afterwards be anxious to free himself from his wife, and how also a divorce may be necessary tor the happiness of the parties thus joined together, as well as for the sake of morality and the prevention of more grievous sins.

   On the other hand, the great facility with which a man may divorce his wife; the fact that any trivial cause is sufficient to secure for a Muslim his freedom, naturally weakens the marriage bond, and reduces woman to the most degrading position in the social scale.[১৮২]

Robert Roberts তালাকের যুক্তি বর্ণনায় স্বীয় অভিমত পেশ করেন এভাবে, 'দুই লিঙ্গের মধ্যে যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তার কারণ নারী ও পুরুষের মধ্যকার পর্দা প্রথা। একজন নারী যাকে সে কখনোই দেখেনি অথচ তাকেই একজন পুরুষকে বিয়ে করতে হচ্ছে। সহজেই বুঝা যায় যে, পরবর্তীতে এই পুরুষটিকে তার স্ত্রী থেকে মুক্তি পেতে কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন থাকতে হয় এবং মূলত এরূপ প্রক্রিয়ায় দুই অচেনা, অজানা নর-নারী বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হয়। ফলে পরবর্তীতে তাদের সুখ-শান্তির জন্যই বিবাহ বিচ্ছেদ তথা তালাকের আবশ্যকতা দেখা দেয়। পাশাপাশি নৈতিকতার খাতিরে এবং অধিকতর ভয়ানক পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তালাক ছাড়া বিকল্প অন্য কোন কিছু চিন্তা করা যায় না। অপরদিকে পুরুষের হাতে তালাক প্রদানের বাধাহীন ক্ষমতা থাকার কারণে অতি তুচ্ছ কারণেই একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে থাকে। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের বিবাহ বন্ধনের গ্রন্থি অত্যন্ত দুর্বল, নাজুক ও নড়বড়ে। এভাবেই নারীদের সামাজিক অবস্থান অনেক খাটো ও অপমানজনক'।

উক্তিটির জবাব

Robert Roberts'র উপরোক্ত উক্তিটি মনোযোগের সাথে পাঠ করলে এই বিষয়টি বুঝতে মোটেও অসুবিধা হয় না যে, Robert Roberts'র আল-কুর'আন ও ইসলামী শরি'য়ত সম্পর্কে ধারণা খুবই

---

১৮২ Robert Roberts, *The social Laws of the Quran* (New Delhi: kitab Bhavan, 1977), p.20

অস্পষ্ট। ইসলামী শরি'য়তের মূল চারটি উৎস আল-কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল-কুর'আনের আয়াত থেকে সরাসরি সামাজিক আইন অনুধাবনের চেষ্টা করাতে রবার্ট রবার্টস আল-কুর'আনের আয়াত অনুধাবনে বিভ্রান্ত হয়েছেন। Robert Roberts মনে করেন, 'মুসলিম সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ একজন পুরুষ বিবাহের পূর্বে পাত্রীকে না দেখে এবং তার সাথে পরিচিত না হয়ে অজানা- অচেনা এরূপ পাত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে বিবাহের পর নব দম্পত্তি একে অপর থেকে নানা কারণে বিমুখ হয়, তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বনিবনা হয়না, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং পরিশেষে তা বিচ্ছেদে রূপ নেয়।' Robert Roberts'র এই উক্তিটিও সম্পূর্ণ মনগড়া, অমূলক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে অসত্য। কারণ মুসলিম সমাজে বিবাহের পূর্বে পাত্রীকে ভালভাবে দেখে নেয়ার রীতিনীতি আল-কুর'আন ও সুন্নাহ দ্বারা শুধু সমর্থিত ও অনুমোদিত নয় ইসলামি শরি'য়ত বিয়ের পূর্বে কনেকে ভালভাবে দেখে নেয়াকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছে। এ পর্যায়ে পবিত্র হাদীস গ্রন্থসমূহে এবং ইসলামি আইন শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা ও বিধি-বিধান বর্ণিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আন হতে সরাসরি দলিল উপস্থাপন করা যায় নিম্নোক্ত সূরা আন-নিসার তৃতীয় আয়াত দ্বারা :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

'যদি তোমাদের এ ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা এতিম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনোপুত হয় তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। অতঃপর যদি তোমাদের এই আশঙ্কা থাকে যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা'।' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সুয়ূতি লিখেন, এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা রয়েছে যে, বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা কোন মেয়ে পছন্দ কিংবা কোন মেয়ে ভাল হবে তা নিজের চোখে দেখেই ধারণা করা যেতে পারে।[১৮৩] অধিকন্তু হবু বর কনে বিবাহের পূর্বে শরি'য়তসম্মত উপায়ে একে অপকে দেখে নিতে পারে এবং পরিমিত আলাপচারিতার মাধ্যমে একে অপরের মানসিক চাহিদা অনুধাবন করে নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদীস উদাহারণ হিসেবে পেশ করা যায়। রাসূলে পাক (স.) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে

১৮৩ আল্লামা আবুল ফজল শিহাব উদ্দিন আস্ সাইয়্যেদ মাহমুদ আল-আলুসি, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৯২

অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।[১৮৪] ইমাম শাফি (র.) এর মতে, বিয়ের প্রস্তাব রীতিমত পেশ করার পূর্বেই কনেকে দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যেন প্রস্তাব কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে কোন পক্ষের জন্যেই লজ্জা বা অপমানের কারণ না ঘটে।[১৮৫] 'অপরদিকে পুরুষের হাতে তালাক প্রদানের বাধাহীন ক্ষমতা থাকার কারণে অতি তুচ্ছ কারণেই একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে থাকে। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের বিবাহ বন্ধনের গ্রন্থি অত্যন্ত দূর্বল, নাজুক ও নড়বড়ে। এভাবেই নারীদের সামাজিক অবস্থান অনেক খাটো ও অপমানজনক।' Robert Roberts'র উক্তিটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিভ্রান্তিমূলক। রবার্ট রবার্টের উক্তিটি পর্যালোচনার পূর্বে ইসলামে তালাকের যৌক্তিকতা অনুধাবন করা আবশ্যক। মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা তার 'কিতাবুশ শিফা'তে বলেছেন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার একটা না একটা উপায় থাকাই উচিত এবং সর্বদিক থেকে এর পথ রুদ্ধ করা অনুচিত। কেননা বিয়ে বিচ্ছেদের সকল পথ সর্বতোভাবে বন্ধ করে দেয়া ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হতে পারে একাধিক কারণে, প্রথমত জন্মগতভাবে কিছু মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এমন হয়ে থাকে, যা অন্যান্যদের স্বভাব প্রকৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং নিজেকে সহনশীল ও অনুরক্ত করতে সমর্থ হয় না। এ ধরনের দুই জনকে জোরপূর্বক একত্রিত করে রাখতে যতই চেষ্টা করা হবে, ততই বিরোধ, তিক্ততা ও অমঙ্গল বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত ঘটনাক্রমে এমন স্বামী বা স্ত্রী কারো কারো ভাগ্যে জুটে যেতে পারে, যে তার সমকক্ষ নয়, কিংবা মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রীতিকর নয়, অথবা এমন বিরক্তিজনক স্বভাবের যে, অপরজন তাকে মেনেই নিতে পারেনা। এ ধরনের অসম দাম্পত্য বন্ধনের ফলে মানুষ পরকীয়া প্রেম বা বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কেননা যৌন আবেগ ও তাড়না একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যা নানা ধরনের অন্যায় ও অপরাধের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আর না হোক, এ ধরনের দম্পতি সন্তান প্রজননে পরস্পরকে সহযোগিতা নাও করতে পারে। অথচ জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী পরিবর্তনের সুযোগ পেলে এ ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারত। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের একটা সুযোগ থাকা অপরিহার্য। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ বিষয়ে কঠোর হওয়া চাই।[১৮৬]

আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে পরিবার ও বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন হিসেবে স্বীকৃত, যা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করে। আল-কুর'আন বিবাহকে 'মিসাকান গালিজা' তথা সুদৃঢ় অঙ্গীকারের বন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। পরিবার শুধু মানুষের ঐচ্ছিক বা আবেগত কোন প্রতিষ্ঠান নয় বরং আল্লাহর

---

১৮৪ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন পাত্রী দেখা, হাদীস নং ২০৮২, পৃ. ২৮৪

১৮৫ বদরুদ্দিন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আল-আইনি, *উমদাতুল ক্বারী* (বৈরুত : দার ইহইয়াউ আত-তুরাস- আর-আরাবী, ২০০৩), খ. ১, পৃ. ১

১৮৬ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৯৮

নির্ধারিত আধ্যাত্মিক পরিবেশের নাম । ফলে ইসলামে পরিবারের নামে বিকৃত যৌন চর্চা সম্পূর্ণ হারাম। তাই প্রেম ও মমতা, ভালবাসা ও উদারতায় ভরপুর স্থায়ী মানবিক অনুভূতিতে আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম নর-নারী আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সাক্ষী রেখে পরস্পরে বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনে তথা 'মিসাকান গালিযাতে' আবদ্ধ হয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মতির ভিত্তিতে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্ধারিত সীমার মধ্যে পরিবারের সকল দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। মানবতার ভবিষ্যত বংশধারাকে গতিশীল রাখার লক্ষ্যে। মুসলিমদের বিবাহ বন্ধনের গ্রন্থি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে মুসলিম সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের হার ইহুদি ও খ্রিষ্টান সমাজের চেয়ে অনেক কম। তারপরও ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে বাস্তব প্রয়োজনে তালাকের মানবিক বিধান প্রবর্তন করে দাম্পত্য জীবনের বিপর্যয়কে সুরক্ষা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মিরাস আইন ও অছিয়ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : মিরাস আইন

◊ ফারায়েযের সংজ্ঞা
◊ মিরাস আইনের গুরুত্ব
◊ মিরাস আইনের নীতিমালা
◊ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারসমূহ
◊ মিরাসের প্রাপ্যতা
◊ মৃতের যেসব আত্মীয় ওয়ারিশ হয়
◊ আল-কুর'আনে মিরাস আইনের বৈশিষ্ট্য
◊ আল-কুর'আনে মিরাস আইনের বিধিমালা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অছিয়ত আইন

◊ অছিয়তের সংজ্ঞা
◊ আল-কুর'আনে অছিয়তের বিধানের ক্রমবিবর্তন
◊ অছিয়ত ফরজ হওয়া প্রসঙ্গে আল-হাদীস
◊ অছিয়তের বিধান
◊ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অছিয়ত সম্পর্কে বিধান

চতুর্থ অধ্যায়

মিরাস আইন ও অছিয়ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিরাস আইন

ইসলামী শরি'য়তে উত্তরাধিকার আইনকে ইলমুল ফারায়েয বা ইলমুল মিরাস বলা হয়। আল-কুর'আন সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ উত্তরাধিকার আইন বিশ্ব মানবতাকে উপহার দিয়েছে। যার সুফল পাচ্ছে এই আইনের প্রয়োগকারীরা তথা মুসলমানরা। আল-কুর'আন প্রবর্তিত উত্তরাধিকার আইন তৎকালীন সমকালীন যুগ তো বটেই বর্তমান কালের আধুনিক কোন আইন এর সমকক্ষতায় দাড়াঁতে পারবে না। কারণ এই আইনে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ অকাট্যভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা শুধু পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার দিত, নারীদেরকে নয় এবং শুধু বয়স্কদেরকে দিত, অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে নয়। সেখানে শপথের মাধ্যমে পরস্পরকে উত্তরাধিকারী করা হতো। এ কুপ্রথাকে আল্লাহ তা'য়ালা বাতিল করে দিয়েছেন। এই আইনের মাধ্যমে প্রাক-ইসলামী যুগের নিপীড়নমূলক আইন রহিত করা হয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার প্রশ্নে সকল প্রকার বৈষম্য, নিপীড়ন দূর করে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারীর অংশ সুনির্দিষ্ট করা হয়। হাদীসে উত্তরাধিকার আইনকে 'ইলমুল ফারায়েয' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (স.) বলেছেন, 'উত্তরাধিকার আইন নিজে জান ও অপরকে শেখাও, সব জ্ঞানের অর্ধেক হচ্ছে এই জ্ঞান'। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এই বাণী মুসলিম আইন বিশারদগণ হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছেন এবং অক্লান্তভাবে প্রচার করে এসেছেন। বস্তুত ইসলামী শরি'য়তের মূল চারটি উৎস আল-কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে মুসলিম বিজ্ঞ আইন বিশারদগণ ইলমুল ফারায়েয তথা উত্তরাধিকার আইনের যাবতীয় বিধি-বিধান রচনা করেছেন।

ফারায়েযের সংজ্ঞা

১. শরি'য়তের পরিভাষায় ফারায়েয হচ্ছে উত্তরাধিকারীর জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তির অংশ। এ সংক্রান্ত বিদ্যাকে ইলমুল মিরাস বা ইলমুল ফারায়েয বলা হয়।[1] 'উত্তরাধিকার' হল মালিকানা আবর্তন যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যের অনুকূলে বর্তায়।[2]

মালিকের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির মালিকানার অধিকার কোনরূপ প্রতিদান বা অনুগ্রহ ব্যতীতই তার প্রাপকগণের নিকট স্থানান্তরিত হওয়াকে 'উত্তরাধিকার' বলে। এই মালিকানা হস্থানান্তরের

---

১ সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (অনু. আকরাম ফারুক ও অন্যান্য, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১২), খ.৩, পৃ. ৩০৯
২ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া*, (বৈরুত: দার-আল-ফিকর, ১৯৮০), খ.৬, পৃ. ৪৪৭

ক্ষেত্রে মালিকের ইচ্ছা বা এখতিয়ারের কোন দখল নাই। কারণ তার মৃত্যুর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মালিকানা তার ওয়ারিসগণের নিকট চলে যায়।

মিরাস আইনের গুরুত্ব

ইসলামী শরি'য়তে উত্তরাধিকার আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুর'আনে পার্থিব যেসব বিষয় সর্ম্পকে আল-কুর'আনের আয়াত ব্যাপক, উত্তরাধিকার তার মধ্যে অন্যতম। আল-কুর'আনে সূরা আন-নিসা ৭, ১১, ১২ এবং ১৭৬ নং আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে উত্তরাধিকার আইন বিধৃত। তাছাড়া সুন্নাহ হতে উত্তরাধিকার আইনের অনেক বিধি-বিধান নির্গত। আল-কুর'আন উত্তরাধিকার আইনের গুরত্ব ও সারমর্ম ব্যক্ত করেছে এই ভাষায় :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ সুনির্ধারিত এবং পিতা -মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ সুনির্ধারিত, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ'।[৩]

এই আয়াতে যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তা তৎকালীন প্রচলিত একটি নিষ্ঠুর কুপ্রথার কঠিন প্রতিবাদ। সেই কুপ্রথাটির সূচনা আরবে নয়, প্রায় সারা পৃথিবীতেই সুপ্রচলিত ছিল। এই কুপ্রথাটি হচ্ছে নারীদের উত্তরাধিকারের অস্বীকৃতি। এই আয়াতে নারীদের উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এই আয়াতে আরেকটি বক্তব্য যুগান্তকারী। এতে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের উত্তরাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

এই আয়াতে দুই প্রকার সম্পর্কের উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে الْوَالِدَانِ শব্দ দ্বারা। এই সম্পর্ক হচ্ছে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে। দ্বিতীয় সম্পর্ক ব্যক্ত করা হয়েছে وَالأَقْرَبُونَ শব্দের দ্বারা। এই শব্দ দ্বারা নিকটতম আত্মীয় বুঝায়। এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে, নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটাত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। ফলে নিকট-আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে।

এই আয়াতে আরেকটি মীমাংসা স্পষ্ট। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে نَصِيبًا مَّفْرُوضًا অর্থাৎ যে অংশ আল-কুর'আন নির্দিষ্ট করেছে, তা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত।

এ আয়াতে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানে পুরুষের জন্য এবং নারীর জন্য একই অবস্থা পৃথক শব্দাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। নারী এবং পুরুষের হক যে স্বতন্ত্র, এই বর্ণনাভঙ্গিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৪]

৩ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৭

রাসূলুল্লাহ (স.) ইলমুল ফারায়েযের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সম্পর্কিত কিছু হাদীস নিম্নে উপস্থাপন করা হলো,

ক. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রকৃত জ্ঞান তিন প্রকার, এগুলো ছাড়া আর সবই বাহুল্য। যথা ১) আল-কুর'আনের মুহকাম আয়াত (যার হুকুম মানসুখ বা রহিত হয়নি), ২) সহীহ ও সঠিক হাদীস এবং ৩) ইনসাফের সাথে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জ্ঞান।[৫]

খ. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, হে আবু হুরায়রা! ফারায়েয শিক্ষা কর এবং তা অন্যকে শিক্ষা দাও। কেননা তা ইলমের অর্ধাংশ। আর তা ভুলিয়ে দেয়া হবে এবং এটাই প্রথম জিনিস, যা আমার উম্মত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে।[৬]

মিরাস আইনের বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ইসলামী শরি'য়তের চারটি উৎস দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়েছে। উত্তরাধিকারী আইনকে ইসলামী শরি'য়তের পরিভাষায় ইলমুল ফারায়েয বা মিরাস আইন বলা হয়। মিরাস আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

১. মুসলিম মিরাস আইনে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অথবা পূর্বপুরুষ ও স্ব-উপার্জিত সম্পত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং একজন মৃত ব্যক্তি যে সম্পত্তি পরিত্যক্ত রেখে যায় তাই মীরাসযোগ্য সম্পত্তি যা ওয়ারিশদের মধ্যে বিধি অনুযায়ী বন্টন করা হয়।[৭]

২. মীরাসে জন্মগত অধিকার স্বীকৃত নয়। ভাবী উত্তরাধিকারীর অধিকার সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পর। পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পর জীবিত ওয়ারিশ যে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করবে, পূর্বপুরুষের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেই সম্পত্তিতে ওয়ারিশের কোন প্রকার স্বত্ব থাকে না।

৩. কতিপয় সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সুনির্দিষ্ট অংশ লাভ করে।

৪. এই সুনির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা পুরুষ মাধ্যম আত্মীয়রা পায় এবং তাদের অবর্তমানে নারী মাধ্যম আত্মীয়রা পায়।[৮]

---

৪ গাজী শাসছুর রহমান, *ফারায়েজ আইন* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯২), পৃ. ৮-৯

৫ ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস (র.), *আবু দাউদ*, (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি) কিতাবুল ফারাইয, হাদীস নং ২৮৭৫

৬ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ্ আল- কাযবীনী (র.), *ইবনে মাজা* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস নং ২৭১৯

৭ মীরাসযোগ্য সম্পত্তি মুসলিম আইনের পরিভাষায় 'তরকা' বা 'মাতরুকা' বলা হয়। 'তরকা' বলতে ঐ সম্পত্তিকে বোঝায় যা মৃত ব্যক্তি রেখে গিয়েছেন এবং এর মূল্যের সাথে অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার সংশ্লিষ্ট নাই। দ্র. যায়নুদ্দীন ইব্ন নুজায়ম, আল- বাহরুর রাইক শারহি কানযিদ দাকাইক, (মিশর : ১৩৩৪ হি.), খ.৮, পৃ. ৪৮৯

৮ গাজী শামছুর রহমান, *মুসলিম আইনের ভাষ্য* (ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ১৯৯৬), পৃ. ৪৭৩

৫. আধুনিক আইন বিশারদগণ ইসলামী আইনের এই শাখার প্রশংসায় মুখর। তৈয়বজী বলেন, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন তার পূর্ণতার জন্য সর্বদা প্রশংসিত হয়ে এসেছে। শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, ব্যক্তির সমন্বয়ে যে শ্রেণী গঠিত হয়, তার জন্যও এই আইন ব্যবস্থা করেছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিবর্তনের ব্যবস্থা এই আইনে নিখুঁত। সকল দাবির সুষ্ঠু সমাধান এই আইনে পাওয়া যায়। উত্তরাধিকার প্রশ্নের মীমাংসায় তাই এই আইন সার্থক।[৯]

৬. Macnaghten বলেন, 'In these provisions we find ample attention paid to the interests of all those whom nature places in the frist rank of our affections; and indeed it is difficult to conceive any system containing rules more strictly just and equitable'.[১০]

'ইসলামী ওয়ারিছী (উত্তরাধিকার) আইন মানুষের স্বাভাবিক স্নেহ-মমতার ভিত্তির নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে স্নেহ মমতা ও ভালবাসা অধিক, সেখানে প্রাপ্য অংশও আনুপাতিকভাবে অধিক। এর চেয়ে সুন্দর, নৈতিক ও বিবেকসম্মত ওয়ারিছী আইন সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্তের ব্যাপারে অকল্পনীয়'।

মিরাস আইনের নীতিমালা

১. স্বামী অথবা স্ত্রী মীরাস পাবে।

২. নারী এবং মাতৃ সম্বন্ধীয় আত্মীয়েরা মীরাসের যোগ্য হবে।

৩. উত্তরপুরুষ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষ মীরাস পাবে।

৪. নারী পুরুষের অর্ধেক পাবে।

৫. ইসলামী আইনে সম্পত্তিকে মাল বলে। মাল বলতে স্থাবর, অস্থাবর যৌথ, একক, বস্তু (আইন), উৎপাদ (মানাফী) সবই বোঝায়। অন্য আইনের মত ইসলামী আইন এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। মৃত ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তিই ফারায়েযের আওতায় আসবে।

৬. মৃত্যুর সাথে সাথেই মিরাসের প্রশ্ন উঠে, তার আগে নয়। মৃত্যুর কাল মিরাস বন্টনের জন্য তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৭. নারী ও পুরুষ সম্পত্তির উপর সমান স্বত্বাধিকার অর্জন করে। কোন মুসলিম যদি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যায় তবে তার সম্পত্তি তিনভাগে ভাগ হবে। তার দুই ভাগ পাবে ছেলে

৯ Tyabji, Faiz Badruddin, *Muslim Law* (Bombay: Kitab Vaban 1969), p.801
১০ Macnaghten, William H., *Principles and Precedents of Muhammadan Law* (Kolkata: Mollik Brothers, 1825) p.5

এবং এক ভাগ পাবে মেয়ে। মেয়ে যে অংশ পাবে সে অংশে তার অধিকার ছেলের মতই। সে অধিকারে দুর্বল নয়, নারী বলে তার স্বত্বকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।[১১]

৮. যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে মৃত্যুর সাথে সাথেই তার উত্তরাধিকারীগণের উপর স্বত্ব বর্তাবে।

৯. যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে তার সমুদয় সম্পত্তিকে ষোল আনা ১ ধরে বা ভগ্নাংশের আকারে হিসাব করলে ১ ধরে হিসাব করতে হবে।

১০. যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে প্রথমে তার কাফন-দাফন খরচ, দ্বিতীয়ত কোন ঋণ করে গেলে তা পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর কোনরূপ অছিয়ত করে গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হতে অছিয়ত বাবদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের উপরই কেবলমাত্র ওয়ারিশগণের স্বত্ব বর্তাবে। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশদের অনুমতি সাপেক্ষে এক-তৃতীয়াংশের অধিকও অছিয়ত করা যায়।[১২]

১১. যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে তিনি জীবিত থাকাকালীন তার ওয়ারিশ তার সম্পত্তি বন্টনের জন্য কোনরূপ দাবী করতে পারবে না।

১২. যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে তিনি যদি বৈধভাবে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে মৃত্যুবরণ করেন তবে ঐরূপ হস্তান্তরিত সম্পত্তি বন্টন বা ফারায়েযের আওতায় আসবে না।

১৩. যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে তিনি যদি তার স্ত্রীর গর্ভে তার ঔরসজাত কোন সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তবে বন্টনর ক্ষেত্রে ঐরূপ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি অপেক্ষা করা উত্তম। অন্যথায় ঐ গর্ভজাত সন্তানটিকে পুত্র সন্তান ধরে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন করা যেতে পারে।

১৪. স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রী (Divorced wife) ঐ স্বামীর মৃত্যুতে বন্টনের ক্ষেত্রে কোনরূপ অংশ প্রাপ্ত হবে না।

১৫. সুন্নি মুসলমান ইন্তেকাল করলে সুন্নী উত্তরাধিকার আইনের আলোকে তার উত্তরাধিকারগণ তার ত্যাজ্য সম্পদের মালিক হবেন। শিয়া মুসলমান ইন্তেকাল করলে শিয়া উত্তরাধিকার আইনের আলোকে তার ওয়ারিশগণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হবেন।[১৩]

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারসমূহ

কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার জীবিত উত্তরাধিকারীর উপর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আইনগত অধিকার সৃষ্টি হয়। তাই পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংজ্ঞা জানা আবশ্যক। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া

---

১১ Asaf A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law (Delhi : Oxford University Press 1974), PP. 390-391

১২ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

১৩ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩-৮৪

সমস্ত সম্পত্তিই পরিত্যক্ত সম্পত্তি। ইমাম ইবনে হাযম এই সংজ্ঞার সমর্থনে বলেন, 'মানুষ তার মৃত্যুর পর যে সম্পদ রেখে যায়, তাতে আল্লাহ উত্তারাধিকার নির্ধারণ করেছেন। যা সম্পদ নয় তাতে নির্ধারণ করেননি। অধিকারসমূহের মধ্যে যা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বা সম্পদের পর্যায়ভুক্ত, তা ব্যতীত অন্য কোনোটায় উত্তরাধিকার নির্ধারণ করেননি, যেমন উপকার পাওয়ার অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের অধিকার। নির্মাণ ও চাষাবাদের জন্য নির্ধারিত জমিতে অবস্থানের অধিকার। মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবে এ অধিকারসমূহ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তিও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, চাই এ সব অধিকার আর্থিক হোক বা আর্থিক ব্যতীত অন্য কিছু হোক।[১৪]

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার চার প্রকার। এগুলো সব সমান নয়, বরং একটি অপরটির চেয়ে অগ্রগণ্যতার দাবি রাখে এবং আগে সেই খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন,

১. প্রথম অধিকার: পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সর্ব প্রথম ব্যয় করা হবে মৃতের কাফন-দাফন বাবদ খরচ।

২. দ্বিতীয় অধিকার: তার ঋণ পরিশোধ করা। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি ও ইবনে হাযম আল্লাহর ঋণ যথা যাকাত ও কাফফারাকে বান্দার ঋণের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করেন। কিন্তু হানাফিগণ মৃত্যুর সাথে সাথে আল্লাহর অধিকার রহিত হয় বলে মনে করেন। ফলে উত্তারাধিকারীদের উপর তা পরিশোধ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় না। তবে তারা স্বেচ্ছায় সেটা পরিশোধ করতে পারে কিংবা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তা পরিশোধ করার অছিয়ত করলে পরিশোধ করতে পারে। যদি সে অছিয়ত করে তবে তা একজন অচেনা বা অনাত্মীয়কে অছিয়ত করার মত হবে। উত্তরাধিকারী বা যাকে অছিয়ত করা হয়েছে সে কাফন দাফন ও বান্দাদের ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পত্তি উদ্বৃত্ত থাকে তার এক চতুর্থাংশের ভেতর থেকে তা পরিশোধ করবে। এ ব্যবস্থা গৃহীত হবে তখন যখন তার কোন উত্তরাধিকারী থাকবে। উত্তরাধিকারী না থাকলে সমগ্র সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করা হবে। হাম্বলি ফকিহগণ সর্বাবস্থায় গোটা সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করার পক্ষপাতী। তা ছাড়া তারা বান্দার নির্দিষ্ট সামগ্রীর ঋণ সাধারণ ঋণের আগে পরিশোধ করা জরুরি, এ ব্যাপারে একমত।

৩. তৃতীয় অধিকার: ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পত্তি উদ্ধৃত্ত থাকে তার একতৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত বাস্তবায়ন। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

---

১৪ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০

'মৃত্যুর পূর্বে সে (পুরুষ) যে অছিয়ত করে গেছে এবং তার ঋণ আদায় করার পরেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে'।[১৫] একই ভাষায় আল্লাহ তা'য়ালা মৃত স্বামী, স্ত্রী ও কালালার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে তাদের যদি অছিয়ত থাকে এবং ঋণের বোঝা থাকে তা পরিশোধ করার পর ওয়ারিশানগণের মধ্যে অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬]

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ফকিহ্ একমত যে, অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধের দাবি অগ্রগণ্য। কারণ এটা অপরের অধিকারের সাথ সংশ্লিষ্ট। তাই মৃত ব্যক্তি যেহেতু সম্পদ রেখে গেছেন সেহেতু ঋণ দাতার ঋণ পরিশোধ করা প্রয়োজন।[১৭] ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট কড়াকড়ি আরোপ করেছে। প্রকৃত পক্ষে পাপ কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত রাখা, আচার আচরণ এবং লেনদেনে আস্থা সৃষ্টি করা এবং দলবদ্ধ জীবনে শান্তি আনার ভিত্তিতেই মানব জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ঋণকে ঋণ দাতার ঘাড়ে এমনভাবে রাখা হয়েছে, ঋণ পরিশোধ ছাড়া মৃত্যুর পরও সে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে না।[১৮]

জামেউত তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, হযরত আল ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেন, তোমরা কুর'আনুল কারীমের অছিয়তের নির্দেশ পূর্বে এবং ঋণের হুকুম পরে পাঠ করে থাক, কিন্তু জেনে রেখো যে, রাসূলুল্লাহ (স.) পূর্বে ঋণ পরিশোধ করেছেন এবং পরে ওছিয়ত জারী করেছেন।[১৯]

চতুর্থ অধিকার: অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন।

মিরাসের মূল উপাদান

মিরাস বা উত্তরাধিকার তিনটি উপাদানের উপস্থিতি দাবি করে:

১. উত্তরাধিকারী: অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে উত্তরাধিকারের কারণসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি কারণে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

২. মৃত ব্যক্তি বা এমন নিখোঁজ ব্যক্তি, যাকে মৃত গণ্য করা হয়েছে।

৩. উত্তরাধিার বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যে সম্পত্তি বা অধিকার মৃত ব্যক্তির মালিকানা থেকে উত্তরাধিকারীর মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়।[২০]

---

১৫ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১১

১৬ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১২

১৭ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, *তাফসীর ইবনে কাসীর* (অনু. ড. মুহাম্মদ মজীবুর রহমান, ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি), খ. ৪, পৃ. ৩০৪

১৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীরে ফী যিলালিল কুর'আন* (অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ঢাকা : আল-কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স), ১৯৯৮ খ.২, পৃ. ৬৫

১৯ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), *সুনানে তিরমিযী* (ঢাকা : মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ তা.বি), কিতাবুল অছিয়ত, হাদীস নং ২০৬৯

২০ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

মিরাসের প্রাপ্যতা

তিন কারণে মিরাস বা উত্তরাধিকারে প্রাপ্যতা সাব্যস্ত হয়ে থাকে:

এক. প্রকৃত সম্পর্ক বা প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা: আল্লাহ সূরা আনফালে বলেন,

وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার'।[২১]

দুই. পরোক্ষ আত্মীয়তা: যেমন রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ক্রীতদাসকে মুক্ত করা জনিত আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তার মত। (ইবনে হাব্বান ও হাকেম)। প্রকৃত আত্মীয় উত্তরাধিকারী নেই এমন ব্যক্তি যখন অন্য কারো সাথে এভাবে মৈত্রী বা বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে যে, নিজের মৃত্যুর পর একে অপরকে নিজের রক্তপণ পরিশোধ করার দায়িত্ব অর্পণ করে ও অপরজন তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তখন সে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তা ইমাম আবু হানিফার নিকট উত্তরাধিকারের একটি কারণ হিসেবে গণ্য। কিন্তু অন্যান্যদের নিকট গণ্য নয়। প্রচলিত আইনে শেষোক্ত মতের প্রতিফলন ঘটেছে।[২২]

তিন. বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন: আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد

'তোমাদের স্ত্রীগণ যে সম্পত্তি রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের প্রাপ্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে'।[২৩]

মিরাসের শর্তাবলী

মিরাস বা উত্তরাধিকারের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে:

১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু অথবা এমনভাবে নিখোঁজ হওয়া যে, বিচারকের রায়ে সে মৃত বলে ঘোষিত হয়। এ ধরনের রায় তাকে মৃত বলেই সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে কোনো অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপর কেউ আক্রমণ চালালে এবং তার ফলে সে মৃত সন্তান প্রসব করলে তাকে জীবিত গণ্য করা হবে, যদিও সে তখন মৃত।

২. মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর কার্যত জীবিত থাকা শর্ত। যেমন গর্ভজাত সন্তান। কারণ সে কার্যত জীবিত। কারণ এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, তার দেহে এখনো প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী জীবিত থাকা না থাকার বিষয়ে যদি অজানা থাকে যেমন ডুবে যাওয়া, আগুনে পোড়া ও বিধ্বস্ত ভবনের নিচে থাকা ব্যক্তি। এ ধরনের লোকেরা যদি বিধি

---

২১ আল-কুর'আন, আল-আনফাল, ৮ : ৭৫

২২ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

২৩ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১২

মোতাবেক পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়ও, তবুও তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী গণ্য হবে না, তাদের সম্পত্তি তাদের জীবিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

৩. উত্তরাধিকার কার্যকর হওয়ার পথে নিম্নোক্ত অন্তরায়গুলো না থাকা।[২৪]

উত্তরাধিকার লাভের অন্তরায়সমূহ

সে ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, যে উত্তরাধিকার লাভের সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার সেই সব যোগ্যতা কেড়ে নেয়া হয়েছে কোনো না কোন অন্তরায় থাকার কারণে। এ ধরণের অন্তরায় চরটি:

১. দাসত্ব, চাই সে পূর্ণ দাসত্ব হোক বা আংশিক।[২৫]

২. ইচ্ছাকৃত হারাম হত্যা সংঘটন, যার জন্য কিসাস অথবা কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না, কিন্তু নিজের জীবন বাঁচাবার তাগিদে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে হত্যাকারী ওয়ারিশী স্বত্ব হতে বঞ্চিত হবে না। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকে পরিভাষায় কতলে 'আমাদ বলে। এরূপ হত্যার সাথে মনোভাব বিদ্যমান থাকতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (র.) এরূপ হত্যার সংজ্ঞা অঙ্গ ছেদনকারী অস্ত্র ব্যবহারের শর্ত যুক্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ ও মুহাম্মদ (র) এর মতে হত্যা সংঘটনের ক্ষেত্রে অস্ত্রের ব্যবহার শর্ত নয়। পরিকল্পিত হত্যা, যেমন পানিতে ডুবিয়ে, আগুন নিক্ষেপ করে হত্যা করলে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার অন্তর্ভুক্ত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটানো হোক কিংবা অসাবধানতার দরুন ঘটুক, এমনকি দুর্ঘটনাক্রমে যদি ঘটে তা হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ তার ওয়ারিশ হবে না।[২৬] হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হবে না।[২৭] 'যে ব্যক্তি (নিজেদের) কাউকেও হত্যা করেছে, সে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না। হত্যাকারী ব্যতীত নিহতের আর কোন ওয়ারিশ বিদ্যমান না থাকলেও, এমনকি হত্যাকারী যদি পিতা অথবা পুত্রও হয়। হন্তার জন্য কোন মীরাস নাই।[২৮]

৩. ধর্মের পার্থক্য : কোন কাফির কোন মুসলমানের অথবা কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিশ হবে না। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

---

২৪ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রগুক্ত, পৃ. ৩১১

২৫ প্রাগুক্ত।

২৬ আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবু সাহ্ল আহমদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (করাচী : ১৯৮৭), খ.৩০, পৃ. ৪৬-৪৭

২৭ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়েয, বাব মা জাআ ফী ইবতালি মীরাসিল কাতিল, হাদীস নং ২১০৯, পৃ. ৩১; আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ্ আল- কাযবীনী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়েয, বাব মীরাসিল কাতিল, হাদীস নং ২৩৭৫

২৮ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন কুদামা, *আল-মুগনী* (আল-রিয়াদ : মাকতাব আল-রিয়াদ, ১৪০১ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৯৯

'মুসলিম ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফের ব্যক্তিও মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না'।[২৯]

৪. কোন মুসলিম দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে। মুরতাদ তার মুসলিম আত্মীয়দের ওয়ারিশ হতে পারে না। পবিত্র কুর'আনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই দোযখবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে'।[৩০] ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে মুরতাদের পূর্বাপর সমস্ত সম্পদের মালিক হবে তার মুসলিম ওয়ারিশগণ।[৩১]

মিরাসের বন্টনের ভিত্তি

মীরাস বন্টনের ভিত্তি কী হবে ? প্রয়োজন, আত্মীয়তা না অন্য কিছু ? প্রয়োজনকে যদি ভিত্তি করা হয় তবে মৃত ব্যক্তির পুত্রকন্যা, ভাইবোন, পিতামাতা ও স্ত্রী সচ্ছল হলে তারা কেউ তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন হিস্যা পাবে না, সমুদয় সম্পত্তি দীন-দ্ররিদ্রের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এ নীতি সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়। সুন্দর পরিসর ও আদর্শ সমাজ এভাবে গড়ে উঠতে পারে না। বরং যা বন্টনের জন্য এ ব্যবস্থা সে অর্থ সম্পদের উন্নয়নই যে ব্যহত হবে তাই নয়, তার অস্তিত্বও হবে বিপন্ন। পুত্রকন্যা স্বচ্ছল জীবন যাপন করবে, ভবিষ্যত বংশধর সুখে থাকবে, এটাই তো ব্যক্তির অর্থোপার্জনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। এখন উত্তরাধিকার বন্টনে যদি এই মৌল প্রেরণাকে মূল্যায়ন না করে অনাত্মীয়ের দরিদ্র ও প্রয়োজনকে মূল ভিত্তি করা হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই উপার্জন ও সঞ্চয়ের আগ্রহ বিনষ্ট ও অর্থ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে এবং ফলত আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হয়ে সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে যাবে। সংযত কারণেই এই স্বাভাববিরোধী নীতি পৃথিবীর কোনও সম্প্রদায় গ্রহণ করেনি। বরং আবহমান কাল হতে আত্মীয়তাই উত্তরাধিকার বন্টনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।[৩২]

কিন্তু আত্মীয়তার পরিসরও অতি ব্যাপক। এক আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর সন্তান হিসেবে বিশ্বের সমস্ত মানুষই তো আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা। সুতরাং সহজসাধ্য ও কল্যাণপ্রসূ বন্টনের জন্য আত্মীয়তার এক সংকুচিত পরিমণ্ডল নির্ণয় করা অপরিহার্য। ইসলামী শরি'য়ত এটা সম্পন্ন করেছে নিকট ও দূর

---

২৯ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস নং ২১০৭, পৃ.৩১; আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ্ আল- কাযবীনী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস নং ২৭৩১

৩০ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২১৭

৩১ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৪৫৫

৩২ জাওয়াহিরুল ফিকহ, খ.১, পৃ. ৪৭৬

সূত্রের বিভেদ রেখা দ্বারা, অর্থাৎ মৃতের সঙ্গে যারা নিকটাত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ কেবল তারাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এরূপ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ কেবল তারাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এরূপ আত্মীয়তা তিন প্রকার : (ক) জন্মসূত্রে আত্মীয়তা এর মধ্যে পড়ে পিত-মাতা, সন্তান, ভাইবোন, চাচা, ফুপু ইত্যাদি। খ) বিবাহ সূত্রে আত্মীয়তা, স্বামী-স্ত্রী এর অন্তর্ভুক্ত। গ) মুক্তিদানের সূত্রে দাস-মালিকের মধ্যে সম্বন্ধ।

মৃতের যেসব আত্মীয় ওয়ারিশ হয়

পূর্বেই বলা হয়েছে, উত্তরাধিকার লাভের ভিত্তি হচ্ছে মৃতের সঙ্গে নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক। এ হিসাবে যে সব আত্মীয় ওয়ারিস হয় তারা মোট পঁচিশ শ্রেণীর লোক। পনের শ্রেণীর পুরুষ এবং দশ শ্রেণীর নারী।

পুরুষ ওয়ারিসগণ হচ্ছে, ১.পুত্র, ২.পৌত্র, ৩.পিতা, ৪.দাদা, ৫.আপন ভাই, ৬.বৈমাত্রেয় ভাই, ৭. বৈপিত্রেয় চাচা, ৮.আপন ভাইয়ের পুত্র, ৯. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, ১০. আপন চাচা, ১১. বৈমাত্রেয় চাচা, ১২. আপন চাচাত ভাই, ১৩. বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই, ১৪. স্বামী, ১৫. মুক্তিদানকারী মনিব।

মহিলা ওয়ারিশগণ হচ্ছে, ১.কন্যা, ২. মাতা, ৩. পৌত্র, ৪. দাদী, ৫.নানী, ৬. আপন বোন, ৭. বৈমাত্রেয় বোন, ৮. বৈপিত্রেয় বোন, ৯. স্ত্রী, ১০. মুক্তিদানকারিনী।[৩৩]

যে সব আত্মীয় ওয়ারিস হয় না

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা না থাকায় যারা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না তারা হচ্ছে, ১. মৃতের সৎপুত্র ও কন্যা অর্থাৎ স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীর সন্তান, ২. সৎ পিতা, ৩. মৃতার সৎপুত্র ও কন্যা, ৪. সৎমা, ৫. মৃত ব্যক্তির শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গ, শ্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক, শ্যালিকা ইত্যাদি। এমনিভাবে এর বিপরীতে মৃত ব্যক্তির জামাতা ও ভগ্নিপতি, ৬. মৃত মহিলার শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গ, যথা শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, দেবর-ননদ ইত্যাদি। অনুরূপ মৃতব্যক্তির পুত্রবধূ, ভাবী ইত্যাদি, ৭ পোষ্য পুত্র ও কন্যা, ৮. ধর্ম পিতা-মাতা।[৩৪]

বংশীয় ওয়ারিশগণের শ্রেণীবিভাগ

আল-কুর'আনে মৃত ব্যক্তির তিন ধরণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী পরিচয় পাওয়া যায়।

ক. যাবিল ফুরূয

খ. আসাবাত

গ. যাবিল আরহাম

৩৩ আলী আস- সাবুনী, *আল মাওয়ারিস ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যা* (মিশর : দারুস সাবুনী, ১৯০৭), পৃ. ৪২-৪৩

৩৪ ড. মাওলানা আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক ও অন্যান্য, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ৬৭৬

ক. যাবিল ফুরূয: কুর'আন সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার দ্বারা যাদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদেকে যাবিল ফুরূয বলে। এরা সকল ওয়ারিশের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কারণ একদিকে আল্লাহ তা'য়ালা কুর'আন মজীদে তাদের অংশের উল্লেখ করেছেন এবং অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স.) এদের সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বলেছেন, 'মীরাস এর প্রাপকদের (যাবিল ফরূযদের) মধ্যে সর্বাগ্রে বন্টন কর। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটাআত্মীয় পুরুষদের মধ্যে বন্টন কর।[৩৫]

যাবিল ফুরূযের শ্রেণী বিভাগ

যাবিল ফুরূয দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :

ক. বংশগত, যেমন পিতা-মাতা, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী-সহোদর বোন, বৈপিত্রেয় ভাই, বৈমাত্রেয় বোন, দাদা-দাদী ইত্যাদি।

১) কারণগত, যেমন স্বামী-স্ত্রী। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এরা পরস্পরের আত্মীয়।[৩৬]

আল-কুর'আনে যাবিল ফুরুজের সংখ্যা বার জন বর্ণিত হয়েছে। এই বার জনের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং আটজন নারী।

খ. আসাবাত: যারা কোন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমস্তটাই লাভ করে এবং কোন অবস্থায় যাবিল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় তাদের আসাবাত বলে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

'তার (মৃত ব্যক্তির) সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ। সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ।[৩৭]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় তার পিতা-মাতা, তবে এই অবস্থায় মায়ের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতার অংশ নির্ধারণ করা হয় নেই। এতে বুঝা যায়, অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ পিতার প্রাপ্য।

আসাবাগণ ওয়ারিশ সাব্যস্ত হওয়ার দলিল আল-কুর'আনে নিম্নোক্ত আয়াত:

'কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক এবং সে (বোন মৃত) সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার ওয়ারিশ হবে'।[৩৮]

---

৩৫ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহীহ আল-মুসলিম* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), খ.২,
কিতাবুল ফারায়েয, পৃ. ৫৮

৩৬ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), খ. ১, পৃ. ৫২৭

৩৭ আল-কুর'আন,আন নিসা, ৪ : ১১

৩৮ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ১৭৬

উপরোক্ত আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, সহোদর ভাইয়ের নির্ধারিত কোন অংশ নেই। বোন নিঃসন্তান হলে সে তার সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। অতএব আসাবাগণ যে ওয়ারিশ হবে তা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। তাছাড়া পূর্বোক্ত হাদীস হতে ও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

গ. যাবিল আরহাম

মৃত ব্যক্তির সাথে যাদের নিকট সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু যাবিল ফুরূয বা আসাবো কোনটিই নয় এবং কুর'আন ও সুন্নাহ-এ যাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশও নির্ধারণ করা হয়নি তাদেরকে 'যাবিল আরহাম' বলে। যেমন ফুফু, খালা, মামা, বোনের ছেলে, কন্যার ছেলে ইত্যাদি। যাবিল আরহামের ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে,

وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

'আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর'।[৩৯] একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা -মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[৪০]

উপরোক্ত আয়াতে আত্মীয়দের মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। আর যাবিল আরহাম সর্বসম্মতিক্রমে আত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত। আবু লুবাবা (রা.) নামক সাহাবীর 'ভাগ্নে' ব্যতীত আর কোন ওয়ারিশ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে তাঁর ওয়ারিশ ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে সাহল ইব্ন হুনাইফ (রা.) নিহত হলে তার অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকায় হযরত উমর (রা.) মহানবী (স.) এর নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তাঁর মামাকে ওয়ারিশ ঘোষণা করেন, 'যার কোন ওয়ারিশ নাই মামাই তার ওয়ারিশ'।[৪১]

আল-কুর'আনে মিরাস আইনের বৈশিষ্ট্য

আল-কুর'আনে সূরা আন নিছার ৭, ১১, ১২, ও ১৭৬ নং আয়াতে উত্তরাধিকারী আইনটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই সকল আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে আল-কুর'আনে উত্তরাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাত হয় :

---

৩৯ আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৬

৪০ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ৭

৪১ মোহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

এক. উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। প্রাপ্য অংশ সমূহের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। তাই পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের ক্ষেত্রে কোন দয়া-মায়া কিংবা আবেগ অনভূতি অথবা কারো ব্যক্তিগত দারিদ্রতা ও বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদি দেখার সুযোগ নেই।

দুই. মৃত ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তিই মিরাসযোগ্য। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, **مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ** অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি কম হোক বা বেশী হোক'।[৪২] এখানে পরিত্যক্ত সম্পত্তিটি সাধারণ, তা স্থাবর না অস্থাবর তা উল্লেখ হয় নি। তাই এই দুই প্রকার সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

তিন. নারী ও পুরুষের উত্তরাধিকার স্বত্বের প্রাপ্যতা পৃথক পৃথকভাবে ঘোষিত হয়েছে। উভয়ের হক যে স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ তা অকাট্য ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।[৪৩] তাই নারীদের আন্দোলন করে কিংবা মিটিং-মিছিল করে জনমত গঠন করে উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব আইন করার প্রয়োজন নেই।

চার. মৃত পথযাত্রীদের উইল বা ওছিয়ত করার বাধ্যবাধকতা এই আইনের মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে, যাতে উভয়ের হক যে স্বতন্ত্র ও পূর্ণতা ফুটে উঠে। ত্যাজ্য সম্পত্তির বন্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয় বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হয়।

পাঁচ. নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে পূর্বের আত্মীয় বঞ্চিত হবে।

ছয়. উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল, কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোন কারণেই থাকতে পারে না।

সাত. মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকারীদের উপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্পিত হয়, এটা উত্তরাধিকারীরা অর্জন করে না।

মিরাস বন্টনে আল-কুর'আনের নীতিমালা

মিরাস বন্টন ক্ষেত্রেও অনুরূপ ইনসাফপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতে হবে। কাজেই কোন সন্তানকে মিরাস থেকে বঞ্চিত রাখা পিতার জন্য জায়েয নয়। কোন আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী আত্মীয়কে কৌশল করে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করাও সম্পূর্ণ হারাম কাজ। কেননা মিরাস আল্লাহর জারী করা বিধান ও ব্যবস্থা। তিনি জেনে তার সুবিচার নীতি ও বিজ্ঞতা অনুযায়ী নিজেই এর ব্যবস্থা রচনা করেছেন। তাতে প্রত্যেক পাওনাদারকেই তার পাওনা-অনুযায়ী অংশ দান করেছেন এবং তিনি লোকদের সেই বিধানের উপর অবিচল হয়ে থাকার ও তদনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব

৪২ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ৭

৪৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), খ.২, পৃ. ৩৫০

মিরাস বণ্টন যে লোক এ নিয়ম ও বিধান অমান্য ও লঙ্ঘন করবে, সেতো তার আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা কুর'আন মজীদের তিনটি আয়াতে মিরাস সংক্রান্ত যাবতীয় কথা বলে দিয়েছেন। প্রথম আয়াতের শেষে বলেছেন,

آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

'তোমরা জান না তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে তোমাদের অধিকত নিকটবর্তী কে? এটা আল্লাহরই অংশ বন্টন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক বিজ্ঞানী'।[৪৪]

দ্বিতীয় আয়াতটির শেষে বলেছেন,

غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

কারো কোন ক্ষতি না করেই-এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অছিয়ত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক বিজ্ঞানী। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী সদা প্রবাহমান। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। আর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে ও তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো ও লংঙ্ঘন করবে, তাকে এমন জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য লজ্জাকর, অপমানকর আজাব রয়েছে।[৪৫]

মীরাস সংক্রান্ত তৃতীয় আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্য সব কিছু স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, যেন তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। আর আল্লাহ্ তো সব বিষয়েই পূর্ণ অবহিত'।

অতএব মীরাসের যে বিধান আল্লাহ দিয়েছেন, যে লোক তার বিরোধিতা করবে, সে আল্লাহর বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া প্রকৃত সত্য থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকেও সে লঙ্ঘন করেছে। কাজেই তাকে আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আর তা হচ্ছে,

---

৪৪ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১১
৪৫ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১২, ১৪

نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

জাহান্নাম, চিরদিনই তাতে থাকবে এবং তার জন্যে আরও অপমানকর আযাব রয়েছে।[৪৬]

আল-কুর'আনে মিরাস আইনের বিধিমালা

আল-কুর'আনে সূরা আন -নিসার ৭, ১১, ১২, ও ১৭৬ নং আয়াতে মিরাস আইনের যাবতীয় বিধিমালা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মিরাস সংক্রান্ত আইনে প্রথম আয়াতটি হলো,

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা -মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ'।[৪৭]

উত্তরাধিকার আইন নাযিল হওয়ার সময়কাল

মিরাসের আইন ওহদ যুদ্ধের পর নাযিল হয় ওহদ যুদ্ধে সত্তরজন মুলমান শহীদ হয়েছিলেন। মদীনার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র জনপদে এই দুর্ঘটনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শহীদদের মীরাস বন্টন করা হবে এবং যেসব এতীম শিশু-তারা রেখে গিয়েছিলেন তাদের অধিকার কিভাবে হবে এসব কারণে মীরাসের আইন নাযিল হয়।[৪৮]

সূরা আন-নিসায় বর্ণিত সাত নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা

জাহেলিয়াতের যুগে কোন ব্যক্তির যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনমূলক কাজে সে কতটুকু সক্ষম সে দৃষ্টিভঙ্গিতে তার উত্তরাধিকারের হিস্যা নির্ধারিত হতো। এ হিসাবে সাধারণত নারী ও শিশুদেরকে যৎসামান্য উত্তরাধিকার দেয়া হতো। কখনো কখনো তাদের অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা হতো।[৪৯] আলোচ্য আয়াতে জাহেলি যুগের এই ঘৃণ্য প্রথার অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এই আয়াতে দুটি আইনগত নির্দেশ জারী করা হয়েছে। মীরাস কেবল পুরুষের প্রাপ্য নয়, নারীও এর হকদার হবে। মীরাস অবশ্যই বন্টন করতে হবে, এর পরিমাণ যতই কম হোক না কেন। এমনকি মৃত ব্যক্তির এক গজ কাপড় রেখে গেলেও এবং তার দশজন উত্তরাধিকারী থাকলেও একে দশখণ্ডে বিভক্ত করতে হবে কিংবা উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে একে অপরের অংশ কিনে নিতে পারবে।

---

৪৬ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ৩০৬-৩০৮

৪৭ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ৭

৪৮ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কোরআন* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাক খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯), খ.২, পৃ.৮৪

৪৯ সাইয়েদ কতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৮

যেমন শেয়ার, বীমা, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ঋণপত্র ডিবেঞ্চার, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি যে কোন আকারে প্রকারেই থাকুক না কেন তা অবশ্যই বন্টন করে দিতে হবে।[৫০] আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে মিরাসের সম্পত্তি অবন্টিত রাখা সম্পূর্ণ হারাম ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

মিরাস আইন সকল প্রকার ধন-সম্পত্তির উপর-স্থাবর-অস্থাবর,কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত কিংবা অন্য যে কোন প্রকার হোক না কেন কার্যকর হবে। [৫১]

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে نَصِيبًا مَّفْرُوضًا অর্থাৎ যে অংশ আল-কুর'আন নির্দিষ্ট করেছে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে ফরজ বা নির্ধারিত। এই আয়াতটি উত্তরাধিকার আইনের প্রস্তাবনা (Preamble) বিশেষ । কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেন, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ এই আয়াতের পরে يُوصِيكُمُ اللّٰهُ শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।[৫২]

পরবর্তীতে উক্ত সূরার ১১ নং ও ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকার নীতিমালা ঘোষণা করে উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ মহান আল্লাহ সুনির্দিষ্ট করে দেন। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ সুর্নিদিষ্টকরণ ও সুচিহ্নিত হওয়ায় এখন এই প্রাপ্য অংশ হতে আর কম-বেশী করার সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা অত্র সূরায় আরো ঘোষণা করেন,

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

'এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু সম্পত্তি রেখে যায়, আমি এর প্রতিটি হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি'।[৫৩] এক্ষেত্রে সম্পত্তির সকল পরিমাণই গুরুত্ববহ। উত্তরাধিকারের এই অংশসমূহ যথাপাত্রে প্রদান করা ফরয। এই নির্ধারণ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। এখানে 'মাফরূদা' এর উদ্দেশ্য অংশীদারের বিমুখতা অথবা অনিচ্ছা তার মালিকানাকে রহিত করে না।[৫৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেন, ঐ নির্ধারিত অংশেও উত্তরাধিকারের এ আহবান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে ফরয করা হয়েছে। কোন আশায় বা ভয়ে এতে কম-বেশি করার কোন স্থান নেই, না কাউকে বঞ্চিত করা যাবে, না কাউকে বেশী দেয়া যাবে।[৫৫]

মিরাস সংক্রান্ত আইনের দ্বিতীয় আয়াতটি হল,

৫০ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৯৪
৫১ প্রাগুক্ত।
৫২ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.), *তাফসীরে মাযহারী* (অনু.মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন, নারায়নগঞ্জ : হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ২০১৪), খ.২, পৃ. ৪৪৯
৫৩ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৩৩
৫৪ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.), প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৪৮
৫৫ ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩০৫

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এসবই সে যা অছিয়ত করে তা দেয়ার পর ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা অবগত নও। এটি আল্লাহর বিধান,আল্লাহ,সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৫৬]

আয়াতটির শানে নযূল

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে রাবী' (রা.) এর স্ত্রী সা'দ এর দুই মেয়ে সাথে নিয়ে নবী করীম (স.)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এ দু'টি সা'দ-এর মেয়ে, যিনি আপনার সাথে (যুদ্ধ শরীক হয়ে) উহুদের দিন শহীদ হয়েছেন। আর এদের পিতা যা কিছু রেখে গেছেন, তার সবটিই এদের চাচা নিয়ে গেছে। আর মেয়ে লোকের তো সম্পদ না হলে বিয়ে হয় না। আল্লাহর রাসূল (সা.) চুপ করে রইলেন। অবশেষে মীরাছের আয়াত নাযিল হল। তখন আল্লাহর রাসূল (স.) সা'দ ইবনে রাবী-এর ভাইকে ডাকলেন এবং বললেন, সা'দ-এর কণ্যাদ্বয়কে তার সম্পদের দুই- তৃতীয়াংশ দিয়ে দাও এবং স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ দাও। আর তুমি নাও অবশিষ্ট যা থাকে।[৫৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের আহকাম অবতীর্ণ হলে কতগুলো লোক রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলে, 'হে আল্লাহ রাসূল (সা.)! আপনি কন্যাকে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধেক দিচ্ছেন অথচ সে না ঘোড়ার উপর বসার যোগ্যতা রাখে, না সে শক্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। আপনি শিশুকেও উত্তরাধিকারীরূপে সাব্যস্ত করেছেন, তার দ্বারা কি উপকার পাওয়া যেতে পারে ?[৫৮] এই বর্ণনা হতে জানা গেল যে, ইসলাম পূর্ব যুগের মীরাস শুধু তাদেরকেই প্রদান করত যারা সেই যুগে যুদ্ধের যোগ্য ছিল। আবার জ্যোষ্ঠপুত্রকে একমাত্র উত্তরাধিকার

---

৫৬ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ১১

৫৭ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ্ আল- কাযবীনী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়িয, পৃ. ৫৩১, হাদীস নং ২৭২০; ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়িয, হাদীস নং ২৮৮২

৫৮ ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩০০

প্রাদান করার রীতি তখন প্রচলিত ছিল। বস্তুত অন্ধকার যুগে মৃত আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের মেয়েদের কোন অধিকার ছিলনা।[৫৯]

প্রথমে বলা হয়েছে,

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের অছিয়ত করেন তোমাদের সন্তানাদি সম্পর্কে, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান'। এই আয়াত পুত্র কন্যা, যে কন্যা পূর্বে কখনো ওয়ারিছ ছিল না, উভয়কে ওয়ারিস করেছে এবং প্রত্যেকের অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছে। মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যা থাকলে ওয়ারিছরূপে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ হকদার। তারপরে বলা হয়েছে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি দুইজনের অধিক কন্যা হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ শব্দদ্বয় দ্বারা দুই-এর অধিক নারী বুঝায়। প্রায় সকল ফকীহ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, দুই কন্যার বেলায় অনুরূপ বিধান কার্যকরী। কোন ব্যক্তি যদি একটি পুত্র সন্তানও মৃত্যুকালে রেখে না যায় এবং তার সন্তানদের মধ্যে শুধু মেয়েরাই থাকে, তবে মেয়েদের সংখ্যা দুই হোক কি তার অধিক, সব অবস্থায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

এর পর বলা হয়েছে যে, একজন কন্যা হলে সে মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতামাতা ষষ্ঠাংশ পাবে প্রত্যেকে, আর নিঃসন্তান হলে মা পাবে তিন ভাগের একভাগ। আর ভাই-বোন থাকলে মায়ের অংশ হয়ে যাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।

এই আয়াত থেকে আমরা কন্যা ও পিতা-মাতার নির্ধারিত অংশ বুঝতে পারি। মৃত ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র একটি কন্যা রেখে যায়, তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে, আর একাধিক রেখে গেলে দুই-তৃতীয়াংশ বেশি পাবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, لايزاد حق البنات على الثلثين কন্যাদের অংশ দুই তৃতীয়াংশের বেশি বর্ধিত করা যাবে না। নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে কন্যার সঙ্গে ভগ্নী আসাবা হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) এর নিকট এই জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন,

لاقضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم للا بنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت

'এই ব্যাপারে মহানবি (স.) যেরূপ ফয়সালা করেছেন আমিও তদ্রুপ ফয়সালা করব। কন্যার জন্য অর্ধেক এবং পৌত্রীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। অবশিষ্ট যা থাকবে তা ভগ্নী পাবে'।[৬০] মিরাস বন্টনের এক নীতি হলো الاقرب يسقط الابعد' নিকটবর্তী আত্মীয় দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে'।

---

৫৯ প্রাগুক্ত।

৬০ *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ফারাইদ, বাব মীরাসিল আখাওয়াতি মা'আল বানাতি আসাবাতুন।

মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার উত্তরাধিকারীত্বের ব্যাপারে তিনটি অবস্থা বর্তমান:

এক. পিতা-মাতা উভয়ই জীবিত এবং সন্তানাদিও আছে। এ অবস্থায় পিতা-মাতা প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ওয়ারিছ সন্তান ও স্ত্রী অথবা স্বামী পাবে। কোন কোন অবস্থায় কিছু অবশিষ্টাংশ পিতা পায়।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ভাইবোন এবং স্বামী স্ত্রী কিছুই নেই, শুধু পিতামাতা আছে, এমতাবস্থায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগ মাতা এবং অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবে। স্বামী অথবা স্ত্রী বর্তমান থাকলে প্রথমে তারাই তাদের প্রাপ্য অংশ নিবে। তারপর অন্যেরা পাবে।

তৃতীয় অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি নেই কিন্তু ভাই-বোন আছে। এ অবস্থায় মাতা ছয় ভাগের একভাগ পাবে। অন্য কোন ওয়ারিছ না থাকলে পিতা সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

পিতা-মাতা শুধু অছিয়ত হিসেবে কিছু লাভ করত। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এই প্রথাকে রহিত করে দিয়েছেন এবং পিতা-মাতার জন্য মীরাসী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তাদের অংশ সুর্নিধারণ ও অখন্ডনীয় করেছেন। এই ব্যবস্থার যুক্তিকতাগুলো ধরে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা জান না, তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রদের মধ্যে ফায়দা ও উপকারের দিক দিয়ে তোমাদের অধিকতর নিকটবর্তী কে? এটা স্বয়ং আল্লাহরই অংশ বন্টন ও হিসসা নির্ধারণ। আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও সর্বাধিক বিজ্ঞানী'।[৬১] অর্থাৎ 'পিতার দ্বারা তোমাদের বেশী উপকার সাধিত হবে কি পুত্রের দ্বারা হবে তা তোমাদের জানা নাই। উভয় হতেই উপকারের আশা রয়েছে। পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশী উপকার লাভের সম্ভাবনা রয়েছে আবার পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারা বেশী উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এই উপকারের মধ্যে পিতা-মাতার social security বা বৃদ্ধকালের সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিবিধান করা হয়েছে।

মিরাস সংক্রান্ত আইনের তৃতীয় আয়াতটি হল,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এটা তারা যা অছিয়ত করে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের

৬১ ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩০৪

পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ, এসব তোমরা যা অছিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর এমন মৃত ব্যক্তি- পুরুষ হোক বা নারী, যার ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) অন্য ব্যক্তি হবে-মূল ও শাখাবিহীন হয় এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই অথবা ভগ্নী থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশের, এটি যা অছিয়ত করা হয় তা দেয়ার পর, ঋণ পরিশোধের পর, যদি এটি কারও জন্য হানিকর না হয়। এটি আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল'।[৬২]

এই আয়াতে স্বামী ও স্ত্রীর অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে তবে স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক, পুত্র কি কন্যা, এই স্বামীর ঔরসজাত কিংবা পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত, তবে স্বামী এক-চতুর্থাংশ পাবে। স্বামীর অংশ বন্টনের এটাই হচ্ছে নিয়ম। যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে তবে স্ত্রী পাবে এক-চতুর্থাংশ। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত কিংবা অন্য স্ত্রীর, সেক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে এক-অষ্টমাংশ। স্ত্রী একাধিক হলেও স্ত্রীর অংশ সকলের মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে।

কালালার মিরাস প্রাপ্তির বিধান

উপরোক্ত আয়াতে কালালার বিধান স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে। কালালার মিরাস প্রাপ্তির বিধান বর্ণনার পূর্বে কালালার সংজ্ঞা জানা অত্যাবশ্যক। কালালার সংজ্ঞা আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

'আল্লাহ স্বয়ং কালালার ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন যে, কেউ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে'।[৬৩] কালালা শব্দটি ইকলি শব্দ হতে বের করা হয়েছে, ইকলিল ঐ মুকুট ইত্যাদিকে বলা হয় যা মস্তককে চতুর্দিক হতে ঘিরে নেয়। এখানে এর অর্থ এই যে, তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে চারপাশের লোক। তার আসল ও ফাও ফরা অর্থাৎ মূল ও শাখা নেই।[৬৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর সর্বশেষ যুগ আমি পেয়েছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি 'কথা ওটাই যা আমি বলেছি', সঠিক কথা এই যে, কালালা তাকেই বলা হয় যার পিতা ও পুত্র নেই।[৬৫] এরপর এই আয়াতে ভাই-বোনের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। ইজমার মাধমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এখানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের কথা বলা হয়েছে। যদি কোন কালালার এক ভাই এবং এক বোনকে

---

৬২ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ১২
৬৩ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১৭৬
৬৪ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩০৭
৬৫ প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩০৭

রেখে মারা যায়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে ছয়ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি অধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশের হকদার হবে।[৬৬]

মিরাস সংক্রান্ত আইনের চতুর্থ এবং সর্বশেষ আয়াতটি হল,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم

‘লোকে তোমার নিকট পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন, কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নী থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ। এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই ভগ্নী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এই আশঙ্কায় আল্লাহ তোমদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষে অবহিত’।[৬৭]

আয়াতটির শানে নুযূল

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। আবু বকর (রা.) ও তার সঙ্গে আমাকে দেখতে আসেন। তাঁরা উভয়ে পায়ে হেঁটে আসেন। রাসূলুল্লাহ (স.) অযূ করলেন এবং অযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। আমার হুশ ফিরে এলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে আমি কি করব? তিনি আমার এ কথার কোন জবাব দিলেন না। (অধঃস্তন রাবী বলেন) তার নয়টি বোন ছিল। অবশেষে মিরাস সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হল, ‘লোকেরা তোমার নিকট জানতে চায়। বল! আল্লাহ তোমাদেরকে কালালা সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন... (সূরা আন-নিছা ৪: ১৭৬), জাবির (রা.) বলেন, আমার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।[৬৮]

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এমন ব্যক্তি যার পিতামাতা ও সন্তানাদি নেই, আছে শুধু একজন সহোদরা ও বৈমাত্রেয়রা, যদি তিনি মারা যান তবে উক্ত বোন তার পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদের অর্ধাংশ পাবে। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তি তার সন্তানহীনা এবং পিতৃমাতৃহীনা বোনের সমুদয় সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। আর ঐ ব্যক্তি যদি দুই বা ততোধিক বোন রেখে মারা যান তবে তারা তার সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-

৬৬ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.২ পৃ. ৩৬৯
৬৭ আল-কুর’আন, আন-নিসা, ৪ : ১৭৬
৬৮ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল, ফারায়েয, হাদীস নং ২০৪০

তৃতীয়াংশ পাবে। এ যাবত যে সমস্ত আয়াতপুঞ্জ আলোচিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে বলা হয়েছে যে, মিরাস বন্টিত হবে মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত বা উইল কার্যকরী করার পর। অর্থাৎ ওসিয়ত সিদ্ধ করার পর। বস্তুত আল-কুর'আনে বর্ণিত মিরাস আইন একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন হিসেবে আধুনিক বিজ্ঞানে তার স্থান করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম জোনস্ বলেন, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যে কোন প্রশ্ন উঠুক না কেন, এক নজরে এবং শুদ্ধভাবে ইসলামী আইন তার জবাব দিয়ে দিবে। আল-কুর'আন মানুষের জীবন ও মৃত্যুকে সমান গুরুত্ব দেয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি মানুষের যবনিকাপাত ঘটলেও পশ্চাতে সে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে যায় স্থাবর ও অস্থাবর নানারকম মূল্যবান সম্পত্তি। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন, ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে এই সভ্য সমাজে যুগে যুগে দেখা দিয়েছে মতবিরোধ, বাদানুবাদ এমনকি মরামারি, কাটাকাটি ও হত্যাকাণ্ড। তাই আল-কুর'আন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন, ভাগ-বাটোয়ারা সুনির্দিষ্টভাবে নিরুপণ করে এতদসংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক নিখুঁত নীতিমালা প্রণয়ন করে উত্তরাধিকার আইনকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অছিয়ত আইন

ইসলামী শরি'য়তে অছিয়ত আইন উত্তরাধিকার আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ উভয় প্রকার আইনই কার্যকর হয় একজন পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর পর। কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার সম্পত্তি বা এর আয় তার মৃত্যুর পর হতে চিরকালের জন্য অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই হস্তান্তর করাকে 'অছিয়ত' বলে।[৬৯] ইসলামের প্রথমিক যুগে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করা ওয়াজিব বা বধ্যতামূলক ছিল। সূরা আল-বাকারার ১৮০ নং আয়াতে অছিয়তের বাধ্যবাধকতার বিধান সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সূরা আন-নিছায় বর্ণিত উত্তরাধিকারের সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর অছিয়ত করার বাধ্যবাধকতার বিধান রহিত হয়ে যায়। বর্তমান আইনে অছিয়ত করার বিধান একটি মুস্তাহাব বা নফল দায়িত্ব হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে কোন ব্যক্তি অছিয়ত করে মারা গেলে অবশ্যই উত্তরাধিকারীদের ওপর উক্ত অছিয়ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। তবে এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক অংশের উপর অছিয়ত কার্যকরী হবে।

অছিয়তের সংজ্ঞা

অছিয়ত শব্দের অর্থ ভার অর্পণ, নির্দেশ উপদেশ, মিলানো, অর্থাৎ কোন বস্তু অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছানো। পারিভাষিক অর্থে শেষ ইচ্ছা বা ইচ্ছা পত্রযোগে প্রদত্ত সম্পত্তি।[৭০] মৃত্যুকালে নিজ মালিকানার কিছু অংশ নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দান করার নাম 'অছিয়ত'।[৭১]

অছিয়তের উপাদান

অছিয়তের উপাদান চারটি যথা ক) মূসী, খ) মূসা বিহি, গ) মূসা লাহু, ঘ) ওসী।

অছিয়তকারীকে মূসী 'অছিয়তকৃত বস্তুকে 'মূসা বিহি' বলে। যার অনুকূলে অছিয়ত করা হয় তাকে 'মূসা লাহু' এবং অছিয়তকারী অছিয়তকৃত সম্পত্তি পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে যাকে নিযুক্ত করেন তাকে 'ওসী' বলে।[৭২]

---

৬৯ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৯১
৭০ আবুল কাশেম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ রাগেব ইস্ফাহানি, আল-*মুফরাদাত ফি গারিবিল কুর'আন* (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি), পৃ. ২৫২
৭১ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত,খ.৩, পৃ. ৩০২
৭২ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, খ.১ পৃ. ৫৯১

অছিয়ত অনুষ্ঠান

অছিয়ত যেহেতু একটি চুক্তি, তাই এটা ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সমর্থন) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট শব্দ নাই, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজের সম্পত্তি বা এর আয়ের মালিক বানানো প্রকাশক শব্দে ইজাব হতে পারে। যেমন, আমি তোমাদের অনুকূলে আমার অমুক সম্পদের এক -তৃতীয়াংশের অছিয়ত করলাম।[৭৩]

অছিয়তের অনুকূলে সাক্ষ্য

মতবিরোধের ক্ষেত্রে অছিয়ত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন। দুইজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির অনুকূলে এই জিনিসের অছিয়ত করে গিয়েছে এবং মূসা লাহুও এর দাবি করে, তবে অছিয়ত প্রমাণিত হবে।[৭৪] অছিয়তের অনুকূলে সাক্ষী রাখার জন্য কুর'আনে নির্দেশ রয়েছে,

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ

'হে ঈমানদাগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন অছিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হলে (এবং মুসলিম সাক্ষী না পাওয়া গেলে) তোমাদের ব্যতীত অন্য (ধর্মের) লোকদের মধ্য হতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করবে।[৭৫]

অছিয়তনামার সত্যতা সাব্যস্ত হলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সাক্ষ্যই হল এর প্রমাণ। এজন্য দুইজন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন বালেগ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতে অছিয়ত সম্পাদিত হওয়া উচিৎ। সফররত অবস্থায় অছিয়ত করলে এবং মুসলিম সাক্ষী না পাওয়া গেলে এর অনুকূলে অমুসলিমগণকে সাক্ষী রাখা বৈধ।[৭৬]

অছিয়ত করা বাধ্যতামূলক নয়, বরং ঐচ্ছিক ও উত্তম (মুসতাহাব)। ফকীহগণ কুর'আন, হাদীস ও উম্মাতের ইজমার ভিত্তিতে অছিয়তের কাল্যাণের দিকটি বিবেচনা করাকে মুসতাহাব বলোছেন।[৭৭]

---

৭৩ ইমাম আলাউদ্দিন আবু বক্র ইব্‌ন মাসঊদ আল–কাসানী আল-হানাফী, *বাদাইউস সানাঈ ফী তারতীবিশ শারাই* (বৈরুত: ১৪০২/১৯৮২), খ.৭, পৃ. ৩৩১-৩৩২

৭৪ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪

৭৫ আল-কুর'আন, আল- মায়েদা, ৫ : ১০৬

৭৬ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪

৭৭ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪

আল-কুর'আনে অছিয়তের বিধানের ক্রমবিবর্তন

ইসলামের প্রথমিক যুগে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক ছিল। সূরা আল-বাকারার ১৮০ নং আয়াতে অছিয়তের বাধ্যবাধকতার বিধান সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সূরা আন-নিছায় বর্ণিত উত্তরাধিকারের সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর অছিয়ত করার বাধ্যবাধকতার বিধান রহিত হয়ে যায়। সূরা আল-বাকারার ১৮০ নং আয়াতটি হল,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

'তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। খোদাভীরুদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৭৮]

এ আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়) যে অছিয়ত ফরয করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ রয়েছে:

এক. মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির অছিয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

দুই. এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য অছিয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয।

তিন. এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি অছিয়ত করা জায়েয নয়।

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে 'মিরাস'-এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। ইব্ন কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে অছিয়ত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মিরাস-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। মীরাস সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

'পিতা- মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা -মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[৭৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মিরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য অছিয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মিরাস নির্ধারিত হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য

---

৭৮ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ১৮০
৭৯ আল-কুর'আন,আন নিসা, ৪ : ৭

যেসব আত্মীয়ের অংশ মিরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অছিয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। তবে ফকীহগণ সর্বসম্মতে অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মিরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অছিয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরজ বা জরুরী নয়। সে ফরজ রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন বিশেষে অছিয়ত করার বিধান মুস্তাহাব বা উত্তম কার্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[৮০]কতখানি সম্পত্তি উইল করা যায় এ সম্পর্কে আল-কুর'আন নীরব। মিশকাতের একটি হাদিসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এক সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করার অনুমতি দিয়েছেন। আপন ওয়ারিশকে এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক ওছিয়ত করা কিংবা কোন ওয়ারিশের ওছিয়ত করাই হলো ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত।[৮১]

অছিয়ত ফরজ হওয়া প্রসঙ্গে আল-হাদীস

অছিয়ত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কুর'আন মিরাস সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশ মাধ্যমেও রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্জের বিখ্যাত খোতবায় রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছিলেন, 'আল্লাহ, তা'য়ালা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয়'।[৮২]

একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছে, 'কোন ওয়ারিসের জন্য যে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্য ওয়ারিসগণ অনুমতি না দেয়।[৮৩]

হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'য়ালাই যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারিসের হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর অছিয়ত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্য ওয়ারিসগণ অছিয়ত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওয়ারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন অছিয়ত করা যায়েয হবে।

ইমাম জাস্সাস বলেন, এ হাদীসটি বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং উম্মতের ফকীহ্গণ সর্বসম্মতিক্রমে এটি গ্রহণ করেছেন। ফলে এটি 'মুতাওয়াতের' বা বহুল বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, যে হাদীস দ্বারা কুর'আন আয়াতের হুকুম রহিত করাও জায়েয।

ইমাম কুরতুবী বলেন, উম্মতের আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত রসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস, যথা, মুতাওয়াতের ও মশহুর বর্ণনা, কুর'আনেরই সমপর্যায়ের। কেননা

৮০ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), খ.১, পৃ. ৪৮৯

৮১ খাযাইনুল ইরফান, পৃ. ১৫৮

৮২ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল অছিয়ত, হাদীস নং ২০৬৭

৮৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৮৯

সেটিও আল্লাহ্ তা'য়ালারই ফরমান। এ ধরনের হাদীস দ্বারা কুর'আনের কোন নির্দেশ রহিত হওয়াতে কোন দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই।[৮৪]

অছিয়তের বিধান

অছিয়তের বিধান কুর'আন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুর'আনে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের নীতিতে বলা হয়েছে যে,

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

'মৃত্যুর পূর্বে সে যে অছিয়ত করে গেছে এবং তার ঋণ আদায় করার পরে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে'।[৮৫] 'তালহা ইবন মুসাররিফ (র.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মহানবী (স.) কি অছিয়ত করেছিলেন ? তিনি বললেন, না। অথবা তাদেরকে অছিয়তের আদেশ দেওয়া হল। তিনি বলেন, মহানবী (স.) আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে অছিয়তের বিধান দিয়েছেন।[৮৬]

ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ নয়

সূরা আন-নিসায় উত্তরাধিকার আইনের বিধান নাযিল হওয়ার পর বর্তমানে কোন উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়ত করা হারাম। এ প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক হাদীসে উদ্ধৃতি রয়েছে।

হযরত আবু উমামা আল-বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, বরকতময় ও প্রাচুর্যময় আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক হকদারের হক (নির্দিষ্ট করে) দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ নয়। সন্তান বৈধ বিছানার (মালিকের) আর ধর্ষণকারীর জন্য রয়েছে পাথর। তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহর জিম্মায়।[৮৭]

হযরত আমর ইবনে খারিজ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) তার উষ্ট্রীর পিঠে বসা অবস্থায় ভাষণ দেন। আমি এর ঘাড়ের নিচে দাঁড়ানো ছিলাম। উষ্ট্রী জাবর কাটছিল এবং এর লালা আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়ত করা বৈধ নয়। সন্তান বৈধ বিছানার (মালিকের) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।[৮৮] আল-কুর'আনে সূরা আন-নিসায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

---

৮৪ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৮৯

৮৫ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ১১

৮৬ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল- বোখারী (র.) *সহীহ বোখারী* (কলকাতা : দার আল-ইশায়াদ ইসলামীয়া, তা.বি), কিতাবুল ওসায়া, হাদীস নং ২৫৩৮

৮৭ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল অছিয়ত, হাদীস নং ২০৬৭

৮৮ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৬৮

'এটি যা অছিয়ত করা হয় তা দেয়ার পর, ঋণ পরিশোধের পর, যদি এটি কারও জন্য হানিকর না হয়। এটি আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।'[৮৯]

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল, মৃত ব্যক্তির জন্য ওছিয়ত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিশদের কে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয়। ওছিয়ত করা কিংবা নিজের জিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকারকারীর মধ্যে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গুনাহ।[৯০] যে ওছিয়ত ওয়ারিশদের ক্ষতিসাধন করে সে ওছিয়ত হারাম। ওছিয়তে লক্ষ রাখতে হবে,

১. যেন সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশের উপর ওছিয়ত করা হয়।
২. সন্তান, স্ত্রী তথা ওয়ারিশানদের জন্য ওছিয়ত করা না হয়।
৩. ভিত্তিহীন ঋণ যেন প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে এ ব্যাপারে শরি'য়ত অতিক্রম করার চেষ্টা যেন না থাকে।[৯১]

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অছিয়ত সম্পর্কে বিধান

ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অছিয়ত করা বৈধ। এমন কি উত্তরাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তি অছিয়ত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য।[৯২] কোন ব্যক্তি যে কোন গর-ওয়ারিশকে (যে ব্যক্তি প্রকৃত উত্তরাধিকারী নয়) তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করতে পারেন। তবে তিনি উত্তরাধিকারীকে উইলক্রমে কোন সম্পত্তি দিতে পারেন না। তিনি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ মাত্র তার ওয়ারিশকে উইল করে দিতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে অন্য ওয়ারিশের সম্মতি লাগবে।

মূলত যে কোন সুস্থমনা, বালেগ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি গর-ওয়ারিশের বরাবরে উইল বা অছিয়ত করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তার মৃত্যুর পর অন্য ওয়ারিশদের সম্মতি লাগবে না। উইলের জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। লিখন, বাক্য কিংবা ইঙ্গিত দ্বারা উইল করা যায়। যে কোন ব্যক্তি উইল গ্রহণ করতে পারে। যে কোন প্রতিষ্ঠান উইল গ্রহণ করতে পারে।

উইলগ্রহীতা অমুসলিম বা বিধর্মী হলেও উইলকৃত সম্পত্তি গ্রহণে তার কোন বাধা নেই। উইলদাতা উইল প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে, সুস্থ অবস্থায় কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী শয্যাশায়ী অবস্থায় উইলদাতা উইল প্রত্যাহার করতে পারে। উইলের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা যায়। এক-তৃতীয়াংশের সম্পত্তি উইল করা হলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ সম্মতি দিয়ে উইলকে কার্যকরী করতে পারে।

৮৯ আল-কুর'আন, আন নিসা, ৪ : ১২
৯০ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৭১
৯১ আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৭৭
৯২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৯০

পঞ্চম অধ্যায়

দাস প্রথা ও দত্তক প্রথা সম্পর্কিত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : দাস প্রথা আইন

◊ দাস প্রথার পরিচিতি

◊ বিভিন্ন যুগে দাস প্রথা

◊ দাস প্রথা উচ্ছেদে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ

◊ আল-কুর'আনে ক্রীতদাস মুক্ত করার উপায়সমূহ

◊ আল-হাদীসে ক্রীতদাস মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

◊ দাস প্রথা সম্পর্কে অমুসলিম লেখকগণের সমালোচনা ও জবাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: দত্তক প্রথা আইন

◊ প্রাক-ইসলামী যুগে দত্তক প্রথা

◊ আল-কুর'আনে দত্তক প্রথার বিধান

◊ দত্তক প্রথা রহিতকরণে আল-কুর'আনের প্রায়োগিক নির্দেশনা

◊ **দত্তক প্রথা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি অমুসলিম লেখকদের মনগড়া উক্তি ও এর জবাব**

পঞ্চম অধ্যায়

দাস প্রথা ও দত্তক প্রথা সম্পর্কিত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাস প্রথা আইন

দাস প্রথার ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। মানব জাতির ইতিহাসে এমন কোন দেশ বা জাতি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে দাস প্রথা ছিল না। ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব বিস্তারকে কেন্দ্র করে একদল স্বাধীন মানুষ অপর দল স্বাধীন মানুষকে দাস বানিয়েছে। দাসদের উপর অমানবিক অত্যাচারের উপত্যকা প্রতিষ্ঠা করেছে। কখনো দাসদের অঙ্গহানী, কখনো লৌহ শিকল দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ কখনোবা শুলিতে চড়িয়ে মৃত্যু- এই ছিল ভাগ্যাহত দাসদের করুণ পরিণতি। যুগে যুগে ক্রীতদাস প্রথা নানারূপে আবির্ভূত হয়ে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত তা চলে এসেছে। সাম্প্রতিক কালে মানব পাচারের ছদ্মাবরণে দাসপ্রথার বিভৎসরূপ এই উপমহাদেশে নতুন আঙ্গিকে দেখা যায়। কিন্তু এটি খুবই পরিতাপের বিষয় যে, ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান সমাজ যুগ যুগ ধরে সযত্নে দাসপ্রথা লালন করছে। কার্যকর দাসপ্রথা উচ্ছেদে তাদের কোন ভূমিকা দৃষ্টিতে পড়ে না। পক্ষান্তরে ইসলাম দাসপ্রথার মূলোৎপাটনে শুধু যুগান্তকরী ব্যবস্থাপত্রই প্রণয়ন করেনি বরং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করেছে।

দাস প্রথার পরিচিতি

দাস প্রথা হলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে আধিপত্য-বশ্যতা (domination-subordination) সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে উদ্ভূত একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সম্পর্কের মাত্রা বেশ বিস্তৃত। এর একদিকে রয়েছে প্রভুর হাতে দাসের জীবন-মরণের অধিকার। অন্যদিকে রয়েছে সুচিন্তিতভাবে প্রণীত পারস্পারিক দায়-দায়িত্বের আইনগত বিধান। কিন্তু এসবের মূল উপাদানটি হলো আপন স্বার্থোপযোগী কাজে দাসকে বাধ্য করার প্রতি প্রভুর অধিকার।[১]

'Oxford English Dictionary' তে দাস প্রথার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'In a slave, a servent completely divested of freedom and personal right'.[২]

অর্থাৎ দাস প্রথায় একজন দাস সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার শূন্য।

---

১ ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ.৩৮৫

২ A.E.P.Cowie, *Oxford Advenced Learners Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1989), p. 205

বিভিন্ন যুগে দাস প্রথা

দাস প্রথা একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য মানবেতিহাসে শিকার, সংগ্রহ বা পশুপালন পর্বে এর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। এর কারণ হলো একটি বিশেষ মাত্রার জটিল কৃষি ব্যবস্থা ব্যতীত দাস প্রথা লাভজনক হয় না। প্রচীন সভ্যতার প্রায় সর্বত্রই দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'the practice of slavery is co-eval with human existence. Historically, its traces are visible in every age and every nation.'[৩]

অর্থাৎ দাসত্বের অনুশীলন মানুষের অস্তিত্বের সাথে সহ-প্রত্যক্ষ। ঐতিহাসিকভাবে তার চিহ্ন প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে দৃশ্যমান।

গ্রীস সমাজে দাসপ্রথার স্বরূপ

ক্রীতদাস প্রথা ছিল গ্রীস অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন। উৎপাদন ক্রীতদাসের শ্রমের উপর নির্ভরশীল। ক্রীতদাসের উপর গ্রীসের অতি-নির্ভরতা প্লেটো ও এরিস্টলের চিন্তাধারার উপর ছাপ ফেলেছিল। প্লেটো ক্রীতদাস প্রথাকে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪] এথেন্সে কায়িক শ্রম দান করত ক্রীতদাসরা। যুদ্ধ বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হতো। ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য সশস্ত্র হামলা চালানোর ঘটনা বিরল ছিল না। গ্রীসরা ক্রীতদাসকে নিছক পণ্য গণ্য করতো। ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয় করার জন্য সেখানে অনেক বাজার ছিল।[৫] তৎকালীন এথেন্সে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী সেখানে নাগরিক ছিল ২১০০০, মেটিক (বৈদেশিক বাসিন্দা) ১০,০০০, ক্রীতদাস চার লক্ষ। করিন্থে দাস ছিল ৬০,০০০, এজিনায় ৪৭,০০০। এটিকায় স্বাধীন লোক ছিল ৬৭০০০ ও মেটিক নাগরিক ছিল ৪০০০০, কাজেই অনুপাত ৩:১।[৬]

রোমান সমাজে দাস প্রথার স্বরূপ

ক্রীতদাস ব্যবস্থা রোমে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে ক্রীতদাস ছিল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। কি শহরে, কি গ্রামে, কি গৃহস্থালীর কাজে, কল-কারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং সরকারি পূর্তকর্মে ক্রীতদাসগণ ছিল প্রধান শ্রমদাতা। ধনী শ্রেণীর

---

৩ Syed Ameer Ali, *The spirit of Islam* (London : Christophers,1955) , p. 259
৪ মাহমুদা ইসলাম, *সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকা* (ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৭৭), পৃ. ৯১
৫ প্রাগুক্ত।
৬ ড. এম আবদুল কাদের, 'দাসত্ব প্রথা ও ইসলাম' *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ. ১৬৫

মনোরঞ্জনের জন্য ক্রীতদাস ব্যবহৃত হতো, এমনকি বিকলাঙ্গ ক্রীতদাসের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ধনীদের আনন্দ উৎপাদন করতো।[৭]

মধ্যযুগে সমাজে দাস প্রথার স্বরূপ

ইউরোপের বিভিন্ন অংশে সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিমা জগতে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস প্রথার পক্ষে ধর্মীয় যুক্তির পরিবর্তে দাসের জৈবিক নিকৃষ্টতার যুক্তি প্রদর্শিত হতে থাকে। দাসপ্রথার দুটি প্রধান ধরন লক্ষ্য করা যায়, যেমন বাণিজ্যিক ও গার্হস্থ্য। বাণিজ্যিক দাস প্রথার উদাহরণ হলো ১৮শ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাদী কৃষিতে (plantation agriculture) নিযুক্ত আফ্রিকা থেকে আনীত দাসরা। গার্হস্থ্য বা পারিবারিক দাস প্রথা ছিল সুবিদিত এবং ভারতীয় উপমহাদেশে দাস প্রথার এ প্রকরণটি প্রচলিত ছিল।[৮]

ইহুদি ও খ্রিষ্টান সমাজে দাস প্রথার স্বরূপ

ইহুদি সম্প্রদায় দাসত্বের বৈধতা স্বীকৃত হত। ইহুদিদের পুরাতন বিধানে পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিক জাতি, প্যালেস্টাইনি ও সেখানে বসবাসকারী প্রবাসীদের মধ্য হতে ইহুদিদেরকে দাস-দাসী ক্রয়ের অনুমতি দেয় এবং তারা চিরতরে পুরুষানুক্রমে তাদের সম্পত্তি হবে বলে ঘোষণা করে। খ্রিস্টধর্ম দাসত্ব দূর করার চেষ্টা না করে তা স্বীকার করে নেয়। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, হঠাৎ বদ্ধ ধারণার পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা না করে এরূপ করতে গেলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। যাজকরা পর্যন্ত ক্রীতদাস রাখতেন। প্রভুর অভিপ্রায় জেনে যে দাস তা প্রতিপালনে প্রস্তুত হত না, কিম্বা সে অনুযায়ী কাজ করত না, নব বিধান তাকে বহু চাবুক মারার এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একাগ্রচিত্তে যীশুর ন্যায় বংশানুক্রমে মনিবের দাসত্ব করার ও সম্পূর্ণ ভয়ের সাথে ভালমন্দ ও ভদ্রাভদ্র নির্বিশেষে তার অনুগত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তাদের মুক্তি লাভের উপায় ছিল না।[৯]

হিন্দুধর্মে দাস প্রথার স্বরূপ

ভারতবর্ষ জয়ের পর আর্যরা সমস্ত অনার্য জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। অভিধানে 'দাস' শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ শূদ্র। তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-এই উচ্চতর ত্রিবর্ণের দাস। এদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের কর্তব্য। দাসত্বের জন্যই শূদ্রের সৃষ্টি। মনিব মুক্তি দান করলেও দাসত্ব থেকে তার মুক্তি নেই; তার দাসত্ব কখনো নষ্ট হয় না। তার নাম ঘৃণাস্পদ। তার নামের শেষে 'দাস' শব্দ যোগ করতে হয়।[১০]

---

৭ মাহমুদা ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৮ *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫
৯ ড. এম আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮
১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে এই নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেকালে ১৮০২ সালে ডেনমার্কে, ১৮০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮১১ সালে ইংল্যান্ডে, ১৮১৩ সালে সুইজারল্যান্ডে, পর বৎসর হল্যান্ডে, ১৮১৮ সালে ফ্রান্সে ও ১৮৩৬ সালে পর্তুগালে দাসত্ব নিষিদ্ধ হয়। তথাপি ১৮৩৪ সালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ৮ লক্ষ ও ১৮৩৯ সালে ৭ লক্ষ কাফ্রী দাস দেখা যেত। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গুরুতর যুদ্ধের (১৮৬০-৬৫) ফলেই হতভাগ্য কাফ্রীরা স্বাধীনতা লাভ করে।[১১]

দাস প্রথা উচ্ছেদে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ

ইসলামের সাম্যবাদী নীতির প্রতিকূল হলেও হযরত মুহাম্মদ (স.) এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি তাৎক্ষণিকভাবে উঠিয়ে দেননি। তবে নানাবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি এটা এত সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসেন যে, এর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে।[১২] প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে ভাগ্য-বিড়ম্বিত ক্রীতদাসদের কোন সুনিশ্চিত সামাজিক অধিকার ছিল না। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'তখনকার আরবে ভৃত্য বা ভূমিদাসের মনে ক্ষীণ আশা ও এক কণা সূর্য রশ্মিও কবরের এদিকে (ইহজীবনে) জুটত না'।[১৩] ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর দাসদের প্রতি পাশবিক আচরণের এমন সব বীভৎস নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম সত্য-সত্যই মানব সভ্যতার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রারম্ভে এ কথা বলা আবশ্যক যে, আল-কুর'আনের কোন আয়াতেই দাস প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যেমন সরাসরি আদেশ নেই, তেমনি কোন মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করা সম্পর্কেও প্রত্যক্ষভাবে কোন ইতিবাচক নির্দেশ নেই। আরও লক্ষণীয় যে, আল-কুর'আনের একমাত্র একটি আয়াত ব্যতীত অন্য কোন আয়াতে 'আবদ' বা 'দাস' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। যেমন আল-কুর'আনে এসেছে,

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

'আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজনকে যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে উত্তম জীবিকা দিয়েছি। অতএব সে তো ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, উভয় কী সমান ? সব প্রশংসা আল্লাহর কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না'।[১৪]

---

১১ ড. এম আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত
১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
১৩ Syed Ameer Ali, Ibid, p. 265
১৪ আল-কুর'আন, আন-নাহল, ১৬ : ৭৫

আল-কুর'আনে দাস শব্দটি ব্যবহৃত না হওয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করলে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম দাস প্রথা চরম নিন্দনীয় বলে ধারণা করে দাসদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের পথ নির্দেশ করেছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে উল্লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময়ে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল।[১৫] ইসলাম সর্বপ্রথম প্রাচীন আরবীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী একমাত্র যুদ্ধ বন্দীদেরকে সাময়িকভাবে বা প্রয়োজনবোধে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারী-পুরুষ শিশুসহ সেসব গোত্রের যে সকল লোক যুদ্ধে বন্দী হতো, মুক্তিপণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা দাসে পরিণত হতো। তাছাড়া কোন মুক্ত মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা ইসলাম সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে নবী করীম (স.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার প্রাপ্ত মূল্য ভোগ করবে, শেষ বিচারের দিন তার বিপক্ষে আমি যুক্তি উত্থাপন করবো'।[১৬] নবী করীম (স.) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুক্ত মানুষকে দাসে পরিণত করে তার নামায আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।'[১৭]

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় দাস হিসেবে গণ্য করা বৈধ ছিল। তবে এসব যুদ্ধবন্দীদেরকেও দাসে পরিণত করার প্রতি ইসলাম চূড়ান্ত বা নীতিগত অনুমোদন দান করেনি। অন্য কথায়, ইসলামে এর বৈধতা প্রত্যক্ষ কোন ধর্মীয় অনুমোদনক্রমে নয়, বরং সুবিধার্থে এবং এটি ইতিবাচক আইনের অনুশাসন বিরোধী নয় বলে। কেননা আরবের তৎকালে মানব-প্রকৃতি ও প্রয়োজন উপযোগী এমন বাস্তব পন্থা গ্রহণ করা জরুরিও ছিলো। উপরন্তু যে রীতিনীতি ও জীবনপদ্ধতির ধরন আরবীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতো, তা কখনো মুছে দেয়া যায়নি এবং সংস্কারের এ কাম্যও হওয়া উচিত ছিল না যে দাস প্রথা হঠাৎ একেবারে রহিত হোক। তাই আল-কুর'আন দাসত্বের কঠোরতা যথাসাধ্য হ্রাস করে তাদের প্রতি ইহসান প্রদর্শন করার এবং অতি সহজে মুক্ত করে দেয়ার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।[১৮] ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে দাস-দাসীদের মুক্ত করার নীতি একান্তই কঠোর ও সীমিত ছিল। কেবল, ধর্মীয় কিছু বিধি বা কার্যাদি সম্পাদন ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন ব্যবস্থা আদৌ সমাজে প্রচলিত ছিল না। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক লেনপুল এর প্রতিধ্বনি করে বলেন,

---

১৫ মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইস্মাঈল আল- বোখারী, *সহিহ আল বুখারী* (তুরস্ক : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, ১৯৮১ খ্রি.), কিতাবুল বূয়ূ, পৃ. ৩৫৭

১৭ আবু ঈসা মুহাম্মদ আত-তিরমিযী, *আল-জামি আত-তিরমিযী* (বৈরূত : দারুল ইহ্ইয়া'ইত তুরাছিল আরবি, তা.বি.), কিতাবুর রিকাক, পৃ. ২৭৬

১৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীরে ফী যিলালিল কুর'আন* (অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ঢাকা : আল-কুর'আন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), খ. ৪, পৃ. ১৩১

'খ্রিষ্টান আমলে মৃত্যুর পূর্বে ক্রীতদাসের দাসত্ব ঘুচত না, ইসলামের আগমনের পর তাদের সামনে মুক্তি লাভের সহজতম ও সরলতম পথ উন্মুক্ত হয়েছে'।[১৯]

আল-কুর'আনে ক্রীতদাস মুক্ত করার উপায়সমূহ

আল-কুর'আনের বিবিধ আয়াতে ক্রীতদাস মুক্ত করার বিভিন্ন উপায় বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত প্রণিধানযোগ্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো:

এক. কোন ব্যক্তি কোন মুসলিম বা জিম্মীকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে এটা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সঙ্গতিহীন সে একাধিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়'।[২০] এ ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, একমাত্র এই অবস্থাতেই মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করতে আদেশ হয়েছে। এ ছাড়া অন্য ব্যাপার সম্পর্কে কাজী শওকানী বলেন, এটাতে কোন মতানৈক্য নেই যে, অবিশ্বাসী দাস মুক্ত করলেও প্রতিদানে (মুসলিম দাসমুক্তকারীর) সমপর্যায়ের পূণ্য অর্জন করতে পারবে।[২১]

---

১৯ মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

২০ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৯২

২১ ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ শাওকানী, *নায়লুল আওতার* (অনু. সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), খ. ৬, পৃ. ১৯৯; দ্র. এ সম্পর্কে ইমাম মালিকের বক্তব্যও স্পষ্ট এবং তিনি বলেন, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা মূর্তিপূজক দাস মুক্ত করার মধ্যে কোন প্রকার দোষ নেই; দ্র. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান, 'ইসলামের দৃষ্টিতে দাসপ্রথা' সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

দুই. জিযিয়া (নিষ্ক্রয়) বিনিময় গ্রহণে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ দানের এবং দাস মু'মিন ও কর্তব্যপরায়ণ হলে প্রাপ্য কম নিয়ে তাকে মুক্তিদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসিগণকে সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কর না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২২]

আলোচ্য আয়াতে মুকাতাব দাসদের কথা বলা হয়েছে। অধিকৃত দাসদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করে তাদেরকে মুকাতাব দাস বলা হয়, মনিবদেরকে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাদের মুক্তি দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাহাবী ও কুরআন ব্যাখ্যাকার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.), 'যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাও' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি মুক্তির পর দাস নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে অসমর্থ্য হওয়ার আশংকা থাকে বলে মনে হয়, তবে তাকে মুক্ত করে দেয়া সঙ্গত নয়। কেননা সে সমাজে বোঝা হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।[২৩] আল- কুর'আনে এই নির্দেশ সম্বলিত আরও কতিপয় আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ

'কিন্তু সে চেষ্টা করে না চড়াই পথ চলতে। তুমি কি করে জানবে চড়াই পথ কী ? উহা ক্রীতদাস মুক্ত করা।'[২৪] 'ফাক্কু রাকাবাহ' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম (স.) এর হাদীসে উল্লেখ হয়েছে কোন দাস

---

২২ আল-কুর'আন, আন-নূর, ২৪ : ৩৩
২৩ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত, তাফসীরে তাবারী (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), খ. ৮, পৃ. ১২৭;
২৪ আল-কুর'আন, আল-বালাদ, ৯০ : ১১-১৩

চুক্তিকৃত অর্থদানে অসমর্থ হলে তাকে সাহায্য করার অর্থ হলো 'ফাক্কু রাকাবাহ।'[২৫] এছাড়াও পবিত্র আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহকে বিশ্বাস করলে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে'।[২৬]

তিন. যুদ্ধবন্দীদেরকে বিনা পণে বা কিস্তিতে পণ গ্রহণ করে মুক্তি দানের ব্যবস্থা রয়েছে। আল-কুর'আনের একটি মাত্র আয়াতে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই নীতিটি হল, হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে, নতুবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ 'এর পর বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিবে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিবে'।[২৭] আয়াতের অর্থ হল কোন বিনিময় ছাড়া যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, নতুবা কোন অর্থ, কাজ বা মুসলিম বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে।[২৮] যেমন বদরের যুদ্ধে কিছু সংখ্যক যুদ্ধ বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। আবার যে সকল শিক্ষিত যুদ্ধবন্দী মুক্তিপণের অর্থ আদায় করতে সক্ষম হয়নি তাদেরকে মদিনার আনসারদের দশজন সন্তানকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। কয়েকজন বন্দীকে রাসূলুল্লাহ (স.) কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মুত্তালিব ইবনে হানতাব, সাইফী ইবনে রেফায়া, আবু উয্যাহ জুমাহী প্রমুখ।[২৯]

চার. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফফারা স্বরূপ একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

---

২৫ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), *সুনানে আবু দাউদ* (তুরস্ক : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, ১৯৮১ খ্রি.), পরিচ্ছেদ, ফি হাক্কিল মামলূক, পৃ. ৩০৯

২৬ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ১ : ১৭৭

২৭ আল-কুর'আন, আল-মুহাম্মদ, ৪৭ : ৪

২৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৭৩

২৯ মাওলানা সফিউর রহমান মুবারকপূরী, *আর রাহীকুল মাখতূম* (অনু. মিযান বিন হারুন, ঢাকা : দারুল হুদা কুতুবখানা, ২০১০), পৃ.৩৮৮

'তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সে সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্র্যকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি, এবং যার সামর্থ্য নাই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর'।[৩০]

পাঁচ. কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করে অবৈধ ঘোষণা (জিহার) করলে এবং এই অপরাধের আত্মশোধনের জন্য একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে তবে একে-অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন'।[৩১]

দাস মুক্তির উপায় হিসেবে আল-কুর'আন একটি অভিনব পন্থা প্রবর্তন করেছে। শরি'য়তের আহকামে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তার প্রতিবিধান হিসেবে দাসমুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ দৈনন্দিন কাজের ত্রুটি বিচ্যুতির সাথে দাস মুক্তির সাথে কোন যৌক্তিক সম্পর্ক খুজেঁ পাওয়া যায় না। ইসলামে মূলত মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই দাস মুক্তির সমাজ সংস্কারমূলক নতুন নতুন পন্থা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

ছয়. যাকাত বা সাদকার অর্থ ব্যয় করে দাস মুক্তির জন্য আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদিগের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।[৩২]

---

৩০ আল-কুর'আন, আল-মায়েদা, ৫ : ৮৯
৩১ আল-কুর'আন, আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ৩
৩২ আল-কুর'আন, আত-তাওবা, ৯ : ৬০

সাত. মালিককে ভৃত্যের প্রতি ইহসান করতে এবং দয়াশীল হতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

'দয়াশীলতা দেখাও মাতা-পিতার প্রতি, তোমার নিকট আত্মীয়দের প্রতি, অনাথের প্রতি... এবং তাদের প্রতি তোমার দক্ষিণ হাত যাদের ধারণ করে আছে'।[৩৩]এখানে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পাশাপাশি দাসদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে আপন পিতা- মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের কাতারে দাসদেরকে একিভূত করে মানবাতার সাম্য ঘোষণা করা হয়েছে।

আট. আল-কুর'আন প্রভু ও ভৃত্য একই বংশোদ্ভূত বলে ঘোষণা করে বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

'মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার নির্যাস থেকে'।[৩৪] আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল-কুর'আনে দাস ও প্রভু একই বংশোদ্ভুত ও তারা মূলগতভাবে একই।

আল-হাদীসে ক্রীতদাস মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা ক্রীতদাসদের মুক্তি দেয়া একটি অতি পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করে ভৃত্যের প্রতি হৃদয়বান ও সহানুভূতিশীল হতে জোর দিয়েছেন। ক্রীতদাসদের মুক্ত করা এক অতি পুণ্যের কাজ বলে নবী করীম (স.) ঘোষণা করেছেন। নানারকম পাপ মোচনে কিংবা মন্দকার্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রীতদাস মুক্ত করার আদেশ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা ভঙ্গ করলো, তার উচিত একটি দাস মুক্ত করা'। [৩৫] মহানবী (স.) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় দাস-দাসী মুক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছেন'।[৩৬] দাস-দাসী কথাটি পরিবর্তন করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলতেন, 'আমাদের দাস, আমাদের দাসী এ কথা বলিও না। বরং আমার ছেলে, আমার মেয়ে, এ কথা বল'।[৩৭] যে দিন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছিলেন, 'আমার ক্রীতদাস' অথবা 'আমার ক্রীতদাসী' একথা বলা অনুচিত; বরং বলা উচিত যে 'আমার যুবক' বা 'আমার

৩৩ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ৩৬
৩৪ আল-কুর'আন, আল-মু'মিনূন, ২৩ : ১২
৩৫ মুহম্মাদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৩৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ 'মা ইস্তাজিবু মিনাল এ'তাকাতে ফিল কুসূফ', পৃ. ৪৩৫
৩৭ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহিহ আল-মুসলিম* (তুরস্ক : আল- মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৯৮১ খ্রি.), পরিচ্ছেদ, 'লাইয়াকুলুল মালিকু রাব্বি ওয়া রাব্বাতি', পৃ. ১৭৫

যুবতী'–প্রকৃতপক্ষে, সে দিন থেকেই ইসলামে ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে।[৩৮] দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার ও তাদের মানবিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য আদেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন, 'কেউ যদি তার দাসকে হত্যা করে, আমরা তাকে হত্যা করব। কেউ যদি তার দাসের নাক কাটে, আমরা তার নাক কাটব, আর কেউ যদি তাকে খোঁজা তথা নপংশুক করে, আমরাও তাকে নপংশুক করবো।'[৩৯]

ভৃত্য ও মনিবের মধ্যে কোন প্রাধান্য নেই। একমাত্র ধর্মপরায়ণতাই ইসলামে প্রাধান্য লাভের মাপকাঠি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত, যিনি আল্লাহ তা'য়ালাকে সর্বাধিক ভয় করেন'।[৪০]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবিতাবস্থায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দাসদের দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের জন্য ব্যবহৃত হতো, বিশেষ করে সদ্যমুক্ত নিঃস্ব দাসদের পুনর্বাসনের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক অংশ ব্যয় করা হতো। নবী করীম (স.) শ্রমের মর্যাদা দিয়ে দাস প্রথা সৃষ্টি হওয়ার পথ রুদ্ধ করেছেন। কেননা সাধারণত নিঃস্ব ও দরিদ্র নর-নারী অন্ন সংস্থানের জন্য দাসবৃত্তি গ্রহণ করে থাকে বা কারো অনুগ্রহ লাভের প্রয়াসী হন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, 'দুই হাতের উপার্জনই মানুষের উত্তম এবং সম্মানজনক উপার্জন'।[৪১] হযরত মুহাম্মদ (স.) ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য কেবল মৌখিক আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; তিনি স্বীয় ক্রীতদাস যায়েদ ইব্ন হারেসকে মুক্ত করে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে তাকে মূতার যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করেন।[৪২] তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র উসামাকেও ইসলামের একটি সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন।[৪৩] এমন অভিনব ও বিস্ময়কর নীতি অবলোকন করে সাহাবাগণ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করলে হযরত মুহাম্মদ (স.) তৎক্ষণাতই পারস্পরিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর এই বাণী বেশ প্রণিধানযোগ্য, 'নিগ্রো ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়, যতক্ষণ সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করবে, তাকে মেনে চলবে'।[৪৪] আরও উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তার ইনতিকালের সময় কোন ক্রীতদাস রেখে যাননি, হাদীসে এমন সুস্পষ্ট রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।[৪৫]

---

৩৮ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ইসলামী সমাজের রূপ' *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ. ১৩২

৩৯ ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত,পরিচ্ছেদ, ফি হাক্কিল মামলূক

৪০ আল-কুর'আন, আল-হুজরাত ৪৯ : ১৩

৪১ ইমাম আহমাদ, *সুনানে আহমাদ* (তুরস্ক : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৫৭

৪২ ইবনে হিশাম, *সিরাতে ইবনে হিশাম* (অনু. আকরাম ফারুক, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৮), পৃ. ২৬১

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১

৪৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌মাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইস্তীযান, পৃ. ২৯৮

৪৫ মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

দাস-দাসী সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নির্দেশ ছিল অপূর্ব। তিনি বলতেন, 'মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি মহান স্রষ্টা। বাকী সকলেই তাঁর সৃষ্টিজগত বা দাস। তারা অন্য কারো দাস নয়। কেননা একজন মানুষ একসঙ্গে দুজনের দাস হতে পারে না। মানুষকে আল্লাহর দাস বলা হয়েছে শুধু এই অর্থে যে, সে তার মালিক মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুলের সেবা করবে। সুতরাং দাসের প্রথম ধর্ম তার মালিকের নির্দেশগুলোকে যথাযথভাবে পালন করা। এই জন্যই কোন মানুষই সৃষ্টির সেবা ব্যতীত স্রষ্টাকে বা আল্লাহকে পেতে পারে না। ইহকালে ও ইহজগতে মহান স্রষ্টা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন সে যেন তার সৃষ্টি জগতের সেবা করে। সৃষ্টির এই সেবা ধর্মেই জগতের সমস্ত নর-নারী একমাত্র আল্লাহর দাস, কোন মানুষই মানুষের দাস নয়।[৪৬]

হযরত উমর (রা.) এর যুগে দাস প্রথা

যাকাত দানে অস্বীকারকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) পরিচালিত যুদ্ধে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত বিধ্বস্ত হয়। মুসলিমগণ এই পরাজিত বিদ্রোহী সৈন্যদের দাস-দাসীরূপে ব্যবহার করতে থাকে। খলীফা হয়েই হযরত উমর (রা.) তাদের মুক্ত করে দেন। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কে আইন পাস করেন যে, কোন আরব বন্দীকে দাসে পরিণত করা যাবে না।[৪৭]

যুদ্ধবন্দী দাস-দাসীকে জিযিয়া কর নিয়ে মুক্ত করার নির্দেশ

বসরার গভর্ণর হযরত আবু মুসা আশ'আরীকে (রা.) হযরত উমর (রা.) পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই যেন তথাকার কৃষক মুজুরগণকে দাসে পরিণত করা না হয়। মানাযের নামক স্থানের একদল দুর্ধর্ষ অধিবাসীকে সৈন্যরা দাস বানিয়ে রেখেছিল। হযরত উমর (রা.) তা জানতে পেরে তাদেরকে কঠোর নির্দেশ দিলেন যে, 'অবিলম্বে তাদের মুক্তি দাও।এবং তাদের উপর ভূমিকর ও জিযিয়া ধার্য করে জিম্মি নাগরিক বানাও।'[৪৮] হযরত উমর (রা.) আপন মাতা হতে দাস সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করতেও নিষেধ করেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী মন্তব্য করেন যে,

'it was ordered that in no case should the mother be separated from her child, nor brother from her brother, nor father from son, nor husband from wife, nor one relative from another.'[৪৯]

৪৬ ড. ওসমান গনী, *মহানবি (স.)* (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬), পৃ. ৪৬৮
৪৭ আব্দুল মওদুদ, *হযরত ওমর (রা.)* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৮), পৃ. ২২২
৪৮ প্রাগুক্ত।
৪৯ Syed Ameer Ali, Ibid, p.265

‘এটা আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, কোন ক্ষেত্রেই মা তার সন্তানের থেকে আলাদা হবে না ভাই তার ভাইয়ের কাছ থেকে না পুত্র পিতা থেকে স্ত্রী স্বামী থেকে কিংবা অন্য কোন আত্মীয়কে অপর আত্মীয় থেকে’।

প্রাচীন বিশ্বে ক্রীতদাস প্রথা ছিল, দাস-শ্রমিক প্রথাও ছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি এ সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। মহানবী (স.) বলেছেন, ‘শেষ বিচারের দিন তিন প্রকার লোকের প্রতি আমি বৈরীভাব পোষণ করব। তারা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করে, যে ব্যক্তি একজন স্বাধীন মানুষকে অন্যের কাছে বিক্রয় করে দিয়ে বিক্রির টাকা খায়, আর যে শ্রমিক নিযুক্ত করে কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে মজুরী দেয় না’।[৫০] পবিত্র আল-কুর’আনে সে সময়ের ক্রীতদাসদেরকে মুক্তি অর্জনের জন্যে টাকা দিয়ে সাহায্য করার নির্দেশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

والَّذِينَ يَبتَغُونَ الكتابَ مِمَّا مَلَكَت ايماَ نُكُم فَكَا تِبُو هُم اَن عَلِمتُم فِيهِم خَيرًا-وَاتُو هُم مِن مَالَ اللّٰهِ الذَّى اتكُم

‘তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী, তারা মুক্তি-পত্র চাইলে তোমরা তা লিখে দাও, যদি তোমরা এতে তাদের ভাল বোঝ; এবং আল্লাহ তা’য়ালা তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দাও।’[৫১] সেকালে ইসলামে যুদ্ধ-বন্দীদেরকে সাময়িকভাবে দাস রাখা হতো। একে এক ধরনের যুদ্ধকালীন বন্দিত্বও বলা যেতে পারে। তারপর তাদেরকে বিনা পণে অথবা সামান্য পণে বা কর নিয়ে মুক্তি দেয়া হতো। পবিত্র আল-কুর’আনে বলা হয়েছে,

فَا ذَا لَقِيتُم الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَربُ الرِّقَابَ حتّى اِذَا اَتخَنتُمُو هُم فَشُدُّوا الوَثَاقَ-

‘যতক্ষণ তুমি তাদেরকে পরাভূত না করছো, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বন্দি করে রাখো। তারপর মহানুভবতা প্রদর্শন করে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দাও’।[৫২]

ক্রীতদাস মুক্ত করার অন্যান্য উপায়সমূহ

উপার্জনশীল দাস চুক্তিকৃত অর্থদানে মুক্তি পেতে পারে। এ ধরনের চুক্তিকৃত গোলামকে মুকাতিব বলা হয়। চুক্তির অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। মালিক এ প্রকার চুক্তি বাতিল করতে পারে না।[৫৩]

---

৫০ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
৫১ আল-কুর’আন,আন-নূর, ২৪ : ২৩
৫২ আল-কুরআন, আল-মুহাম্মদ, ৪৭ : ৪
৫৩ আল্লামা সারাখ্‌সী, *সিয়ারুল কবির* (করাচী : রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮২), খ. ১, পৃ. ১৮৫

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ক্রীতদাসদের সহায়তা করতে ইসলাম ব্যাপক উৎসাহিত করেছে।[৫৪] হযরত আলীর (রা.) অভিমত হচ্ছে, মালিক চুক্তিকৃত অর্থের এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।[৫৫] এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র.) এর অভিমত হলো, মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বের উপার্জিত অর্থ দাসের প্রাপ্য বলে গণ্য হবে।[৫৬] কোন মালিক যদি তার দাসকে সম্বোধন করে বলে, 'আমি মারা গেলে তুমি স্বাধীন।' তাহলে মালিকের মৃত্যুর পর সে মুক্ত হবে। এরূপ মুক্ত হওয়াকে মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রে তদবিব বলা হয় এবং এরূপ দাসকে মুদাব্বির বলা হয়।[৫৭] দাসীদের ঔরসে সন্তান জন্মলাভ করলে সে পত্নীর মর্যাদা পায়। তখন তার নাম হয় 'উম্মে ওয়ালাদ' বা সন্তানের মাতা। এই সন্তান স্বাধীন।[৫৮] কোন কোন ব্যবহার শাস্ত্রবিদদের অভিমত, মালিকের মন্দ ব্যবহারজনিত কারণে গোলাম মুক্তিপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃত হবে।[৫৯] উপরন্তু শাস্তি যদি শারিরীক ক্ষতির কারণ হয়, তখন মালিকের বিনা অনুমতিতে দাস মুক্তি প্রাপ্ত হয়।[৬০] তাছাড়া কোন ক্রীতদাস যদি মালিকের প্রত্যক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে প্রমাণিত হয়, তবে সে মুক্তি পাবে।[৬১]

দাস প্রথা সম্পর্কে অমুসলিম লেখকগণের সমালোচনা ও জবাব

দাস প্রথা উচ্ছেদে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এতসব যুগান্তকারী বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও অমুসলিম লেখকগণ দাসপ্রথা আইন করে বন্ধ না করায় ইসলামের উপর নানা রকম মিথ্যা অপবাদ দেয়, যা বস্তুনিষ্ঠভাবে অসত্য। নিম্নের আলোচনায় এসকল অমুসলিম লেখকগণ কর্তৃক উত্থাপিত কিছু অপবাদের জবাব দেয়া হল। ইসলাম দাসীদেরকে রক্ষীতা হিসেবে ব্যবহৃত করার অনুমতি দেয়ায় অমুসলিম লেখকগণ ইসলামকে তাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলোধুনো করেছেন।

এ ব্যাপারে ইসলামের সুচিন্তিত মতামত হলো তৎকালীন ক্রীতদাস প্রথাকে শুধু মুসলিমগণের পক্ষে এককভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। কেননা বন্দীদেরকে ক্রীতদাস বানানো তখন আন্তর্জাতিক নিয়ম ছিল। অন্যথায় শুধু মুসলিম বন্দীরাই ক্রীতদাসে রূপান্তরিত হবে। অপর পক্ষে অমুসলিম বন্দীরা স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি এ নিয়মই প্রচলিত হয়, তবে অমুসলিম শিবিরের পাল্লা মুসলিম শিবিরের উপর প্রাধান্য পাবে এবং তখন বিধর্মী শিবিরগুলো মুসলিম শিবিরে আক্রমণ করতে লোভী এবং

---

৫৪ 'এবং তোমাদের উচিত আল্লাহর সম্পত্তি দিয়ে সাহায্য করা যা তোমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন।' দ্র. আল-কুর'আন, সূরা আন-নিসা; কোন কোন ইমাম এই আয়াতের ভাষ্যে বলেন যে, দাস চুক্তি মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে সাদাকার মাল দ্বারা সাহায্য করা যেতে পারে, দ্র. তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৭

৫৫ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৫৬ ইমাম মালেক (র.), *মুয়াত্তা ইমাম মালেক* (করাচী : রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৪), পৃ. ৩০৬

৫৭ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৫৮ ইমাম মালেক (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৫৯ মহানবি (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করে, কিংবা তাকে জোরে প্রহার করে, তার উচিত ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দাসকে স্বাধীন করে দেয়া।' দ্র. আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৬০ ইমাম নববী, *শরহে মুসলিম* (করাচী : রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৪), পৃ. ২১০

৬১ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

উৎসাহিত হবে। তখন মুসলিমগণ আক্রমণের এই পরিণাম থেকে সম্পূর্ণ অনিরাপদ থাকবে এবং অমুসলিমরাই লাভবান হবে।[৬২] ক্রীতদাস প্রথা ও দাসত্ব মোচন বিষয়টি প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। নিঃসন্দেহে বৈধ যুদ্ধে- যে যুদ্ধের আহ্বান জানান আল্লাহর বিধান প্রয়োগকারী মুসলিম ইমাম। কেবলমাত্র সেই যুদ্ধে বৈধ প্রয়োজনেই দাসীদেরকে ইসলাম রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করা সমর্থন করে। কারণ সতীস্বাধ্বী স্বাধীন মুসলিম নারীদেরকে যখন যুদ্ধে বন্দী করা হয়, তখন তাদের পরিণাম এই পরিণামের চেয়ে আরো ভয়াবহ ও মারাত্মক হয়ে থাকে।[৬৩]

অধিকন্তু এর পেছনে রয়েছে জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ। যুদ্ধে বন্দী দাসীদের জীবনেও তার প্রাকৃতিক চাহিদা রয়েছে, যাকে বাস্তব সম্মত কোন বিধানেই অবহেলা করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে যে বিধান মানব প্রকৃতি ও বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রাখে। সুতরাং যেহেতু দাস প্রথা বিদ্যমান সেহেতু অমুসলিম নারীদের জৈবিক চাহিদা ও পুনর্বাসন করা দুই পন্থার কোন এক পন্থায় সম্ভব। হয়ত বিয়ের মাধ্যমে নতুবা মনিব দাসীকে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে। যাতে সমাজে নিয়ন্ত্রনহীন নৈতিক অবক্ষয় এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলা প্রকাশ না পায়, যখন তারা পতিতাবৃত্তি অথবা একত্রে আড্ডা দেয়া এবং মেলামেশার মাধ্যমে তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করতে চায়, যেমনটা জাহেলী সমাজে চালু ছিল। যেহেতু অমুসলিম নারীকে বিয়ে করা মুসলিম পুরুষের জন্য হারাম। তাই এক্ষেত্রে অমুসলিম বন্দী নারীকে জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে।[৬৪]

অতএব মুসলিম সমাজে অমুসলিম মহিলারা যদি বন্দী হয়ে আসে তখন ইসলাম তাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করবে? তার জবাবে যদি বলা হয়, এ সমস্ত বন্দী মহিলারা শুধু খাওয়া-দাওয়া ও পান করার মাঝেই ক্ষান্ত থাকবে, প্রকৃতি কখনো এটা মেনে নেবে না, বরং সেখানে প্রকৃতিরও একটি বিশেষ অপূরণীয় চাহিদা থেকে যাবে, যা পূরণ করা অতীব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে, আর তা হচ্ছে যৌন চাহিদা মেটানো। অন্যথায় তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে, যা পুরো সমাজকে অপবিত্র ও নষ্ট করে দিবে।[৬৫] ইসলাম গোলাম মুক্ত করতে কেবল উৎসাহিতই করেনি, গোটা দাস প্রথাকে ক্রমাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিরতরে শেষ করার ব্যবস্থাই করেছে এবং প্রাচীন দাস প্রথা যা তদানীন্তন বিশ্বসভ্যতার অঙ্গ ছিল; বিশ্ব অর্থনীতির ভিত্তি ছিল, তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

ইসলাম প্রধানত নতুন করে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানোকে এবং দাস ব্যবসাকে সম্পূর্ণ হারাম করেছে। পরে সাময়িকভাবে দাস বানাবার একটি সূত্রকেই চালু রাখার অনুমতি দিয়েছে মাত্র। আর তা হচ্ছে

৬২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩১
৬৩ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৭
৬৪ প্রাগুক্ত।
৬৫ প্রাগুক্ত।

কাফিরদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধ হলে যে সব কাফির সামরিক লোক হিসেবে মুসলিম মুজাহিদদের হাতে বন্দী হবে, তাদের প্রথমে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্ত করতে হবে। অনেককে ছেড়ে দিতে হবে। তারপরেও যাদের ছেড়ে দেয়া সমীচীন বিবেচিত হবে না, তাদেরকে মুসলিম সমাজের মধ্যে মিলিয়ে ফেলতে হবে। তাদের ইসলাম গ্রহনের আহ্বান জানানো হবে। যারা ইসলাম গ্রহন করবে তারা ইসলাম গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হয়ে যাবে। আর তা যারা করবে না, তারা শ্রম বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করতে পারবে। এ রকম চুক্তি যে দাসই করতে চাইবে, মুসলিম মনিব তার সাথেই সে চুক্তিতে রাজি হতে বাধ্য হবে। তবে ইসলামের প্রথম প্রতিষ্ঠালগ্নে হঠাৎ করে গোটা দাস প্রথাকেই হারাম ঘোষণা করলে তদানীন্তন গোটা সমাজ প্রাসাদই ভেঙ্গে পড়ত। এ কারণে ইসলাম তা না করে নানা রকম দ্বীনী কৌশল অবলম্বন করেছে। এটা বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া।[৬৬]

বস্তুত সারা পৃথিবীব্যাপী যখন দাসপ্রথা ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি; দাসদের উপর যখন বিশ্বের বিভিন্ন জাতি অমানবিক ও অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাত, তখন ইসলামই সর্ব প্রথম দাস ব্যাবস্থার ক্রমবিলুপ্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইসলাম মানবতার ধর্ম। তাই ইসলাম দাসদেরকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদা দেখতে চেয়েছে। সমকালীন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলাম দাস ব্যবস্থাকে আইন করে বিলুপ্ত করার একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু ইসলাম নীতিগতভাবে কখনো দাস প্রথাকে সমর্থন দেয়নি। বরং দাসদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক বিকাশের সকল পথ সুগম করে দেয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) ইমানদারদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'নিগ্রো ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়, যতক্ষণ সে খোদার আইন মোতাবেক তোমাদের চালাবে, তাকে মেনে চলবে।' মহানবির (স.) ঘনিষ্ঠতম সহচর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত এক সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিত্ব অর্পণ করলেন এককালীন ক্রীতদাস যায়েদের হাতে। সেই বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রা.) ও উমরের (রা.) মত প্রধান সাহাবীরা থাকা সত্ত্বেও যায়েদের মৃত্যুর পর সেনাপতিত্ব দেওয়া হল তার পুত্র উসামাকে। এভাবে দাসকে শুধু তার মনিবদের সমান মর্যাদাই ইসলাম দিল না, সাথে সাথে তাদের পূর্ব মনিবদের ওপর প্রভুত্বের মর্যাদাও দান করল।

ইসলামী সমাজ এমন একটি সমাজ যা একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত- যে সমাজে আল্লাহর দাসদেরকে (বান্দাদেরকে) সকল প্রকার মানব-দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। যে দাসত্ব ব্যবস্থা বিশ্বের অপরাপর বিধান ও মতাদর্শে বিদ্যমান দেখা যায়-ইসলামে সেরূপ অর্থে কোন দাসত্ব ব্যবস্থা নেই।

---

৬৬ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *যুগ জিজ্ঞাসার জবাব* (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ২৭

ইসলামী বিধানে দাসত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। তাতে কোন প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। যেখানে মানুষ তার কোন বান্দার অনুগত হয়না। আর এই স্বাধীনতা থেকে যাবতীয় মহৎ গুণাবলী এবং নীতি নৈতিকতার যাত্রা। আর এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মহৎ গুণাবলীর চুড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। সুতরাং এ চরিত্র লোক দেখানো কাজ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর এটা হচ্ছে ইসলামের নীতি নৈতিকতা এবং মুসলিম সমাজের গুণাবলীর প্রধান ভিত্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দত্তক প্রথা আইন

প্রাক-ইসলামী যুগে দত্তক প্রথা

আরব জাতি অন্যান্য জাতির লোকদের ন্যায় পালকপুত্র রেখে যার সাথে ইচ্ছা নিজের বংশ সম্পর্ক স্থাপন করত। যাকে ইচ্ছা নিজের পুত্র বানিয়ে নিত। এ পালিত পুত্রের কর্তব্য-অধিকার ঠিক আপন ঔরসজাত পুত্রদের মতই গণ্য করা হত।[৬৭] এরূপ পালক পুত্রকে নিজের বংশধর মনে করত। পালক পুত্রের নামের সাথে নিজের নাম যুক্ত করত এবং সন্তান সুলভ সমুদয় অধিকার ও দায়-দায়িত্ব তার সাথে যুক্ত হতে।[৬৮] এ সকল পালক পুত্রকে নিজের পুত্র বলে সম্বোধন করা হত; তারা সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো। তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায় মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ, এ পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হত। তালাকপ্রাপ্তা দেওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীও পালক পিতার জন্য বিবাহ করা হারাম বলে মনে করা হত।[৬৯] আল-কুর'আন এই দত্তক প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে পিতা-পুত্রের প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। কেননা এই প্রকৃত সম্পর্কের উপর মানব বংশধারা পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন থাকবে। বংশ পরিবার সমাজের উপর ভিত্তি করে উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। এক বংশের রক্ত কৃত্রিমভাবে অন্য বংশের সাথে মিশ্রিত হয় না। বৈধ ও অবৈধ সন্তানের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

আল-কুর'আনে দত্তক প্রথার বিধান

ইসলাম পূর্ব যুগের প্রচলিত দত্তক প্রথাকে আল-কুর'আন সম্পূর্ণরূপে রদ-রহিত, বাতিল এবং অকাট্য হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

'তোমাদের মুখে-ডাকা পুত্রদেরকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেন নি। এতো তোমাদের মুখ নিঃসৃত কথা মাত্র। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালাই তো সত্য কথা বলেন, সঠিক ও নির্ভুল পথের

---

৬৭ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ২৯৫

৬৮ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ , প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১১১

৬৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭) খ. ৭, পৃ. ৭৮

সন্ধান দেন। তোমরা এদেরকে (পালক পুত্রকে এদের প্রকৃত) পিতাদের নামে ডাক। আল্লাহর কাছে এটাই অধিকতর সুসঙ্গত সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য। কিন্তু যদি ওদের পিতাদের পরিচয় না জান, তবে ওরা তোমাদের ধর্মীয় ভাই মাত্র। তোমাদের সাহায্যকারী বন্ধু মাত্র'।[৭০]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ লিখেন, বস্তুত মুখের কথা বাস্তবতাকে বদলে দেয় না, রক্ত সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন বানানো সম্পর্ক প্রকৃত সম্পর্কে পর্যবসিত হয় না, বীর্য হতে সৃষ্ট বংশীয় সম্পর্ক- বন্ধন ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক বা বন্ধন উত্তরাধিকারের যোগ্যতা সৃষ্টি করে না এবং সন্তান দেহের অংশ হলে যে স্বাভাবিক আবেগের সম্পর্ক গড়ে উঠে, তা কোন কৃত্রিম পিতা ও কৃত্রিম সন্তানের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না।[৭১] বস্তুত সন্তানকে তার পিতৃ পরিচয় ধরে ডাকাই ন্যায়সংগত ও সুবিচার সম্মত। এটা সেই পিতার জন্যও সুবিচার সম্মত, যার দেহের একটা জীবন্ত অংশ হিসেবেই এই সন্তানের জন্ম হয়েছে, আর সেই সন্তানের জন্যও সুবিচারপূর্ণ যাকে তার পিতৃ পরিচয়ে পরিচয় করা হয়। এর মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারের বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কেননা প্রকৃত পিতার সুপ্ত উত্তরাধিকারগুলো যেমন ব্যক্তিত্ব, মন-মানসিকতা, বিবেক, মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাহস, শক্তি-বীর্য, বুদ্ধিমত্তা, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তার প্রকৃত সন্তানের শিরা-উপশীরায়, রক্ত-মাংস, ধমনীতে সঞ্চালিত হয়। ইসলামের প্রবর্তিত এই বংশধারা পিতা বা সন্তানের সহজাত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখে। এই ব্যবস্থা পরিবার প্রতিষ্ঠানকে ভার সম্পূর্ণ বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। পরিবারের এই প্রকৃত ও স্বাভাবিক ভিত্তি যে ব্যবস্থায় অস্বীকার করা হয় তা ব্যর্থ ও নিষ্ফল ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থা দূর্বল, তার ভিত্তি কৃত্রিম এবং তা টিকে থাকার অযোগ্য।[৭২]

'যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো' আলোচ্য আয়াতাংশ থেকে জাহেলী সমাজের একটি উচ্ছৃঙ্খল ছবি এবং নারী পুরুষের সম্পর্কের অরাজকতার চিত্র ভেসে উঠে। জাহেলী যুগে পারিবারিক বন্ধনগুলো ছিল নৈরাজ্য ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ। সে কারণে বংশীয় ধারায় তখন ভেজাল ঢুকে পড়েছিল এবং অনেক সময় শিশু- কিশোরের পিতৃ পরিচয় জানা যেত না। তার উপর পালক পুত্র গ্রহণ করে পালক পুত্রকে নিজ পুত্র সন্তান হিসেবে গণ্য করায় এবং পালক পুত্রকে নিজ বংশধারায় মিশিয়ে ফেলায় বংশধারার সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই বংশধারাকে সংরক্ষণ ও পবিত্র করার জন্য আল-কুর'আন দত্তক প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করে তা চিরতরে রহিত করে। দত্তক প্রথা রহিতের পর তৎকালীন সমাজে অনেক বেওয়ারিশ শিশু সন্তান এবং ভাসমান জনগোষ্ঠীর প্রাদুর্ভাব সমাজে দেখা দেয়। এই ভাসমান জনগোষ্ঠী যেন সমাজে ছিন্নমূল হয়ে না যায় এজন্য ইসলাম তাদেরকে সমাজে

---

৭০ আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৫-৬
৭১ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১১১
৭২ প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১১২

পুনর্বাসন করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আল-কুর'আন নির্দেশনা প্রদান করে বলে 'যদি তাদের পিতার পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের ইসলামী ভাই ও বন্ধু'। ইসলাম এভাবে পারিবারিক জীবনের সকল অরাজকতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিকার করে এক পবিত্র ও নির্মল পিতৃশাসিত পরিবার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। জাহেলী সমাজের অনিয়মতান্ত্রিকতার প্রভাব ঝেড়ে মুছে ফেলে নিখুঁত নির্মল সমাজ পুনর্গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মহানবী (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে, সে কুফরি করে'। আল-কুর'আন এভাবেই দত্তক প্রথাকে রহিত করে পরিবারকে ও পারিবারিক সম্পর্ককে যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করে এর নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করেছে।[৭৩]

দত্তক প্রথার সাথে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতির রহিতকরণ

দত্তক প্রথার সাথে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় প্রাচীন রীতি-নীতি যেমন পালক পুত্রের উত্তরাধিকার আইন, পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হওয়া ইত্যাদি কুপ্রথা দত্তক প্রথা রহিতকরণের সাথে সাথে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'য়ালা বাতিল ঘোষণা করেছেন। কুর'আন মাজীদে যে উত্তরাধিকার আইনের রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে রক্তের বা শ্বশুরকুলের প্রকৃত নিকটাত্মীয় নয় এমন সম্পর্কে আবদ্ধ নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনকে নিষেধ করা হয়নি। এমনকি এরূপ দূরবর্তী আত্মীয়কে মিরাসে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বানানো হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রা আল্লাহর আইনে পরস্পরের কাছে অধিক অধিকার সম্পন্ন'।[৭৪] বিয়ে সম্পর্কে কুর'আন ঘোষণা করেছে যে, নিজ ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম, মুখে-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীরা নয়। যেমন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরাই তোমাদের জন্য হারাম"।[৭৫]

কাজেই পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম নয়, বরং সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা সে এক অনাত্মীয় ব্যক্তির স্ত্রী। অতএব সে যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিবে (কিংবা সে মরে যাবে) তখন তাকে বিয়ে করতে কোন দোষ নেই।[৭৬]

---

৭৩ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১১২-১১৩
৭৪ আল-কুর'আন, আন- আনফাল, ৮ : ৭৫
৭৫ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৩
৭৬ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

রহিতকরণে আল-কুর'আনের প্রায়োগিক নির্দেশনা

আরব সমাজে পালক পুত্র ব্যবস্থা ছিল আবহমানকাল থেকে প্রচলিত একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রথা। এমনকি পালক পুত্র তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পরও ঐ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা পালক পিতার জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ বিবেচনা করা হত। সেই সময়ে এই সামাজিক প্রথা কারো দ্বারা লংঘন হওয়ার ঘটনা বিরল। আল-কুরআন সর্বপ্রথম বর্বর যুগের এই কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে সুরা আল আহযাবের ৪ ও ৫ নং আয়াত দ্বারা খণ্ডন করেছেন। কিন্তু এত দীর্ঘদিন ধরে যে কৃত্রিম পদ্ধতি আরব সমাজে প্রচলিত ছিল তা শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা বা অন্য কারো মাধ্যমে এ পদ্ধতি উৎখাত করা সম্ভব ছিল না । আল্লাহ তা'য়ালা শুধু কথা ও নির্দেশ দ্বারাই এ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন সম্ভব বলে যথেষ্ট মনে করেননি। তাই এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বয়ং রাসূলে করিমকে (স.) আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ প্রদান করেন।[৭৭] রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তারই পালক পুত্র যায়েদ ইব্ন হারেস (রা.) এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে আরবের এতকালের প্রচলিত প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি মুসলিম সাহাবীদের ছিল অবিচল বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ ও সুগভীর আস্থা। রাসূলুল্লাহ (স.) এর পূত পবিত্রময় চরিত্র এবং তাঁর আজীবন সত্যবাদিতার এক নযিরবিহীন ইতিহাসের কারণে মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক যয়নাবকে স্বীয় স্ত্রীত্বে বরণের ঘটনাকে সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। ফলে পরবর্তীতে এ ধরনের বিয়েকে কোন মুসলিমই আপত্তিকর মনে করেন নি।[৭৮] এই কারণে পরবর্তীকালে এই আয়াতের প্রভাবে মুসলিমগণ এই কৃত্রিম প্রথাকে আর কোনদিন চালু হতে দেয়নি, যদিও প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় দত্তক প্রথা রহিত করা নিয়ে বেশ কিছু হৈচৈ হয়েছে এবং ইসলামের শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (স.) কে নানা অপবাদ দিয়ে দোষারোপ করতে কুণ্ঠিত হয়নি এবং একইভাবে আজো তারা দোষারোপ করে চলেছে।

দত্তক প্রথা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি অমুসলিম লেখকদের মনগড়া উক্তি ও এর জবাব

মহানবী (স.) আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত যায়নাবকে (রা.) নিজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার পর তৎকালীন আরব জনগোষ্ঠী মহানবি (স.) ও তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্ম নিয়ে নানারকম কুৎসা, কানাঘুষা, ও অপবাদের ঝড় প্রবাহিত করতে লাগল। কারণ সেই সমাজের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যায়নাব হচ্ছে মুহাম্মদ (স.) এর পোষ্যপুত্র যায়েদের স্ত্রী, তাই তাঁর জন্য পুত্রবধূকে বিয়ে করা কোনমতেই হালাল নয়। তারপর উক্ত ঘটনার রেশ এমনি এমনি শেষ হয়ে যায় নি। মোনাফেক ও মোশরেকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুসলিম নামধারী কতিপয় ব্যক্তি এ প্রচারণায় শরীক হলো যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন, এমনিভাবে যুগে যুগে ইসলাম বিদ্বেষী বিরোধিতাকারীরা ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তিরস্কার, অপবাদ

৭৭ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
৭৮ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

ও মনগড়া কিস্‌সা, কাহিনী রটনা করতে থাকে।[৭৯] Robert Roberts তার The social Laws of the Quran গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বেশ কিছু আপত্তিজনক অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেন, 'মহানবি (স.) প্রাচীন আরবের পালকপুত্র গ্রহণ প্রথা ব্যবস্থাকে রহিত করার যুক্তিসঙ্গত কারণ অনুভব করেছিলেন এবং তিনি বাস্তবিকই উক্ত প্রথাটি বাতিল করলেন। কিন্তু আমরা দেখি যে, তিনি এই প্রথা বাতিল করলেন তাঁর অনুসারীদের স্বার্থে নয় বরং তাঁর নিজ লোভ চরিতার্থ করার জন্য। এই অপমানজনক ঘটনা নবীর জীবনে এতই উল্লেখযোগ্য ছিল যে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা নিষ্প্রয়োজন। যায়েদ বিন হারিসা (রা.) ছিলেন মুহাম্মদ (স.)-এর পালক পুত্র এবং তাঁর একান্ত অনুরাগী অনুসারী। তার স্ত্রী যয়নাব বিন জাহাশকে কোন এক উপলক্ষে নবি (স.) ঘোমটাবিহীন অনাবৃত চেহারায় দেখেছিলেন, তার রূপ সৌন্দর্য নবি (স.) এর উপর ভীষণভাবে ছাপ ফেলল। এটা শুনে যায়েদ তৎক্ষনাৎ তার মনিবের মনোতুষ্টি লাভের জন্য স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাহোক, মহানবি (স.) প্রথমে তার পালক পুত্রের বিচ্ছেদী স্ত্রীকে বিবাহ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কারণ আরব প্রথায় তা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে নবি (স.) প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন, ফলে লোক নিন্দার ভয় তাঁর মন থেকে দূর হয় এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, পালকপুত্র গ্রহণ কোন প্রাকৃতিক সম্পর্ক গঠন করে না'।[৮০]

Robert Roberts এর উক্তির জবাব

রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি Robert Roberts এর মনগড়া উক্তির জবাব নিম্নরূপ:

১। Robert Roberts তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন দলিলিক প্রমান দাঁড় করাননি কিংবা তার কোন প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। তার বক্তব্য ভিত্তিহীন, ঐতিহাসিক ঘটনার নিরিখে বিভ্রান্তিমূলক, মনগড়া, উদ্দেশ্যমূলক ও বিদ্বেষপ্রসূত ও এক পেশে। বরং তিনি এ সকল বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর মহিমান্বিত চরিত্রকে কলংকিত করার জন্য এক ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। ফলে তার উক্ত গবেষণা কর্মটির বস্তুনিষ্ঠতা যেমনভাবে নষ্ট হয়েছে, সেই সাথে এর গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ।

২। Robert Roberts প্রথমে একটি গল্পের প্লট এভাবে সাজালেন, কোন এক ঘটনা উপলক্ষে মহানবি (স.) তার পালিত পুত্রের স্ত্রীকে ঘোমটা ছাড়া দেখে ফেলেন এবং জয়নবের সৌন্দর্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর ভীষণ ছাপ ফেলে। এই কথা শুনে যায়েদ তার ত্রানকর্তার মনোতুষ্টির জন্য স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। Robert Roberts এর উক্তির প্রেক্ষিতে তিনটি প্রশ্নের অবতারণা হয়। ১ম প্রশ্ন Robert Roberts এখানে বলেন নি, কোন্ ঘটনায় বা কোন স্থানে, কোন প্রসঙ্গে, কখন রাসূলুল্লাহ (স.) যয়নাবকে ঘোমটা ছাড়া অনাবৃত চেহারায় দেখেছেন ? ২য় প্রশ্ন যয়নাবকে

৭৯ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৮০ Robert Roberts , *The Social Laws of The Quran* (Delhi : Kitab Bhavan, 1977) , p. 50

দেখার পর তার সৌন্দর্যের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.) এর মনের অবস্থা কীরূপ ছিল তা Robert Roberts কীভাবে নিরূপণ করলেন? যেখানে মহানবি (স.) নিজে কোন ব্যক্তির নিকট তা ব্যক্ত করেননি। ৩য় প্রশ্ন এই ঘটনা শুনে যায়েদ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, যায়েদ কার নিকট হতে যয়নাবের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাল লাগার বিষয়টি অবগত হলেন

উক্ত তিনটি প্রশ্নে জবাব এড়িয়ে গিয়ে Robert Roberts হযরত যয়নাব (রা.) এর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পূত-পবিত্র মহান চরিত্রে কালিমা লেপনের ভ্রান্ত চেষ্টা করেছেন। যয়নাব (রা.) এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবাহের ঐতিহাসিক ঘটনাটি কীভাবে এবং কী প্রক্রিয়ায় ঘটল তার একটি অনুপঙ্খ বিবরণ প্রদান জরুরী। হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে আজাদ করেন ও পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। যয়নাব (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর আপন ফুফু উমাইয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালেবের কন্যা। তার পিতা ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ কুরাইশ বংশের আছাদিয়া গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত নেতা যার নাম জাহাশ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে হযরত যয়নবও পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৮১] পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশে যয়নাব (রা.) প্রথমে মক্কা হতে আবিসিনিয়ায় এবং তার কিছুদিন পর আবিসিনিয়া হতে মদীনায় হিজরত করেন।[৮২] হিজরতের পর মহানবি (স.) স্বয়ং তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেন।[৮৩] হিজরী ৪র্থ সনে যায়েদের সাথে মহানবি (স.) তার আপন ফুপাত বোন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এর বিয়ে দেন। তাদের এ বিয়ের স্থিতিকাল ছিল মাত্র এক বছর। এ সময়ে স্বামী স্ত্রীর মাঝে তেমন বনিবনা ছিল না। বিভিন্ন অসুবিধার কারণে যায়েদ যয়নাবকে (রা.) তালাক দেন। বিবাহ বিচ্ছেদের কয়েক মাস পরে ৫ম হিজরীর শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত যয়নাব (রা.) এর শুভ সাদী মোবারক সুসম্পন্ন হয়।[৮৪] যেহেতু হযরত যয়নাব (রা.) ছিলেন মহানবি (স.) এর আপন ফুপাতো বোন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মদীনাতে অবস্থান করছিলেন, সর্বোপরি পর্দার আয়াত সে সময় পর্যন্ত নাজিল হয়নি। তাই মহানবি (স.) আপন ফুপাতো বোনকে স্বচক্ষে ভালভাবে অবলোকন এবং তার রূপ সৌন্দর্য পূর্বেই দেখে থাকবেন এটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ সূরা নূর-এ বর্ণিত পর্দার আয়াত নাজিল হয় ৫ম হিজরির শেষের দিকে।[৮৫] আর

৮১ আল্লামা শিবলি নু'মানী, *সীরাতুন নবী (স.)* (অনু. এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী, ঢাকা : দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯০), খ.২,পৃ. ৮৪৪

৮২ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৪

৮৩ Fida Husain Malik , *Wives of Muhammad* (Lahore: Shaikh Ghulam Ali & Sons,1952), p. 121

৮৪ আল্লামা শিবলি নু' মানী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮৪৫

৮৫ প্রাগুক্ত।

যায়েদের সাথে হযরত যয়নাবকে মহানবি (স.) বিয়ে দেন হিজরি ৪র্থ সনে এবং এই বিবাহ মাত্র এক বছরের মত স্থায়ী ছিল। তাই কোন এক ঘটনা উপলক্ষে মহানবী (স.) যয়নাবকে ঘোমটা ছাড়া অনাবৃত চেহারায় দেখেন এবং তার সৌন্দর্য তাঁর মনে ভীষণ ছাপ ফেলে, Robert Roberts এর এ উক্তি ঐতিহাসিকভাবে অসত্য ও কল্পিত।

২। তাছাড়া মহানবি (স.) যয়নাবকে যায়েদের সাথে বিবাহ দেয়ার পূর্বেই তিনি নিজেই তাকে বিবাহ করতে পারতেন।[৮৬] কিন্তু মহানবি (স.) হযরত যয়নাবকে (রা.) হযরত যায়েদ (রা.) এর সাথে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব প্রদান করেন, কিন্তু যয়নাব (রা.) এবং তার ভাই প্রথমে রাসূল (স.) এর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেননি। এ প্রসঙ্গে একটি আয়াত নাজিল হয়,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

 ‘আল্লাহ ও তার রাসুল (স.) কোন কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীকে কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করলে এ ব্যাপারে তাদের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ নেই। (অর্থাৎ নিজ ইচ্ছানুযায়ী করা বা না করার অধিকার নেই)। এরপরও যারা আল্লাহ তা‘য়ালা ও তাঁর রাসুলের (স.) কথা অমান্য করে, সে স্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হয়’।[৮৭]

উক্ত আয়তের শানে নুযূল হল, যায়েদ বিন হারেসা (রা.) যৌবনে পদার্পনের পর মহানবি (স.) নিজ ফুপাতো বোন যয়নাব বিনতে জাহাশকে (রা.) তার নিকট বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব পাঠালে তিনি ও তার ভাই আব্দুল্লাহ (রা.) এই সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চেয়ে (যায়েদের) অনেক শ্রেষ্ঠ, যেহেতু যায়েদের সাথে দাসত্বের কালিমা বিজড়িত ছিল।[৮৮] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে যায়নাবের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু যায়নাব তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখালেন ও বললেন, ‘আমি মর্যাদার দিক দিয়ে ওর থেকে উত্তম’ তখনই আল্লাহ তা‘য়ালা উক্ত আয়াতটি নাজিল করলেন। এমনি করে মোজাহেদ, কাতাদা, ও মোকাতেল ইবনে হায়্যান বলেন, যখন মহানবি (স.) তার মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ ইবন হারিসার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন এ আয়াতটি

৮৬ Fida Husain Malik , p. 121
৮৭ আল-কুর’আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৬
৮৮ মুফতী মুহাম্মদ শফী, খ. ৭, পৃ. ১৫৮

যায়নাব বিনতে জাহাশ সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল। তিনি রাজি হননি, পরে রাজি হয়েছিলেন।[৮৯] ইবনে কাসির একটি রেওয়াতে বর্ণনা করেন, যখন যায়নাব (রা.) এর সাথে যায়েদ ইবনে হারেসার বিয়ে হয়, এতে তিনি (যায়নাব) ও তাঁর ভাই অসন্তুষ্ট হলেন ও বললেন, 'আমরা তো চেয়েছিলাম, রাসুলুল্লাহ (স.) নিজেই বিয়ে করবেন, কিন্তু তিনি তাঁর একজন দাসের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।'[৯০] বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বলেন, এই ঘটনার পরই এই আয়াত নাজিল হয়, 'আল্লাহ ও রাসুল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে দেন, তখন সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার কোন অধিকার কোন মুমিন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের নেই'।[৯১]

অতএব, উপরোক্ত শানে নুযূল বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণ হয় যে, মহানবি (স.) তাঁর পালক পুত্রকে আরবের শ্রেষ্ঠ, রূপসী ও সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে আপন ফুপাতো বোনের নিকট বিয়ে দেন অনেকটা যায়নাব (রা.) এর অমতেই। কিন্তু এর পেছনে রাসুলুল্লাহ (স.) এর গভীর অন্তদর্শন ছিল। এক কথায় বলা যায় যে, এই বিয়ে আরবদের বংশ, অহংকার, গোত্রীয় ভেদাভেদ, ও বিদ্বেষকে দূরীভূত করার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।[৯২] যায়েদ (রা.) ছিলেন দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন মানুষ।

একজন স্বাধীন মানুষের পূর্ণ ও সমমর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে এবং তৎকালীন আরব সমাজে শ্রেণি বৈষম্যের যে শেকড় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রথিত ছিল, মহানবি (স.) হযরত যায়নাবকে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যায়েদের (রা.) হাতে তুলে দিয়ে এই শ্রেণি বৈষম্যের মূলে আঘাত হানেন, অধিকন্তু হযরত যায়েদ (রা.) ক্রীতদাস হওয়ার কারণে এ অসম গোত্রীয় দাম্পত্য বন্ধন ছিল আরবদের মাঝে আল-কুরআনের সাম্যের ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার পথে এক যুগান্তকরী পদক্ষেপ।[৯৩]

মহানবি (স.) কেন হযরত যয়নাবকে (রা.) নিজ স্ত্রীর মর্যাদার অধিষ্ঠিত করলেন তা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.) এর সাথে হযরত যয়নাব (রা.) এর দাম্পত্য জীবন কেমন কেটেছিল? তাদের উভয়ের দাম্পত্য জীবন প্রায় এক বছর কোন মতে জোড়াতালি দিয়ে টিকেছিল।[৯৪] বিয়ের পরপরই হযরত যয়নাবের সাথে হযরত যায়েদের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্রম অবনতি ঘটে।[৯৫] যায়েদ বিন হারেসা (রা.) যায়নাবের সাথে তার দাম্পত্য সম্পর্কের তিক্ততা, অসস্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন ও তাদের দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে বারবার নিজের অক্ষমতার অভিযোগ মহানবি (স.) এর

৮৯ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৮৫
৯০ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৮৫
৯১ প্রাগুক্ত।
৯২ প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৯২
৯৩ প্রাগুক্ত।
৯৪ আল্লামা শিবলি নু' মানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৪
৯৫ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

নিকট এসে উত্থাপন করেন।[৯৬] যেহেতু যায়নাব (রা.) ব্যক্তিত্বে, বংশমর্যাদায়, রূপ লাবন্যে আরবের শ্রেষ্ঠ নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তাই তিনি সময়ে অসময়ে হযরত যায়েদকে (রা.) তিক্ত ভাষায় তার দাসত্বের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন। এমনকি তিনি স্বামীর সেবা করতেন না বরং স্বামীই তার সেবা করতেন।[৯৭] যায়নাব (রা.) এর ব্যবহারে হযরত যায়েদ (রা.) অতিষ্ঠিত হয়ে মহানবি (স.) এর নিকট পারিবারিক কলহের বিষয়টি তুলে ধরলে মহানবি (স.) বলেন أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ 'তুমি তোমার দাম্পত্য বন্ধনকে অটুট রাখো এবং আর আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় কর।' সূরা আল-আহযাবের ৩৭ নং আয়াতে এই প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

আর (সেই সময়টুকু স্মরণ করুণ) যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যায়েদ ইবনে হারেছকে আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীন থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, আর আপনি স্বীয় অন্তরে সেই কথা গোপন রাখলেন। আল্লাহ যার প্রকাশকারী ছিলেন এবং আপনি মানুষ (এর দুর্নাম করা) কে ভয় করছিলেন। আর আল্লাহই হচ্ছেন অধিকতর যোগ্য যে, আপনি তাকে ভয় করবেন; আতঃপর যখন তার (যয়নবের) প্রতি যায়েদ বিতৃষ্ণ হয়ে গেল (অর্থাৎ যয়নবকে তালাক প্রদান করল), তখন (ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর) আমি আপনার সাথে তাকে (যয়নবকে) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম, যেন মু'মিনদের জন্য তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে কোন সঙ্কীর্ণতা না থাকে, যখন তারা (পোষ্যপুত্রগণ) তাদের প্রতি বিরাগী হয়ে যায় (অর্থাৎ তালাক প্রদান করে) ; আর আল্লাহর এই বিধান কার্যকরী হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভাবি।[৯৮]কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ করার যে নির্দেশ মহানবি (স.) দিলেন তা পছন্দ করলেন না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে মহানবি (স.) কে একথা পূর্বেই জ্ঞাত করেন যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যায়নাবকে (রা.) তালাক দিবেন, অতঃপর হযরত যায়নাব (রা.) হুজুর পাকের (স.) এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন।

মহানবি (স.) ওহীযোগে পূর্বের আলোচ্য ঘটনাটি অবগত হওয়ার বিষয়টি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হাকেম, তিরমিযি, ইবনে আবি হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দেসিন হযরত আলী বিন হুসাইন যয়নুল আবেদীনের বর্ণনা থেকে নকল করেছেন এভাবে, আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবিকে (স.) একথা ওহীর

৯৬ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৯৩
৯৭ Fida Husain Malik, Ibid, p. 121
৯৮ আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৭

মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন যে, হযরত যায়েদ অনতিবিলম্বে হযরত যায়নাবকে তালাক দিবেন, অতঃপর যয়নব মহানবি (স.) এর সাথে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হবেন।[৯৯] উক্ত ওহীযোগে মহানবিকে (স.) বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বেই অবগত করানোর পরও মহানবি (স.) বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশ না করে যায়নবকে (রা.) নিজ বিবাহাধীন রাখার পরামর্শ আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেননি। তাই আল্লাহ তা'য়ালা মহানবি (স.) কে ভৎর্সনা করে বলেন, 'হে নবি আপনি আপনার মনে সেই কথা লুকিয়ে রাখেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন। আর আপনি মানুষকে ভয় পেতেন। (অর্থাৎ তাদের সমালোচনা ও দুর্নাম) আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন (ইমান আনার সুযোগ দিয়ে) এবং আপনি (হে রাসুল) যাকে অনুগ্রহ করেছেন (দাসত্ব মোচনের মাধ্যমে) সেই যায়েদকে যখন আপনি বলতেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর'। অথচ আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ সর্বাধিক। পরে তাঁর (যায়নাব) থেকে যায়েদে মন উঠে গেল, (অর্থাৎ আভ্যন্তরীন গরমিল ও বনিবনা না হওয়ার কারণে যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ইদ্দত ও অতিবাহিত হয়ে গেল) তখন আমি আপনাকে তার (যায়নাবের) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম যাতে মুমিনদের মনে মুখে-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের যখন তারা তাদের থেকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে নিয়ে ছেড়ে দিবে-বিয়ে করার ব্যাপারে কোনরূপ সংকোচ বা প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকে। আর আল্লাহ তা'য়ালার আদেশতো প্রকাশ পাওয়ারই ছিল।[১০০] ইবনে কাসির ইবনে আবি হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোক্ত বর্ণনা করেন, উপরোক্ত হাদিস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ ওহীর মাধ্যমে মহানবি (স.) কে জানিয়ে দেন যে, যয়নাবের সাথে যায়েদের দাম্পত্য জীবনের যবনিকাপাত ঘটবে, অর্থাৎ যায়দ তাঁকে তালাক দিবেন এবং পরে শরি'য়তের নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (স.) যয়নবকে নিজেই বিয়ে করবেন।[১০১] মহানবি (স.) আল্লাহ তা'য়ালার এ সিদ্ধান্ত জানার পরও দাম্পত্য জীবন অটুট রাখার ব্যাপারে যায়েদের পুনঃ পুনঃ অভিযোগ সত্ত্বেও মহানবি (স.) যায়নাবকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে যায়েদকে তিল পরিমাণও প্ররোচিত কিংবা উৎসাহিত করেননি। বরং নির্ভীক চিত্তে মহানবি (স.) যায়েদকে বলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজেই কাছে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর'।

এই ঘটনা প্রমাণ করে, 'মহানবি (স) এর মনোভাব জানার পরই যায়েদ তার ত্রানকর্তার মনোতুষ্টির জন্য তৎক্ষনাৎ যয়নাবকে তালাক প্রদান করেন' Robert Roberts- এর এই উক্তিটি কল্পিত এবং উক্তিটি আল-কুর'আনে বিধৃত যায়নাব ও যায়েদের দাম্পত্য জীবনে ঘটনার পূর্বাপর ধারাবাহিক বিন্যাসের সাথে মিল বা খাপ খায় না। কারণ হযরত যায়েদ (রা.) দাম্পত্য জীবনের তিক্ততা প্রায় এক বছর পর্যন্ত ধৈর্যের

৯৯ আল্লামা আবুল ফজল শিহাবুদ্দিন আছ-ছাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী, *রুহুল মা'আনী* (মিশর: দারুল হাদীস ২০০৫), খ.৭, পৃ. ১৬৪; আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

১০০ আল-কুর'আন,আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৭

১০১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, খ. ২, পৃ. ১৬৪

সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। এমনকি মহানবি (স.) এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলেও মহানবি (স.) তাতে কর্ণপাত করেননি। বরং তিনি বলেন, 'নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর'। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করার অর্থ তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে যে, স্বামীর প্রতি যয়নাবের অবজ্ঞা চরম আকার ধারণ করায় যয়নাবের যে অধিকারসমূহ স্বামীর উপর পালন করা কর্তব্য ছিল তা পালনে যায়েদ যেন কোন প্রকার শৈথল্য প্রদর্শন না করে।[১০২] পরবর্তীতে যায়েদের যখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তখন যায়েদ যয়নাবকে তালাক প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে ফিদা হোসাইন মালিক লিখেন, 'One day when he was very badly treated, he divorced Zaynab in a fit of anger'.[১০৩] অর্থাৎ একদিন যখন যায়েদ প্রচণ্ডভাবে যয়নব কর্তৃক অপব্যবহারের শিকার হন, তৎক্ষনাৎই যায়েদ রাগের বশে যয়নাবকে তালাক প্রদান করেন। যায়েদ কর্তৃক যয়নাবকে (রা.) তালাক প্রদান এবং পরবর্তীতে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক মহানবি (স.) এর সাথে যয়নাবের বিবাহ সংঘটনের বিষয়টি চমৎকারভাবে আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই মহানবি (স.) ওহীর মাধ্যমে যয়নাবের সাথে যায়েদের বিচ্ছেদ এবং পরবর্তীতে মহানবি (স.) এর সাথে যয়নাবের বিয়ে সংঘঠিত হওয়ার ঘটনাটি মহানবি জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইতস্তত করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ মহানবি (স.) এর এই ইতস্ততভাবকে প্রকাশ করে দেন এভাবে, 'আপনি মনের কোণে ইতস্তত এমন একটি বিষয় গোপন করে রেখেছিলেন, যা আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ করে দিবেন। আপনি লোক নিন্দার ভয় করছিলেন অথচ আল্লাহ তা'য়ালাকেই অধিকতর ভয় করা উচিত'।[১০৪]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এই বিষয়টি প্রকাশ করে দেন। হযরত যয়নাব তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর যয়নাবকে বিয়ে করার বিষয়টি মহানবী (স.) গোপন করেন এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.) বলেন, "যদি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর উপর নাজিলকৃত আল-কুর'আনের কোন আয়াত গোপন করতেন, তবে অবশ্যই এ আয়াতটি গোপন করতেন।[১০৫] ইসলামের শত্রুরা কিছু তাফসির গ্রন্থে বর্ণিত জাল, মিথ্যা, কাল্পনিক বর্ণনা উদ্ধৃতি করে মহানবী (স.) এর সুমহান চরিত্রকে কালিমাযুক্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ প্রসঙ্গে যে বর্ণনাটি প্রাচ্য বিশারদরা (Cook Taylor, Slotart প্রমুখ) উদ্ধৃত করেন তা হল, 'রাসূল (স.) একদা যায়িদ বিন হারিসা (রা.) এর বিবাহিত স্ত্রী যয়নবকে দেখলেন, তখন তিনি যয়নাবের প্রেমে পড়লেন এবং বলে উঠলেন, আল্লাহ পবিত্র। যিনি অন্তরের পরিবর্তনকারী- এই কথাশুনে যয়নাব বিষয়টি

---

১০২ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৬৩
১০৩ Fida Husain Malik , Ibid, p. 122
১০৪ আল-কুর'আন, আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৭
১০৫ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, *তাফসীর ইবনে কাসীর* (অনু. ড. মুহাম্মদ মজীবুর রহমান, ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশনস কমিটি), খ. ১৫, পৃ. ৮০৫

যায়েদকে অবহিত করলেন, অতঃপর যায়েদ যায়নাবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, রাসূল (স.) তাকে বললেন, তুমি তাকে তোমার বিবাহধীনেই রাখ, তখনই মহানবিকে (স.) ভৎর্সনা করে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।[১০৬]

উপরোক্ত বর্ণনাটি সর্বৈব মিথ্যা, এতে কোনরূপ শুদ্ধতা নেই, যেমন আবু বকর আল-আরাবি তার রচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেন, উপরোক্ত মিথ্যা বর্ণনা উক্ত সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রত্যাখান হয়। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতের মাধ্যমে জানালেন যে, 'অতিসত্ত্বর তিনি প্রকাশ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ (স.) গোপন করেছেন' এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত আয়াত দ্বারা কী প্রকাশ করলেন? আল্লাহ তা'য়ালা কী যয়নাবের প্রতি রাসুল (স.) এর ভালাবাসা ও প্রেম প্রকাশ করলেন, না যায়নাবকে বিয়ে করার জন্য মহানবি (স.) এর উপর আল্লাহ তা'য়ালার যে অলঙ্ঘনীয় আদেশ, যে আদেশের পশ্চাতে রয়েছে সুমহান, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য কলা-কৌশল, উপকারিতা আর তা হচ্ছে অজ্ঞতার যুগে অতি প্রাচীনকাল হতে চলে আসা দত্তকপ্রথার প্রচলিত রূপকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা। এই সুমহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নাজিল করলেন, যায়েদ যয়নাব হতে তার প্রয়োজন পূরণ করে নিল, আমি স্বয়ং তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম। যাতে করে সাধারণ মুমিনদের জন্য মুখে ডাকা পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করতে কোন অসুবিধা ও ঝামেলা না থাকে।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমা পাঠ করলে একজন মূর্খ ব্যক্তিও মহানবী (স.) এর উপর এরূপ মিথ্যা আরোপ করবে না যে, তিনি তাঁর সহচরের স্ত্রীর প্রতি স্বীয় ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। একজনের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার অভিযোগ আরোপ মহানবি (স.) এর সুমহান চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচার ও বাস্তব বিরোধী বটে। এ প্রসঙ্গে আলী বিন হোসাইন (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে ছিলেন যে, নিশ্চয়ই আপনার সাথে আমি যয়নাবকে (রা.) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাব, অথচ বিষয়টি আপনি আপনার অন্তরে গোপন করেছেন যা আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ করে দিলেন।[১০৭] Robert Roberts নিজেই স্বীকার করেছেন যে, পালকপুত্র যেহেতু আপন পুত্র নয় তাই দত্তক গ্রহণ বিয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে Robert Roberts সূরা আল-আহযাবের ৪ নং আয়াতটি উল্লেখ করেন,

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

১০৬ Fida Husain Malik, Ibid, p. 122
১০৭ মোহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুস তাফসীর* (কায়রো : দারুস সাবুনী, ১৯৮৯), খ.২, পৃ. ৫২৭

'আল্লাহ তা'য়ালা কারো বুকে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই এবং তোমাদের সেই স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যেহার (তোমাদের মায়ের সাথে তুলনা করে) করে থাক তাদেরকে তোমাদের প্রকৃত মা বানিয়ে দেন নাই এবং তোমাদের পালকপুত্রকে তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র বানিয়ে দেননি। এটা শুধু তোমাদের মৌখিক বাক্য; (এ ব্যাপারে) সত্য কথা যা, (তা তো) আল্লাহ তা'য়ালাই বলেন, এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে পালকপুত্র বলে স্বীকৃতিদাতাগণের পুত্র বলো না, বরং এরূপ পালক পুত্রদের তোমরা তাদের (প্রকৃত) পিতার পরিচয়েই ডাকো, এটাই আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে অধিক ন্যায় সঙ্গত'।[১০৮] প্রত্যেক মানুষের একটি মাত্রই সত্তাও ব্যক্তিত্ব থাকে, একটিমাত্র মন ও বিবেক থাকে, একটাই আকীদা ও আদর্শ যাকে, জীবন সম্পর্কে একটি মাত্র ধারণা ও বিশ্বাস থাকে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও মূল্যবোধের জন্য একটাই মানদণ্ড থাকে। আর তার আকীদা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত চিন্তাধারাই সকল অবস্থায় তার সমস্ত কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুটো অন্তকরণ সৃষ্টি করেননি।[১০৯]

Robert Roberts উক্ত আয়াতের অর্থ করেছেন, 'একজন পালক পিতা তার পালক পুত্রের প্রতি এরূপ স্নেহ ভালবাসা থাকতে পারে না, যেরূপ স্নেহ ভালবাসা প্রকৃত পিতা সন্তানের প্রতি থাকে'।[১১০] সুতরাং যায়েদ কর্তৃক যায়নাবকে তালাক প্রদানের পর আল্লাহর নির্দেশক্রমে যায়নাবকে রাসূলুল্লাহ (স.) বিয়ে করবেন, এ ব্যাপারটি গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ (স.) যায়েদকে যয়নাবের সাথে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখার পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।[১১১] তাই আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক যয়নবকে (রা.) বিয়ে করার ব্যাপারটি গোপন করা পছন্দ করেননি। কিন্তু তাই আল্লাহ তা'য়ালা বিষয়টি গোপন না করে জনসম্মুখে সরাসরি প্রকাশ করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করলেন,

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

'অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করল, তখন আমিই (স্বয়ং আল্লাহ) তোমার সাথে তাকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করলাম। যাতে করে মুমিনের পালক পুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য বন্ধনছিন্ন করলে তাদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে আর কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে'।[১১২] আল্লাহ তা'য়ালা যখন ঘটনা পরস্পরায় মহানবিকে (স.) যায়নবের (রা) সাথে দাম্পত্য বন্ধন সৃষ্টির নির্দেশ প্রদান করলেন, তখন যায়েদের তালাক প্রদানের পরই চূড়ান্ত পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স.) যয়নবকে (রা.)

---

১০৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, খ. ১৬, পৃ. ১৯২
১০৯ আল-কুর'আন,আল-আহযাব, ৩৩ : ৪
১১০ Robert Roberts , Ibid, p.50
১১১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৯২
১১২ আল-কুর'আন,আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৭

বিয়ে করলেন। এ ব্যাপারে রাসুল (স.)ও যয়নব কেউ কোন ইতস্ততা অনুভব করেন নি, এমন কী তারা দুঃশ্চিন্তায় ও পতিত হন নি যে, সমাজের আবহমানকাল থেকে প্রচলিত এ কুসংস্কারকে বর্জনের পর পরিস্থিতি কি হবে ?[১১৩] রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্তরের ইতস্তভাব এজন্য যে, কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) জানতেন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যখন তিনি বিয়ে করবেন তখনই তিনি সমাজের সাধারণ শ্রেণির কঠিন বিরোধিতা ও সমালোচনা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের সম্মুখীন হবেন। ফলে যায়েদ (রা.) যখন বারবার দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতার অভিযোগ মহানবি (স.) এর নিকট উত্থাপন করেন, তখন মহানবি (স.) নির্ভীক চিত্তের তার সহচরের দৃষ্টিভংগীর মোকাবেলা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মনে মনে আল্লাহর ওহীর এ নির্দেশকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমাজের আবহমানকালের এ প্রথার বিলুপ্তি ও সমাজের অন্ধ কুসংস্কার বর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল।[১১৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল-কুর'আন দত্তক প্রথাকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। প্রাচীনকালের প্রথা অনুযায়ী পালকপুত্র কখনোই আপন পুত্রের পদমর্যাদা পাবে না। তাই পালকপুত্রের তালকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে ইসলামী শরি'য়তে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রাচীন আরব সমাজের শিকড়ে কথিত দত্তক প্রথা ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক রীতিনীতিকে প্রয়োগিকভাবে বিলুপ্ত করেন। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স.) পালকপুত্র যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশ (রা.) আপন স্ত্রীর পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত করে বংশধারার রক্তকে পবিত্র করে পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, কদর্যতা থেকে মুক্ত করেন। অথচ Robert Roberts এর মত কতিপয় অমুসলিম লেখকগণ আল-কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক আইনের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে অনেক স্থানেই মনগড়া ধারণার (Surmise & Conjecture) আশ্রয় নিয়েছেন। কোন কোন স্থানে তাদের বক্তব্য একপেশে, খাপছাড়া, বিদ্বেষমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অনুমিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কোন কোন বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবে ও বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে অসত্য।

---

১১৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৯৩
১১৪ প্রাগুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যভিচার সংক্রান্ত আইন

◊ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারের শাস্তি

◊ পাশ্চাত্য আইনে ব্যভিচারের স্বরূপ

◊ মাক্কী সূরাসমূহে ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশাবলী

◊ বিধি-বিধান প্রণয়নে আল-কুর'আনের অভিনব রীতি-পদ্ধতি

◊ আল-কুর'আনে ব্যভিচারের শাস্তি

◊ হদ ও তাজীর এর পরিচয়

◊ অবিবাহিতদের ব্যভিচারের চূড়ান্ত শাস্তি

◊ বিবাহিতদের ব্যভিচারের শাস্তি

◊ ব্যভিচারের আইনগত সংজ্ঞা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন

◊ ব্যভিচারের অপবাদের দণ্ড

◊ অপবাদ আরোপ হারাম

◊ অপবাদ আরোপকারীর ইহকালীন শাস্তি

◊ অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখান

◊ অপবাদ আইনের দর্শন

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যভিচার সংক্রান্ত আইন

নারী ও পুরুষ পরস্পরে একমাত্র বৈধ বিবাহের মাধ্যমে তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করবে এবং পরিবার নামক সমাজ সংগঠন গড়ে তুলবে–এটাই আল কুর'আন স্বীকৃত বৈধ যৌনাচারের উৎকৃষ্টতম পন্থা। বৈধ বিবাহ নামক সর্বপ্রাচীন সমাজ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মহৎ ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর। নবাগত শিশুর জন্ম দানের মাধ্যমে মানব বংশধারার বিকাশ, সংরক্ষণ, স্বামী ও স্ত্রীর 'পিতা মাতা' নামীয় সামাজিক পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়া, শিশুর সর্বোত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের মানব সম্পদে পরিণত করা, পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালন ইত্যাদি লক্ষ্য ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের প্রচীনতম সংগঠন পরিবার একটি সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়ায়। আল-কুর'আন পরিবারের এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা, যিনা-ব্যভিচারকে চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি যিনা-ব্যভিচারের কঠিনতম শাস্তির বিধান প্রবর্তন করে তা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে কঠোরভাবে বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারের শাস্তি

প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থে যিনা হারাম বা নিষিদ্ধ বিবেচিত হলেও এর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হওয়া সম্পর্কে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম এবং আইন-বিধানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ও বিরোধ দেখা যায়। যেসব সমাজ মানব প্রকৃতির নিকটবর্তী থেকেছে তাদের সকলেই যিনা অর্থাৎ নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে চিরদিন একইভাবে একটি অপরাধ মনে করছে এবং এজন্য কঠিনতম শাস্তিও নির্ধারণ করেছে। কিন্তু ধর্মহীন সভ্যতার পংকিলতায় সমাজ ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে যিনা সম্পর্কে সমাজের আচরণ দুর্বলতর হয়। এই ব্যাপারে একটি বড় রকমের যে শৈথিল্য করা হয়েছে তা এই যে, 'নিছক যিনা' (Fornication) এবং 'পরস্ত্রীর সাথে যিনা' (Adultery) এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে প্রথমটিকে একটি 'অতি নগণ্য ভুল' এবং কেবল শেষোক্তটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন আইন-শাস্ত্রে 'নিছক যিনা'র যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তা এই, 'কোন পুরুষ, সে অবিবাহিত হোক কি বিবাহিত- এমন কোন নারীর সাথে যৌন সঙ্গম করে যে নারী অপর কোন পুরুষের স্ত্রী নয়'। এই সংজ্ঞায় পুরুষের অবস্থাকে হিসাবেই ধরা হয়নি, ধরা হয়েছে নারীর অবস্থা। নারী যদি স্বামীহীনা হয়, তবে তার সাথে যৌন সংগম 'নিছক যিনা'-পুরুষটির কোন স্ত্রী থাকুক আর না-ই থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। প্রাচীন মিশর,

বেবিলন, আসিরিয়া ও ভারতীয় আইন-বিধানে এর শাস্তি খুবই হাল্কা ধরনের সাব্যস্ত হয়েছে। গ্রীক ও রোমানরাও এই নিয়মকেই গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে ইহুদীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাইবেলে একে শুধুমাত্র এমন একটি অপরাধ বলা হয়েছে, যাতে পুরুষটির উপর শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ দানের বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হয়।[১]

'যাত্রা পুস্তকে' ব্যভিচারের দণ্ড

'আর কেউ যদি অবাগদত্তা কুমারীকে ভুলিয়ে তার সাথে শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়ে তাকে বিবাহ করবে। যদি সেই ব্যক্তির সাথে আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাকে রৌপ্য দিতে হবে'।[২]

আদি পুস্তক দ্বিতীয় বিবরণে ব্যভিচারের দণ্ড

যদি কেউ অবাগদত্তা কুমারী কন্যাকে পেয়ে তাকে ধরে তার সাথে শয়ন করে, ও তারা ধরা পড়ে, তবে তার সাথে শয়নকারী সেই পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ (শেকল) রৌপ দিবে, এবং তাকে মানভ্রষ্টা করেছে বলে সে তার স্ত্রী হবে; সেই পুরুষ তাকে যাবজ্জীবন ত্যাগ করতে পারবে না।[৩] অবশ্য যদি কেউ পুরোহিতের (Priest) কন্যার সাথে যিনা করে, তবে তার জন্য ইহুদী আইনে ফাঁসি দণ্ডের আর কন্যাকে জীবন্ত জ্বালিয়ে মারার ব্যবস্থা রয়েছে।[৪]

মনুর ধর্মশাস্ত্রে ব্যভিচারের দণ্ড

এতে লিখা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নিজের জাতের কুমারী কন্যার সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করবে, সে কোন শাস্তির যোগ্য নয়। কন্যার পিতা রাজি হলে সে তাকে বিনিময় দিয়ে বিবাহ করতে পারবে। অবশ্য কন্যা যদি উচ্চ বংশীয় হয় আর পুরুষটি নীচ বংশের, তা হলে কন্যাকে ঘর হতে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত আর পুরুষকে অঙ্গ কর্তনের দণ্ড দেয়া উচিত। এই শাস্তি জীবন্ত জ্বালিয়ে মারার দণ্ডে পরিবর্তিত করা যায় যদি কন্যা ব্রাহ্মণ হয়'।[৫]

মনু শাস্ত্রে আরো লিখা আছে 'কোন ব্রাহ্মণ মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ করলে বিচারক কেবল তার চুল মুণ্ডন ব্যতীত অন্য কিছুই করতে পারবে না। তবে অব্রাহ্মণ হলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কোন অচ্ছুত ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছিত করার জন্য যদি কোন অচ্ছুত হাত বা লাঠি প্রসারিত করে। তাহলে তার হাত

---

১ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কোরআন* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ঢাকা : খারইরুন প্রকাশনী

২ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা কর্তৃক অনুদিত, *পবিত্র বাইবেল*, *পুরাতন ও নূতন* (ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১), যাত্রা পুস্তক, ২২ অধ্যায় : ১৬-১৭ স্তোত্র, পৃ. ১১৮

৩ প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ অধ্যায় : ২৮-২৯ স্তোত্র , পৃ. ৩০৫

৪ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৭০-৭১

৫ প্রাগুক্ত।

কেটে ফেলা হবে।[৬] মূলত এসব আইনে পরস্ত্রীর সাথে যিনা করা ছিল আসল ও বড় অপরাধ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সে বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত হোক এমন কোন নারীর সহিত যৌন সংগম করে, যে অপরের স্ত্রী। এই কাজটির অপরাধরূপে গণ্য হওয়ার ভিত্তি এটা ছিল না যে, একটি পুরুষ ও একটি নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, বরং এর ভিত্তি এই ছিল যে, এই দু'জন মিলে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে এমন একটি সন্তানকে লালন-পালন করার বিপদে ফেলেছে যা তার নয়। অন্য কথায় যিনা অপরাধ নয়, অপরাধ হচ্ছে বংশ মিশ্রণের বিপদ; অর্থাৎ একের সন্তানের অপরের ব্যয় বহনে লালিত হওয়া ও যা তার উত্তরাধিকারী হয়ে পড়ার বিপদই হল আসল অপরাধ। কেবলমাত্র এই কারণে নারী ও পুরুষ উভয়ই অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে।[৭]

ইহুদী আইনে ব্যভিচারের দণ্ড

ইহুদি ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলে ব্যভিচারের দণ্ড সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে পবিত্র বাইবেল হতে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হল।

ক. 'আর মূল্য দ্বারা কিংবা অন্যরূপে মুক্ত হয় নাই, এমন যে বাগদত্তা দাসী, তার সাথে যদি কেউ সংগম করে, তবে তারা দণ্ডনীয় হবে, তাদের প্রাণদণ্ড হবে না, কেননা সে মুক্ত নয়'।[৮]

খ. 'আর যে ব্যক্তি পরের ভার্যার সাথে ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর ভার্যার সাথে ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিনী উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হবে'।[৯]

গ. কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সাথে শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সাথে শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হতে হবে'।[১০]

ঘ. 'যদি কেউ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পেয়ে তার সাথে শয়ন করে তবে তোমরা সেই দুই জনকে বের করে সকলে নগরদ্বারের নিকটে নিয়ে প্রস্তরাঘাতে বধ করবে, সেই কন্যাকে বধ করবে, কেননা, নগরের মধ্যে থাকলেও সে চিৎকার করে নাই এবং সেই পুরুষকে বধ করবে, কেননা, সে আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করেছে, এরূপে তুমি আপনার মধ্য হতে দুষ্টাচার

---

৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীরে ফী যিলালিল কোরআন* (অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ঢাকা : আল-কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), খ. ৪, পৃ. ১১৪

৭ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭২

৮ প্রাগুক্ত, লেবীয় পুস্তক, ১৯-২০ স্তোত্র, পৃ. ১৪৭

৯ লেবীয় পুস্তক ২০ : ১০, পৃ. ১৮২

১০ দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ : ২২, পৃ. ৩০৪-৩০৫

লোপ করবে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগদত্তা কন্যাকে মাঠে পেয়ে বলপূর্বক তার সাথে শয়ন করে, তবে তার সাথে শয়নকারী সেই পুরুষ মাত্র হত হবে, কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করবে না'।[১১]

খ্রিস্টান ধর্মে ব্যভিচারের দণ্ড

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) এর প্রচারিত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বাণী ভুল অর্থ করে যিনার অপরাধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণা তৈরি করে। তাদের মতে অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিত নারীর সাথে যিনা করে, তবে তা গুনাহ হবে; কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না। এই কাজের একপক্ষ সে নারীই হোক বা পুরুষ-যদি বিবাহিত হয় কিংবা যদি উভয়ই বিবাহিত হয়, তবে এটা অপরাধ হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে অপরাধে পরিণতকারী কাজটি আসলে যিনা নয়, বরং তা চুক্তিভঙ্গ। এই অপরাধের শাস্তি এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, ব্যভিচারী পুরুষের স্ত্রী নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের দাবি এনে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী লাভ করতে পারবে। যিনাকারী স্ত্রীর স্বামী একদিকে মামলা করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করতে পারবে এবং অপরদিকে যে পুরুষটি তার স্ত্রীকে নষ্ট করেছে, তার নিকট হতেও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এই 'দণ্ড' ও দুধারী তলোয়ারের মত। কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করে, তবে সে 'বিশ্বাসভঙ্গকারী' স্বামীর নিকট হতে তো মুক্তি লাভ করবে; কিন্তু খৃষ্টীয় আইনের দৃষ্টিতে সারাজীবন সে আর পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না– আজীবন অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হবে। অনুরূপ পরিণাম সেই পুরুষটির ভাগ্যেও ঘটবে, যে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করে ডিক্রি পাবে। কেননা খৃস্টীয় আইন তাকেও পুনর্বার স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দেয় না। এক কথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-ই আজীবন বৈষ্ণব হয়ে থাকতে প্রস্তুত হবে, সেই যেন নিজের জীবন সঙ্গীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ খৃষ্টীয় আদালতে পেশ করে।[১২]

রোমান আইনে ব্যভিচারেরে দণ্ড

রোমান আইনের মূলনীতি- শ্রেণি যতই নীচ হবে, শাস্তি ততোই কঠোর হবে। বলা হয়েছে কেউ যদি কোন সুশালীনা বিধবা অথবা সতী কুমারীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ে এবং সে যদি হয়ে থাকে উচ্চ বংশের, তাহলে তার অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, অপরপক্ষে যদি সে নিম্ন বংশের হয়ে থাকে, তাহলে তার শাস্তি হবে বেত্রাঘাত ও দেশান্তর।[১৩]

---

১১ প্রাগুক্ত, দ্বিতীয়বিবরণ, ২২ : ২৩-২৬, পৃ. ৩০৪-৩০৫
১২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৭৩-৭৪
১৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৪

পাশ্চাত্য আইনে ব্যভিচারের স্বরূপ

আধুনিককালে পাশ্চাত্য আইনের দৃষ্টিতে যিনা, ব্যভিচার দোষের, চরিত্রহীনতার বা গুনাহের কাজ যাই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তা দণ্ডযোগ্য অপরাধ নয়। বরং পাশ্চাত্য আইনে যিনাকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে তখনই বিবেচনা করা হয়, যখন তা বলৎকার হয়, জোরপূর্বক ধর্ষণ হয় যখন কোন নারীর ইচ্ছাকৃত সম্মতির বিরুদ্ধে জোরপূর্বক সঙ্গম করা হয়। এরূপ অবস্থায় যিনাকে ধর্ষণ নামে অভিহিত করা হয়। এবং উক্ত প্রকার ধর্ষণের জন্য ধর্ষিতাকেই মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্যান্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্য আইনে ব্যভিচার কোন আপত্তিজনক বা সমাজ বিরোধী কাজ নয় বরং তা আপত্তিকর কেবল স্বীয় স্ত্রীর নিকট, সে ইচ্ছা করলে আদালতের নিকট প্রমাণ পেশ করে কেবল তালাক দেয়ার অধিকারী ব্যভিচারী স্বামীর বিরুদ্ধে অন্য কোন শাস্তি সে দাবী করতে আইনগতভাবে হকদার নয়। অপরপক্ষে কোন বিবাহিত স্ত্রী যদি ব্যভিচারের অপরাধে দোষী হয়, তবে তার স্বামী শুধু স্ত্রীর বিরুদ্ধেই নয়, ব্যভিচারী পুরুষটির বিরুদ্ধেও অভিযোগ পেশ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে সে স্ত্রী হতে তালাক এবং ব্যভিচারী পুরুষের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নিতে পারে মাত্র।[১৪]

আল-কুর'আনে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

অশ্লীলতা থেকে মুসলিম সমাজকে পুতঃপবিত্র রাখার জন্য আল-কুর'আন ইসলামের সূচনা লগ্ন হতেই সব ধরনের অশ্লীলতাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম অপেক্ষা করেনি। বরঞ্চ সকল ধরনের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা হতে মুসলিম সমাজ মানসকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখার জন্য মহানবি (স.) এর মাক্কী জীবনে যিনা-ব্যভিচারসহ সকল ধরনের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞামূলক (Prohibitoy Instuctions) নির্দেশাবলী জারী করা হয়। পরবর্তীতে হিজরতের পর মহানবি (স.) এর হাতে যখন মদিনার রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চলে আসে তখন যিনা-ব্যভিচার, নরহত্যা ইত্যাদি ফৌজদারী অপরাধের শাস্তির বিধি-বিধান চূড়ান্তভাবে নাযিল হয়। পাশাপাশি এর সকল ধরণের উপায় উপকরণ, প্রচার প্রসারকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে বিবিধ আয়াত নাযিল হয়।

মাক্কী সূরাসমূহে ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশাবলী

যিনা-ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশাবলী সম্বলিত আয়াতসমূহ নাযিলের ক্রমধারা অনুযায়ী বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করলে যিনা, ব্যভিচারসহ সকল প্রকার অশ্লীলতার রূপরেখা ও এগুলো অবৈধ হওয়ার তাৎপর্য অনুধাবনের পাশাপাশি যিনা ও ব্যভিচার সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলোর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কার্যকারীতা ও যুগোপযোগীতা অনুভূত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত আয়াত বিশ্লেষণ করা হলো।

---

১৪ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৭৪

১। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[১৫]

২। সূরা আল-মু'মিনুন- এ হুবুহু একই শব্দ বিন্যাসে উপরোক্ত আয়াতটির পুনরুল্লেখ হয়েছে এভাবে

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

'নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদারগণ, যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা অর্থহীন কাজ হতে দূরে থাকে। যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর থাকে। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। নিজেদের স্ত্রীদের এবং দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া, এই ক্ষেত্রে (হিফাজত না করা হলে) তারা ভর্ৎসনা ও তিরস্কারযোগ্য নয়। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী'।[১৬] উপরোক্ত আয়াতদুটি যথাক্রমে সূরা আল-মা'আরেজ ও সূরা আল-মু'মিনুন এর অন্তর্ভুক্ত। সূরা আল-মা'আরেজ নাযিল হয় মহানবি (স.) এর মাক্কী জীবনের একেবারে শুরুর দিকে। তখনো হযরত উমর (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। অপর দিকে সূরা আল মু'মিনুন রাসূলে করীম (স.)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়।[১৭] উরওয়া ইবনে জুবাইর বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায়, এই সময় হযরত উমর (রা.) ঈমান এনেছিলেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারীর সুত্রে হযরত উমর (রা.)- এর এই কথা উদ্ধৃত করেছেন যে, 'এই সূরাটি তাঁর সামনেই নাযিল হয়। তিনি নিজে নবী করীম (স.)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার বিশেষ অবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহানবি (স.) বললেন, 'এইমাত্র আমার প্রতি দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মানদণ্ডে কেউ উত্তীর্ণ হলে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। অতঃপর তিনি এই সূরার প্রাথমিক আয়াত পড়ে শুনান।[১৮] এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব

১৫ আল-কুর'আন, আল-মা'আরেজ, ৭০ : ২৯-৩১
১৬ আল-কুর'আন, আল-মু'মিনুন, ২৩ : ১-৭
১৭ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৫
১৮ প্রাগুক্ত।

(রা.) নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের যিলহজ্জ মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯] আয়াতে বর্ণিত লজ্জা স্থান তথা যৌনাঙ্গকে সংযত রাখার অর্থ যিনা, ব্যভিচার, নারী-নারী মৈথুন (lesbean) অথবা পুরুষে-পুরুষে মৈথুনসহ (Homo sexuality) সর্বপ্রকার উলঙ্গপনা, নগ্নতাকে বুঝানো হয়েছে।[২০] 'লজ্জাস্থানের হেফাজত 'এর দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হচ্ছে নিজের দেহের লজ্জাস্থানসমূহ ঢেকে রাখা, নগ্নতাকে প্রশ্রয় না দেয়া এবং নিজের লজ্জাস্থানকে অপর লোকের সামনে প্রকাশ না করা। দ্বিতীয় অর্থ- মুমিনগণ নিজেদের পবিত্রতা ও সতীত্বকে রক্ষা করে অর্থাৎ যৌন ব্যপারে উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দেয় না। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে মুমিনগণ অবাধ ও বল্গাহীন হয় না। এ ব্যাপারে ইসলামের সীমারেখা সে কখনো লংঘন করে না।[২১] অত্র আয়াতে সুস্পষ্টভাবে যৌনাঙ্গ ব্যবহারের সঠিক পন্থা উচ্চারিত হয়েছে। তা হচ্ছে বিবাহধীন বৈধ স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীর সাথেই যৌন স্থাপন করা যাবে।[২২] এতদভিন্ন যৌনাচারের অন্য কোন পন্থা, কলা- কৌশল সম্পূর্ণরূপে হারাম।[২৩]

৩। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

'তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও এর উপর পেয়েছি, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি বলুন, আল্লাহ তা'য়ালা কখনো অশ্লীল কিছুর হুকুম দেন না, তোমরা কি আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো, যার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না'।[২৪] জাহেলী যুগে আরবের নারী ও পুরুষ উলংঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতো। কারণ তারা মনে করতো, যে কাপড় পরে তারা নানা প্রকার পাপ করেছে, সেগুলো পরে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা যায় না। এসব কুসংস্কারমূলক, মনগড়া নিয়ম-কানুন তারা বংশ পরম্পরায় পালন করে চলত। তারা বিশ্বাস করত এ সকল পথ, নিয়ম -কানুন আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। অত্র আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করছেন যে, পোশাকবিহীন লজ্জাজনক তাওয়াফ করার নির্দেশ তিনি কখনোই দিতে পারেন না। সীমালংঘনমূলক যে কোন কাজই লজ্জাজনক

---

১৯ মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম* (অনু. মীযান বিন হারুন, ঢাকা : দারুল হুদা কুতুবখানা, ২০১২), পৃ. ১৮০

২০ মোহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুস তাফসির* (কায়রো : দারুস সাবুনী ১৯৮৯), খ.২, পৃ. ১০৩

২১ সাইয়েদ আবল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১১

২২ বর্তমান যুগে যেহেতু দাস ব্যবস্থা বিশ্বের কোথাও চালু নেই। আন্তর্জাতিক আইনে মানুষ কেনাবেচা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ইসলামী শরি'য়তে মানুষকে দাসী বানিয়ে বিয়ে করা বর্তমানে সম্পূর্ণ হারাম।

২৩ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১

২৪ আল-কুর'আন, আল-'আরাফ, ৭ : ২৮

কাজ। আর নগ্নতা হচ্ছে সর্বোচ্চ লজ্জাজনক সীমালংঘনমূলক কাজ। সুতরাং এ ধরনের কাজ কোন অবস্থাতেই আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না।[২৫]

৪। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

'বলো, আমার প্রভু যেসব জিনিস হারাম করেছেন, তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ, প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও ন্যায়সঙ্গত নয় এমন বিদ্রোহমূলক কাজ'।[২৬] আলোচ্য আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে মাওলানা মওদুদী লিখেন, সূরা আল-'আরাফের আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে মনে হয় যে, সূরা আল-আন'আমের নাযিল হওয়ার সময়-কাল ঠিক তাই,।[২৭] সে হিসাবে আয়াতটি নাযিল হয় নবুয়াতের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ বছর। আলোচ্য আয়তটির মাধ্যমে সর্বপ্রথম সব ধরনের প্রকাশ্য ও গোপনীয় নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৫। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'আপনি বলুন এসো আমি তোমাদের ঐ সকল বিষয়গুলো পড়ে শোনাই- যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন' তা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কোন কিছুকে শরীক বা অংশীদার স্থির করো না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, কেননা আমিই তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার যোগাই। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবনকে মর্যাদাবান করেছেন তাকে কখনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার'।[২৮] আলোচ্য আয়াতটি নবুয়তের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বছর নাযিল হয়।[২৯] আয়াতটির শানে নুযুল, জাহিলি যুগের আরব সমাজে তাদের ফসল, জীবজন্তু ও সন্তানাদিকে ঘিরে নানারকম ধ্যন-ধারণা, কুসংস্কার ও রীতি প্রথার প্রচলন ছিল। যেমন উৎপন্ন ফসল ও পশু সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করে একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে অপর অংশ তাদের মনগড়া দেবদেবীর জন্য

---

২৫ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৮৯
২৬ আল-কুর'আন, আল-'আরাফ, ৭ : ৩৩
২৭ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫
২৮ আল-কুর'আন, আল-আন'আম, ৫ : ১৫১
২৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪১

নির্দিষ্ট করা, ধর্মীয় পুরোহিতদের উৎসাহ প্রেরণায় সন্তানদের হত্যা করা, গোপনে এবং প্রকাশ্যে যেকোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া কিংবা কিছু নির্দিষ্ট পশু ও ফসল ভোগ করাকে নিজেদের জন্য হারাম ঘোষণা করা ইত্যাদি নানারকমের মনগড়া কুপ্রথার অসারতা সূরা আল-আন'য়ামে ১৩৬-১৩৯ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তৎপর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন, মুশরিক নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কী কী অকাট্যভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন তার সার- নির্যাস একটি মাত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপিত হয়েছে।[৩০] ঘোষণাটির মাধ্যমে আরব মুশরিক-কাফিরদেরকে এই আমোঘ সত্য জানান দেয়া হয় যে, আইন রচনার সার্বভৌম ক্ষমতা বিশ্বজগতের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার, অন্য কারো নয়।

৬। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ لَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'এবং ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না। এবং আল্লাহ তা'য়ালা যে প্রাণকে মর্যাদাবান করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া ঐ প্রাণকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এবং যারা ঐ সকল কাজ করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে'। ইবনে জারীর, ইমাম রাফী, যাহ্হাক, ইবনে মুযাহিম ও মুকাতিল, ইবনে সুলাইমান প্রমুখের মতে এই সূরাটি সূরা আন-নিসার আট বৎসর পূর্বে নাযিল হয়। সেই হিসাবে সূরা আল-ফুরকানের অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য আয়াতটি মহানবি (স.)-এর মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়।[৩১]

আয়াতটির শানে নুযূল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মুশরিকদের কতগুলো লোক রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আগমন করে, যারা বহু হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচার করেছিল। তারা বলে, হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি যা কিছু বলেছেন এবং যে দিকে আহ্বান করেছেন তা সবই উত্তম ও সত্য। কিন্তু আমরা যে সব

---

৩০ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮
৩১ সাইয়েদ আবল আ'লা মওদুদী , প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৫

পাপকার্য করেছি সেগুলোর ক্ষমা আছে কি ? ঐ সময় সূরা আল-ফুরকানের ৩৯-৫৩ নম্বর আয়াত নযিল হয়।[৩২]

আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের একটি চিত্র অংকন করে আরবের মুশরিক জনগণের সামনে পেশ করা হয়েছে। এ আয়াতে শিরক, বিনা কারণে নরহত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের অত্যন্ত জঘন্য পাপকার্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩৩]এখানে বলা হয়েছে যে, মুমিনগণের অন্যতম নৈতিক গুণ- তারা হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচার করে না। মুমিনগণ ব্যভিচারকে পাপ (sin) মনে করে। ব্যভিচারকে পাপ মনে করার অর্থ হচ্ছে একটি নিষ্কলুষ ও নির্মল জীবন বেছে নেয়া। যে জীবনের অধিকারী ব্যক্তিরা স্থূল পাশবিক কামনা বাসনার অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে এবং বিপরীত লিঙ্গের সাথে মিলনের মাঝে একটি উচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে বলে তারা বিশ্বাস করে। এই উদ্দেশ্য অবশ্যই স্থূল উপায়ে ও পাশবিক পন্থায় যৌন পিপাসা নিবারণের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।[৩৪] শিরক ও যিনা, হানাহানি হতে মুমিনদের হৃদয় ও মনকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিরত রাখাই আলোচ্য আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য। উক্ত আয়াতে শিরক, ব্যভিচার ও হত্যাকাণ্ড- এ তিনটি অপরাধের বিরুদ্ধে প্রায় এক সাথে নিষেধাজ্ঞামূলক আইন (Probihitory Law) জারী করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি অপরাধই হত্যাকাণ্ড বিশেষ। প্রথমটি অর্থাৎ শেরক হচ্ছে মানুষের ফেতরাত তথা সহজাত বিবেক, মন ও মনীষাকে হত্যা করার শামিল। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ব্যভিচার সমাজ ব্যবস্থাকে হত্যা করার শামিল আর তৃতীয়টি অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষকে বধ করা সকল মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল।[৩৫]

ব্যভিচার সমাজ ব্যবস্থাকে হত্যা করার শামিল

ব্যভিচারের মধ্যে একাধিক হত্যা কাণ্ড সংঘঠিত হয়ে থাকে। প্রথমত এতে জীবনের উপাদান বীর্যকে তার অযোগ্য স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যভিচারী নর-নারী সন্তান হতে অব্যাহতি পেতে চায়। সেটা ভ্রুনহত্যার আকারেই হোক অথবা গর্ভপাতের আকারে। যদি সন্তানকে ভূমিষ্ট হবার সুযোগ দেয়াও হয় তবে সেটা হয় দুষ্কর্মর কিংবা লাঞ্ছনা-গঞ্জনাময় জীবনের আবির্ভাব। মানব সমাজে একটি জারজ সন্তানের জীবন যেভাবেই হোক, ব্যর্থ ও নিস্ফল জীবনে পর্যবসিত হয়ে থাকে। আকারে কিছুটা ভিন্নতর হলেও এটাও একটা হত্যাকাণ্ড। সমাজ তার বংশ পরিচিতি হারিয়ে বসে, আসল ও নকল রক্ত মিশে একাকার হয়ে যায় এবং সন্তান ও সম্পদের বিশ্বস্ততা বিনষ্ট হয়। এভাবে সমাজ ক্রমান্বয়ে সমস্ত

---

৩২ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, *তাফসীর ইবনে কাসীর* (অনু. ড. মুহাম্মদ মজীবুর রহমান, ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি), খ. ১৫, পৃ. ২৮৬

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৫, খ. ১০

৩৪ প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৩৬

৩৫ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬৮

সম্পর্ক-বন্ধনসহ বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরিবারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিলুপ্তির পথে দ্রুত ধাবিত হয়। অন্যকথায় এটা সমাজের অপমৃত্যুর শামিল।কেননা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার এই সহজ বিকল্প পথ দাম্পত্য জীবনকে নিষ্প্রোয়োজন ও ঐচ্ছিক ব্যাপারে পর্যবসিত করে। পরিবার হয় অবাঞ্ছিত বোঝা। অথচ পরিবারই হলো, স্বাভাবিক ও সৎ সন্তানের সুতিকাগার। পরিবারের নির্মল পরিবেশ ছাড়া অন্য কোথাও তার সুষ্ঠু বিকাশ বৃদ্ধি এবং নিখুঁত লালন, প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই।[৩৬]

প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার ব্যাখ্যা

আল-কুর'আনে ব্যবহৃত فواحش (ফাওয়াহেশ) শব্দটি সকল প্রকার সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য খারাপ কর্যকলাপকে বুঝায়। আল কুর'আনে যিনা-ব্যভিচার, সমকাম, নগ্নতা ও অশ্লীলতা মিথ্যা দোষারোপ ও পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাকে فحوش (ফুহুস) বা অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীসে চুরি,মদ্যপান ও ভিক্ষাবৃত্তিও অশ্লীল কাজের অন্তর্ভুক্ত। এমনভাবে অপরাপর লজ্জাজনক কাজও এই শ্রেণীর কাজের অন্তর্ভুক্ত এবং আল-কুর'আনের ঘোষনা এই যে, এই ধরনের কাজ না প্রকাশ্যে করা যাবে, না গোপনে।[৩৭]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, যিনা- ব্যভিচারে গোপনে লিপ্ত হওয়াকে তৎকালীন মুশরিকগণ খারাপ মনে করত না, কিন্তু তারা প্রকাশ্যে তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), সুদ্দি, দাহ্হাক প্রমুখের মতে, প্রকাশ্য ফাহেশা হলো যিনা আর অপ্রকাশ্য ফাহেশা হলো المخالة কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য অশ্লীলতা হলো অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের কাজ আর অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা হলো অন্তকরণের কাজ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সব ধরনের পাপ কাজ পরিত্যাগ করা।[৩৮] 'ফাওয়াহেশ' অর্থ সকল প্রকারের অশ্লীলতা ও বড় বড় কবীরা গুনাহ হযরত মুজাহিদ (র.) এর মতে 'ফাওয়াহেশ' হচ্ছে যিনা এবং এটাই গোপনীয় অশ্লীলতা অপরদিকে বস্ত্রহীন দেহে কাবা ঘর তাওয়াফ করা প্রকাশ্য অশ্লীলতা।[৩৯] 'ফাহেশা' শব্দের আভিধানিক অর্থ সীমা অতিক্রমকারী কাজ।

অনেক সময় 'ফাহেশ' শব্দ দ্বারা শুধু ব্যভিচার বোঝায়। অত্র আয়াতে ব্যভিচার অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত। কেননা এখানে বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজের বিবরণ দেয়া হয়েছে। ব্যভিচারও এসব নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের অন্যতম। আয়াতে 'ফাওয়াহিশ' শব্দটি বহুবচন। এর দ্বারা ব্যভিচারের কাছাকাছি যত প্রকার বেহায়ামি ও

---

৩৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৯৭
৩৭ সাইয়েদ আবল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৬১
৩৮ শাইখ আবু আলী আল-ফজল বিন আল-হাসান আল-তিবরিসি, *মাজমাউল বয়ান* (বৈরুত : মানসুরাতে দারি মাকতাবাতুল হায়াত, ১৯৮০), খ. ৩, পৃ. ২৩১
৩৯ শাইখ আবু আলী আল-ফজল বিন আল-হাসান আল-তিবরিসি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮

অশ্লীলতার কাজ রয়েছে-তার সব প্রকারই বুঝানো হয়েছে। যেমন মেয়েদের রূপ ও সাজ-সজ্জার প্রদর্শনী করে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো, শরীরের গোপনীয় স্থান তথা সতর খোলা, অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল কথাবার্তা, অশ্লীল ইংগিত,অশ্লীল চালচলন, অশ্লীল হাসিঠাট্টা, উত্তেজনাকর সাজসজ্জা, উত্তেজনাকর ও নির্লজ্জতার বিস্তার ঘটানো- এসব হচ্ছে সর্ববৃহৎ অশ্লীলতা, ব্যভিচারের ভূমিকা স্বরূপ। এসব অশ্লীলতার মধ্যে কিছু গোপনীয়, কিছু প্রকাশ্য। কিছু থাকে মনের গহীনে লুকানো এবং কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশিত। এসবই পরিবার ও সমাজের ভিত্তি ধ্বংস করে, মানুষের বিবেক মনকে কলুষিত করে এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে হীনতা ও নোংরামি এনে দেয়।

এসব অশ্লীলতা যেহেতু বৃহত্তর অশ্লীলতার প্ররোচনা দেয় তাই এগুলোর ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে অপকর্মের উপকরণগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া যায় এবং ইচ্ছাশক্তি ও সংযম শক্তিকে দুর্বলকারী আকর্ষন থেকে রক্ষা করা যায়। ইসলাম মানুষের বিবেক, স্নায়ুমণ্ডল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আবেগ অনুভূতিকে পাপের স্পর্শমুক্ত রাখতে চায়। তাই ইসলাম আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অশ্লীল গল্প কবিতা, নাটক, কৌতুক,কথাবার্তা, নগ্নতা, অশ্লীলতার প্রদর্শনী, অশ্লীল সিনেমা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যাবতীয় প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে যৌনতার উদ্দামতাকে উস্কে দেয়ার মত যাবতীয় অশ্লীলতাকে অপরাধ সংগঠিত হবার পূর্বেই সমূলে উৎপাটিত করতে চায়।

৭। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

'তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা এবং খুব বেশি নিকৃষ্ট পথ'।[৪০]

আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়কাল নবুওয়াতের দশম বছর ঠিক হিজরতের পূর্বে।[৪১] আয়াতে বর্ণিত 'কাছেও যেয়ো না' অর্থ জিনার প্রাক্কালীন কার্যাবলী এবং জিনা সহজ ও সম্ভব করে যে কার্যাবলী, তাও হতে দিয়ো না, তোমরা নিজেরাও তা করবে না।[৪২] ইসলাম প্রারম্ভেই ব্যভিচারের সকল ছিদ্র পথ বন্ধ করতে চায়। একারণে ইসলাম ব্যভিচারে প্ররোচনাকারী উপকরণগুলোর পথ রোধ করে, যাতে তাতে লিপ্ত হবার আশংকা দেখা না দেয়। উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো ব্যভিচারের দিকে টেনে নিয়ে যায় এমন সব কার্যকলাপ, যথা অশ্লীল দৃষ্টি, স্পর্শ, চুমু ইত্যাদি থেকে দূরে থাকো। আয়াতটির প্রারম্ভেই না

৪০ আল-কুর'আন, বনী ইসরাইল, ১৭ : ৩২
৪১ মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৬
৪২ মওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২৩৯

বোধক শব্দ উল্লেখের মধ্যমে এই গর্হিত কাজের নিকটবর্তী হওয়ার উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, এতে লিপ্ত হওয়াতো দূরের কথা।[৪৩]

ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিন নারীগণ হতে শপথনামা গ্রহণ

মদিনা রাষ্ট্রে কিছু মুমিন নারীগণ আশ্রয় প্রার্থী হতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (স.) যে সকল শর্তে তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথনামা গ্রহণ করেন, তা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

‘হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুণ এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুণ। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।[৪৪]

আয়াতটির শানে নুযূল

মোহাজের মহিলাদের সম্পর্কে এ বিধান নাযিল হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধির পর। হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে।[৪৫] এ চুক্তি সম্পাদনের পর পরই যখন হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তার সাহাবাগণ হুদায়বিয়া প্রান্তর হতে চলে আসছিলেন সেই মুহুর্তেই কয়েকজন মুমিন মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে এসে তাদের কাছে হাজির হলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র মদীনায় যাওয়ার জন্য আশ্রয়প্রার্থী হলেন। তাদের ব্যাপারে ফয়সালা প্রদান করে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। [৪৬] আলোচ্য আয়াতটি যদিও মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত তথাপিও মাক্কী সূরার আদলে আলোচ্য আয়াতে মুহাজির নারীদের কাছ থেকে ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। যেহেতু এ সকল আশ্রয়প্রার্থী মুমিন নারীরা ছিল নও মুসলিম, তাই শরি‘য়তের প্রাথমিক হুকুম- আহকাম মেনে চলার বিষয়ে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহনের প্রয়োজন অধিক ছিল।

---

৪৩ সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্‌হুস্‌ সুন্নাহ* (অনু. আকরাম ফারুকও অন্যান্য ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী,২০১৫), খ.২, পৃ. ৩২১; আফীফ আবব্দুল ফাত্তাহ্‌ তাব্‌বারা, *আল-খাতায়া ফি নজরিল ইসলাম* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩), পৃ. ১০৫

৪৪ আল-কুর'আন, আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১২

৪৫ মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫৪

৪৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১৭১

আশ্রয়প্রার্থী মুমিন নারীদের আত্মীয়-স্বজন 'হুদায়বিয়ার' সন্ধি-চুক্তির শর্তধারা অনুযায়ী তাদেরকে মক্কায় ফেরত দেয়ার দাবী জানালে মহানবি (স.) তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, সন্ধিচুক্তি হয়েছিল এ শর্তের ভিত্তিতে, 'মক্কা থেকে যদি কোন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় চলে যায় তবে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং মু'মিন নারীরা এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৭]

সূরা আল- মুমতাহিনায় বর্নিত আলোচ্য আয়াত এই শিক্ষা উপহার দেয় যে, ইসলামের নৈতিক চরিত্রের যা মূল্যমান, পৃথিবীর অপর কোন ধর্ম বা জীবন বিধানেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং বলা যায়, অন্য কোন মানবিক বিধানেই তার দৃষ্টান্ত নেই। এ কারণে রাসূলে করীম (স.) সব সময় নও মুসলিম নারীর নিকট থেকে ব্যভিচার, চুরি, সন্তান হত্যা, অপরের সন্তানকে নিজ গর্ভজাত সন্তান বলে দাবী করার মত সামাজিক নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার বিষয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন।

যৌন অঙ্গের অর্থনৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখা এবং যৌন অঙ্গকে খারাপ পথে ও অবৈধভাবে ব্যবহার না করা নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য অপরিহার্য বলে আল-কুরআন মনে করে। এ পবিত্র চরিত্র যারা গ্রহণ করবে, আর যেসব নারী- পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহকে স্মরণ করবে, বিশেষ করে যৌন অঙ্গের ব্যবহারের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন করবে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বড় ধরনের পুরষ্কারের ব্যবস্থা করেছেন। সূরা আল-আহ্যাবের ৩৫ নং আয়তে যৌন অঙ্গের হেফাযত করা ও বৈধ পথে তার ব্যবহার করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা গুরুত্বারোপ করেছেন, 'যারা নিজেদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে, তারা পুরুষ হোক কি স্ত্রীলোক, আর যারা খুব বেশী আল্লাহর স্মরণ করে, নারী কি পুরুষ, আল্লাহ তাদের জন্যে বহু বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৪৮]

বিধি-বিধান প্রণয়নে আল-কুর'আনের অভিনব রীতি-পদ্ধতি

আল-কুর'আনে বর্ণিত অশ্লীলতা ও যিনা, ব্যভিচারকে নিষেধাজ্ঞামূলক আয়াতসমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে আল-কুর'আনের ইসলামী আইন বিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতি ও এর দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক কার্যধারার সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। উপরোক্ত মাক্কি আয়াতসমূহে সব ধরণের অশ্লীলতাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যিনার অপরাধের ফৌজদারী আইনকে হৃদয়ে গ্রহণ করে তা মেনে চলার প্রতি মুসলিম সমাজ মানসকে তৈরি করা হয়েছে। সূরা আল-মা'আরেজ ও আল-মু'মিন- মাক্কি এই দুটি সূরায় একই শব্দবিন্যাস, ভাব গাম্ভীর্যে 'লজ্জাস্থানের হিফাজতের' প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রায় একই সময়ে নাযিলকৃত আল-আন'আম ও আল-আ'রাফ এই দুটো সূরায় সব ধরণের প্রকাশ্য ও

---

৪৭ মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬
৪৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ.৫৪

অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করে মুমিনদের হৃদয়, মন ও আত্মাকে কলুষমুক্ত করা হয়েছে। তৎপর সূরা আল-ফুরকানে মুমিনদের গুণাবলির মধ্যে একটি অন্যতম গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষায় 'তারা (মুমিনগণ) যিনায় লিপ্ত হয় না'। সর্বশেষ সূরা বনী ইসরাইলে যিনা-ব্যভিচারের চূড়ান্ত শাস্তির বিধান নাযিলের অব্যবহিত পূর্বে যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাতে লিপ্ত হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। কোন আইনের স্থায়ী কাঠামো সুস্থির করার পূর্বে উক্ত আইনের ভিত্তিভূমি স্থাপনের এটি আল-কুর'আনের একটি অভিনব রীতি-পদ্ধতি। জাহেলী যুগের আরব সমাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও যিনা, ব্যভিচারের সয়লাব চলছিল। মহানবি (স.) তৎকালীন মুশরিকদের নিকট নবদীক্ষিত মুসলিম নর-নারীর চারিত্রিক গুনাবলী তুলে ধরেছেন অত্যন্ত মোহনীয় চিত্তাকর্ষক হৃদয়গ্রাহী ভাষায়- জীবনের সকল ক্ষেত্রে একক স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য বিনয়াবনত সালাত, আমানত রক্ষামূলক সামাজিক চুক্তি প্রতিপালনে ন্যায় নিষ্ঠতা, অর্থহীন কাজ হতে আত্মরক্ষা, প্রতিমূহর্তে পবিত্রতা ও শুদ্ধতার চর্চা, সেই সাথে স্ব-স্ব লজ্জাস্থানকে হিফাজত, নির্লজ্জতা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা পরিহার করে ব্যভিচার হতে বিরত থেকে মু'মিনগণ এ পৃথিবীতে যে শান্তির সৌধধারা রচনা করে এক স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণ করেছে তার প্রতি আলোকসম্পাত করে সমকালীন মুশরিকদের দৃষ্টি ও বিবেক জাগ্রত করার পাশাপাশি অনাগত মানব প্রজন্মকে উন্নত সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ার প্রতি এটি উদাত্ত আহ্বান। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সবধরণের অশ্লীলতা ও পাশবিকতাকে পদদলিত করে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে সমাজ সভ্যতার মূল স্তম্ভ পরিবার গঠনের প্রতি আল-কুর'আনের এই আহ্বান বিশ্বমানবতাকে উন্নত জীবনের হাতছানি দেয়।

আল-কুর'আনে ব্যভিচারের শাস্তি

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারের শাস্তি হদ হিসেবে নাযিল হয়নি। তখন ব্যভিচারের শাস্তির জন্য তা'জীর প্রচলিত ছিল। আল-কুর'আনে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান বর্ণনার পূর্বে হদ ও তা'জীরের সংজ্ঞা জানা আবশ্যক।

হদ ও তা'জীর এর পরিচয়

শাব্দিক বিশ্লেষণ : হদ শব্দটির বহুবচন হুদুদ। হুদূদ শব্দটি হদ শব্দের বহু বচন, যার শাব্দিক অর্থ- নিষেধ করা, এজন্য আরবরা বাউয়্যাব (দারোয়ান)- কে হাদ্দাদ বলে থাকে। কেননা সে প্রবেশ থেকে নিষেধ করে।[৪৯]

---

৪৯ সাইদ বিন আবী আল-রাজী, *মুখতার আল-ছিহাহ* (মিশর : বুলাকের আমেরিকা প্রেস, ১৯৮৩), পৃ. ৪৬২

ইংরেজি ভাষায় বলা হয় (obstruction) যার অর্থ রাস্তায় প্রতিরোধ হওয়া, রাস্তা বন্ধ করা, অগ্রগতি রোধ করা বা সরবরাহ নিষেধ করা, চলার পথে সমস্যা সমূহ, অন্তরায় করে রাখা।[৫০]

পারিভাষিক বিশ্লেষণঃ 'Hudud in islam is like a gatekeper who obstructs from entering. It expresses the correction and specified by laws on account of right of Allah'.[৫১]

অর্থাৎ ইসলামে হুদূদ হলো একজন প্রহরীর মতো যে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। হদ আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার হেতু তার অধিকারের ক্ষেত্রকে আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট করে।

আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার হেতু ইসলামী আইনের পরিভাষায় হদ হলো নির্ধারিত শাস্তি। ইসলামী শরি'য়তে এমন কতিপয় অপরাধের শাস্তিকে হদ বলে যা শরি'য়ত প্রণেতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

হদের প্রকার

হদ সাত প্রকার, যথাঃ যেনা বা ব্যভিচার; কাযাফ বা যেনার অপ্রমাণিত হওয়ার অভিযোগ; মদ্যপান করা; চুরি করা; সন্ত্রাস ও ডাকাতি করা; রিদ্দা বা মুরতাদ হওয়া; বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহীতা।

হদের বৈশিষ্ট্য

'হদ' মহান আল্লাহর অধিকার। এ শাস্তিকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রহিত করার ক্ষমতা রাখে না। এতে রয়েছে মানবমণ্ডলীর জন্য ব্যাপক কল্যাণ। হদের বৈশিষ্ট্য হল :

১. হদের শাস্তি অপরাধীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। তাকে এবং সমাজের অন্যান্য মানুষকে অপরাধ হতে বিরত রাখার জন্য। হদের শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে অপরাধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখার কোন সুযোগ নেই।

২. হদ নির্ধারিত ও অবধারিত শাস্তি। এর পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো এখতিয়ার কোন বিচারকের নেই। তিনি ইচ্ছা করলে এর পরিবর্তে অন্য শাস্তি ধার্য করতে পারবেন না।

৩. অপরাধের উৎসমূলে আঘাত করার জন্য এবং সমাজ থেকে অপরাধ কমিয়ে আনার জন্য হদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. হদ ক্ষমা করা যায় না।

৫. হদ আল্লাহ তা'য়ালার হক। শুধুমাত্র যেনার মিথ্যা অপবাদ বা কাযফকে কেউ কেউ বান্দার হক বলে অবহিত করেছেন।[৫২]

---

৫০ A. P. Cowie *Oxford Advanced Larners Dictonary of Current English* (Nework : Muthim press. 1993), p.254

৫১ Anwnr Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence* (Lahore: Rashidia Laibry, 1968) , p. 290

তাযীর-এর সংজ্ঞা

আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট এবং হদ্দ ও কাফফারা বহির্ভূত যেসব অপরাধের জন্য শরি'য়তে নির্দিষ্ট কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি, তাকে তাযীর (Discretionary punishment) বলে।[৫৩]

ব্যভিচারের শাস্তির প্রকারভেদ

ইসলামী আইনে যিনা বা ব্যভিচারের জন্য অবস্থাভেদে তিন ধরনের শাস্তি যে কোন একটি বা একাধিক নির্ধারণ করা হয়েছে। তা হল : ১. কশাঘাত করা ২. নির্বাসন ৩. কংকর নিক্ষেপে হত্যা করা। ব্যভিচারী বা যিনাকারীর শাস্তি ২ ধরনের :

ক. অবিবাহিতা যিনাকারীর শাস্তি একশত বেত্রাঘাত।

খ. বিবাহিত অবিবাহিতা যিনাকারীর শাস্তি কংকর নিক্ষেপে হত্যা করা ।

প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান হদ হিসেবে নাযিল হয়নি আল-কুর'আনের এই দু'আয়াতে ব্যভিচারের কোন নির্দিষ্ট 'হদ' বা শাস্তি বর্ণিত হয়নি, বরং শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাদেরকে যন্ত্রনা দাও এবং ব্যভিচারিণী নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ।[৫৪] তবে নির্যাতন নিপীড়নের মাত্রা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। ফলে যিনার শাস্তির বিধান ছিল তা'যীরি প্রকৃতির যা বাস্তবায়নের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহকে (স.)। সর্বপ্রথম সূরা আন- নিসার ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। আয়াত দুটি যথাক্রমে,

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জতার কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। 'আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দুই ব্যক্তি এ নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর; কিন্তু তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সদাচারী হয়, তবে তাদের

---

৫২ বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও বিজ্ঞান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২), খ.২, পৃ. ১৮৮-৯০

৫৩ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত

৫৪ মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), *তাফসিরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মহিউদ্দিন খান ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), খ.২, পৃ. ৩৭৮

হতে হাত গুটিয়ে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তওবা গ্রহণকারী, করুণাময়'।[৫৫] আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ইবনে কাসীর বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা কোন স্ত্রী লোকের অশ্লীলতা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে যেন গৃহের অভ্যন্তরে আটক রাখা হয় যতক্ষণ না আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন পূর্বের এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, সূরা আন-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণীর জন্যে এ নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা আন-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশত চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হয়।[৫৬] আলোচ্য আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বিশেজ্ঞগণের একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা:

ক) প্রথম আয়াতটির হুকুম বিবাহিত মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয় আয়াতটির হুকুম অবিবাহিতদের জন্য প্রযোজ্য। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, প্রথম আয়াতটির শুরুতে 'তোমাদের যেসব স্ত্রীলোক' বলে বিবাহিতদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে স্ত্রী অর্থ বিবাহিত স্ত্রী। ফলে এ আয়াত অনুযায়ী প্রথম দিকে বিবাহিতদের যিনার শাস্তি ছিল কয়েদ বা গৃহে অন্তরীণ অপরপক্ষে অবিবাহিতদের যিনার শাস্তি ছিল কথা ও ভয়-ভীতির সাহায্যে কষ্টদান। উক্ত আয়াত দুটিতে দু'ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, প্রথম শাস্তিটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর কঠোর। ফলে প্রথম শাস্তিটি বিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট আর দ্বিতীয় শাস্তিটি অবিবাহিতদের জন্য। ঠিক যেমন রজম ও বেত্রাঘাত। প্রথমটি কঠিন, দ্বিতীয়টি তার তুলনায় হালকা।[৫৭]

খ) হযরত মুজাহিদ (র) বলেন যে, এ আয়াতটি লাওয়াততের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।[৫৮] আবু মুসলিম ইস্পাহানি, কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী (র.) প্রমুখের মতে, প্রথম আয়াতে নারীতে নারীতে অবৈধ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে পুরুষে পুরুষে অবৈধ সম্পর্কের কথা।[৫৯] হযরত সুদ্দি (র) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঐ নব যুবকগণ যারা বিবাহিত নয়।[৬০]

গ) কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো প্রথম আয়াত নাসিখ বা রহিতকারী এবং দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে মানসুখ। আবার কেউ কেউ বলেছেন এই উভয় আয়াত দু'টির হুকুম মানসুখ বা রহিত হয়ে

---

৫৫ আল-কুর'আন, আন- নিসা, ৪ : ১৫-১৬
৫৬ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩১৩
৫৭ মুহাম্মদ বিন কুদামাহ্, *আল-মুগনি* (আল-রিয়াদ : মাকতাব আল-রিয়াদ, ১৪০১ হি.), খ.১, পৃ. ১৯৯
৫৮ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩১৪
৫৯ মুহাম্মদ বিন কুদামাহ , প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৯
৬০ ইমামুদ্দিন ইবেনে কাসীর প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৪

গিয়েছে সূরা আন-নূরে বর্ণিত এই আয়াত দ্বারা, 'যিনাকারী পুরুষ ও নারীর শাস্তি হলো একশতটি বেত্রাঘাত' ।[৬১]

ঘ) উক্ত আয়াত দু'টির প্রকৃত ব্যাখ্যা Robert Roberts বুঝতে ব্যর্থ হয়ে মন্তব্য করেন, 'As will be seen, the above verses are some what inconsistent, and far from easy to explain'.[৬২] অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতগুলো কিছুটা অসামঞ্জস্যশীল এবং ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। Robert Roberts তার উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে বলেন, আল্লামা যামাখশারী ও বায়জাভি মনে করেন আয়াতে বর্ণিত 'দুই ব্যক্তি' দ্বারা বিপরীতধর্মী লিঙ্গকে বুঝানো হয়েছে। অপরদিকে জালালাইন এর মতে এর দ্বারা পুরুষে পুরুষে সমকামিতা বুঝানো হয়েছে। Robert Roberts তিনি তিনটি কারণে জালালাইনের ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন বলে উল্লেখ করে লিখেন,

ক. দ্বিতীয় আয়াতে 'وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ' (তোমাদের মধ্য থেকে দুজন) উভয় শব্দে পুংলিঙ্গবাচক ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. এখানে শুধুমাত্র লঘুদণ্ডের বিধান আরোপ করা হয়েছে।

গ. দ্বিতীয় আয়াতের ঠিক পূর্ববর্তী আয়াতটিতে বর্ণিত নারীর শাস্তি ভিন্ন প্রকৃতির এবং অপেক্ষাকৃত কঠোর।[৬৩]

Robert Roberts' এর অভিমতের মূল্যায়ন

Robert Roberts আয়াতটির প্রেক্ষাপট ও উপযোগিতা অনুধাবন করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞজনের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

এক. আল কুর'আন মূলত মানব জীবনের জন্য আইন ও নৈতিকতার রাজপথ প্রস্তুত করে এবং সেই রাজপথে মানুষ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, আল্লাহর কিতাব কেবল সেই সব সমস্যারই সমাধান পেশ করে থাকে। অলিগলি ও পথের বাঁকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং তাতে যেসব আনুষাঙ্গিক ও খুঁটিনাটি সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা এই শাহী কালামের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। এসব বিষয়ের সমাধান ইজতিহাদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ঠিক এই কারণেই আমরা লক্ষ করি যে, পুরুষের অবৈধ সম্পর্কের শাস্তি কি হতে পারে, এই প্রশ্ন দেখা দিল, তখন সাহাবাদের মধ্যে কেউ একথা বলেননি যে, সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে এই সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে।[৬৪]

---

৬১ আল- মুগনী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৯
৬২ Robert Roberts, *The social Laws of the Quran* (New Delhi: kitab Bhavan, 1977) , p.37
৬৩ Ibid.
৬৪ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রগুক্ত, খ.২, পৃ. ৯৯

২. প্রথম আয়াতে শুধুমাত্র ব্যভিচারি নারীর কথা বলা হয়েছে। এখানে পুরুষের কোন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, অত্র আয়াতে ব্যভিচারী নারী বিবাহিত না অবিবাহিত এ প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয়নি। অতএব এটা প্রমাণিত যে, এখানে ব্যভিচারী নারীর কথাই বলা হয়েছে। সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক উভয় ক্ষেত্রেই এ অপরাধের শাস্তি নতুন বিধান নাযিল না হওয়া পর্যন্ত আমৃত্যু গৃহে অন্তরীণ।

৩. দ্বিতীয় আয়াতে পুরুষবাচক দুটো সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়েছে এবং উক্ত দুটো সর্বনাম দ্বারা পুরুষে-পুরুষে সমকামিতার অর্থ নেয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত ও ব্যকরণ সিদ্ধ নয়। কারণ উক্ত আয়াতটির সংযোগ পূববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু প্রথম আয়াত ব্যভিচারী পুরুষের ব্যাপারে নিশ্চুপ তাই অত্র দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত পুরুষবাচক দ্বিবাচনিক সর্বনাম দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়ই উদ্দেশ্য। তারা বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক। কেননা আরবী ব্যাকরণের একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হচ্ছে, 'তাগলিব' বা আধিক্যের নীতিতে যেখানে উভয় লিঙ্গ বুঝানো উদ্দেশ্য সেখানে পুরুষবাচক দ্বিবাচনিক সর্বনামই ব্যবহৃত হয়।[৬৫] এ প্রসঙ্গে হযরত ইকরামা (র), হযরত আতা (র.), হযরত হাসান বসরি (র.) প্রমুখের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রী।[৬৬]

৪. আবু বকর জাস্‌সাস (র.) বলেন, সূরা নিসার আয়াতে বিবাহিত ও অবিবাহিতা নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারিণীকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা ছিল একটি সাধারণ বিধান। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সকলের জন্যই একই অবস্থা।[৬৭] উক্ত আয়াত দুটির হুকুম সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পূর্বে কোন নারী যিনা করলে তাকে ঘরে আটক রাখা হতো। এ আটকাবস্থায়ই সে মরে যেত। তেমনি কোন পুরুষ যখন যিনার অপরাধ করত, তাকে লজ্জা দিয়ে পীড়ন করা হতো এবং জুতা দিয়ে মারা হতো। তারপর সূরা আন-নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়- 'যিনাকারী নারী ও পুরুষ এদের দুজনের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত করো'। তারা যদি বিবাহিত হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নত অনুযায়ী রজম করা হতো। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য এটাকেই পথরূপে নির্দিষ্টি করেছেন, এ পথেরই ইঙ্গিত ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছিল এ আয়াতে 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে যদি চারজন পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদেরকে তোমরা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত মৃত্যু

---

৬৫ শায়েখ আহমাদ মোল্লাজিউন, *তাফসিরাতি আহমাদীয়া* (ইউপি : আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি), পৃ. ১২৬; মুফতি মুহাম্মদ শফী প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮০

৬৬ তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৪

৬৭ আবু বকর আল- জাস্‌সাস (র.), *আহকামুল কুর'আন* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), খ. ২, পৃ. ৫০৩

তাদেরকে তুলে না নেয় কিংবা আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।[৬৮] প্রথমোক্ত আয়াতে নারীর কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, তাকে আটক রাখতে হবে। আর দ্বিতীয় আয়াতে পুরুষের সাথে নারীকেও একসাথে শাস্তি দেয়ার আদেশ করা হয়েছে, ফলে নারীর জন্য দু'টো শাস্তি ধার্য হলো- গৃহে অন্তরীণ ও নিপীড়ন, পুরুষের জন্য শুধুমাত্র নিপীড়ন।[৬৯] তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, কেন প্রথম আয়াতটিতে ব্যভিচারী পুরুষের কথা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র ব্যভিচারী নারীর শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে? এর জবাব, ব্যভিচারের মত এরূপ একটি অশ্লীল নির্লজ্জ কুকর্মে জড়িত হওয়া নারীর স্বেচ্ছাধীন সম্মতি ছাড়া কোন পুরুষের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তাই অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে ব্যভিচারী নারীকে গৃহে বন্দি করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উদ্দেশ্য এরা যেন পুনরায় সমাজে মিশে গিয়ে সমাজকে কলুষিত ও দূষিত করার বিন্দুমাত্র সুযোগ না পায়। এমনকি তারা যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারে এবং অন্য কোন প্রকার কর্ম তৎপরতায় জড়িত হতে না পারে।[৭০] এই সাময়িক বিধানের প্রয়োজন এই জন্য ছিল যে, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর ব্যভিচারী নারীর গর্ভস্থ সন্তানের আইনগত মর্যাদা (legal status) কী হবে তা নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

তা'যীরি শাস্তির বিধান

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান হদ হিসেবে নাযিল হয়নি আল-কুর'আনের এই দু'আয়াতে ব্যভিচারের কোন নির্দিষ্ট 'হদ' বা শাস্তি বর্ণিত হয়নি, বরং শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাদেরকে যন্ত্রনা দাও এবং ব্যভিচারিণী নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ।[৭১] তবে নির্যাতন নিপীড়নের মাত্রা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। ফলে যিনার শাস্তির বিধান ছিল তা'যীরি প্রকৃতির যা বাস্তবায়নের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহকে (স.)। যেমন হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ আল-কুর'আনের ভাষ্য 'তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর' এর ব্যাখ্যায় বলেন, গালমন্দ করা, অপমান অপদস্থ করা, এবং জুতা মারা।[৭২] সূরা আন-নিসার যিনার প্রাথমিক শাস্তির বিধান নির্ধারণ করার পর আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন, فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا 'অঃতপর যদি তারা উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তিদান করা থেকে বিরত থাক'। এখানে ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ যদি

---

৬৮ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.), *আবু দাউদ* (ঢাকা : মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ, তা.বি), হাদীস নং ৪৩৬৩

৬৯ আবু বকর আল- জাস্সাস (র.), প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫০৩

৭০ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৭৭

৭১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৭৮

৭২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৭

তওবা করে সংশোধন হয়ে যায় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, কাজ ও ব্যবহারে মৌলিক পরিবর্তনের ছাপ ফুটে উঠে তাহলে তাদের শাস্তি বন্ধ হয়ে যাবে। এ আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যিনার কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি 'হদ' আকারে নাযিল হয়নি।[৭৩]

যিনার সাময়িক শাস্তির মেয়াদের স্থায়ীত্ব

তৃতীয় হিজরীতে নাযিল হওয়া সূরা আন-নিসায় যদিও যিনা দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এটা আইনগত অপরাধ তখনো ঘোষিত হয়নি। বরং তখনো এটা সামাজিক ও পারিবারিক অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। সূরা আন-নিসার মধ্যে মুসলিম বিবাহিত স্ত্রীগণ কতৃক যিনা সংগঠিত হলে তার শাস্তি ছিল গৃহে অন্তরীণ। উক্ত বিধানটি ছিল সাময়িক। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই ঘোষণা করেন যে, আল্লাহর পক্ষ হতে চূড়ান্ত কোন বিধান না আসা পর্যন্ত এই আইনই বলবৎ থাকবে। এ ব্যাপারে একটি স্থায়ী নির্দেশ আসার কামনা করা হচ্ছিল। এটা কোন স্থায়ী চূড়ান্ত নির্দেশ নয় বরং তা হচ্ছে সমসাময়িক পরিবেশ ও পরিস্থিতির নির্দেশ। অতঃপর যিনার শাস্তির পূর্ণাঙ্গ বিধান সম্বলিত আয়াত নাজিল হয়। যার বর্ণনা সূরা আন-নূর এবং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মারফু হাদীসে এসেছে। অবশ্য অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে স্বাক্ষী, প্রমাণ সংক্রান্ত বিধানের পরিবর্তন হয়নি।[৭৪] হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) এর উপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো তখন তা তার উপর বড় ক্রিয়াশীল হতো এবং তিনি কষ্ট অনুভব করতেন ও তার চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেতো। একদা আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবী (স.) এর উপর ওহী অবতীর্ণ করেন। ওহীর সময়কালীন অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বলেন, তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য পথ নির্দেশ করেছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করে তবে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে, অতঃপর প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, আর অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে এবং এক বছর নির্বাসন দিতে হবে'।[৭৫] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মহানবি (স.) উপরোক্ত ঘোষণা সূরা নূরের আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষেই সাব্যস্ত করেছেন।[৭৬] যিনা, ব্যভিচারের উক্ত সাময়িক শাস্তির বিধানের মেয়াদ ছিল আড়াই, তিন বছরের মত। কারণ সূরা আন-নিসা হিজরী ৩য় সালে ওহুদ যুদ্ধের পর নাজিল হয়। অপরদিকে সূরা আন-নূর নাযিল হয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীতে।[৭৭] সূরা আন-নূর নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপটের সাথে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত আয়েশা (রা.) এর 'ইফক' এর ঘটনা

---

৭৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৭
৭৪ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৬
৭৫ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহীহ আল-মুসলিম* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি) হাদীস নং ১৬৯০; আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪৯০
৭৬ ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৪
৭৭ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৭৬

জড়িত। বনু মুস্তালিক যুদ্ধ সংগঠিত হয় পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে।[৭৮] আর ওহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয় তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে।[৭৯] এই হিসাবে যিনার শাস্তির অস্থায়ী বিধান প্রায় এক বছর নয় মাস বলবত ছিল। সূরা আন-নূরে বর্ণিত যিনার শাস্তি নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী যিনার আইনটি মানসুখ বা বাতিল হয়ে যায়। এটাই অধিকাংশ ভাষ্যকারদের মত। তবে সূরা আন-নিসার ১৫নং ও ১৬নং আয়াত দুটি মানসুখ বা রহিত আয়াত হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত আয়াতে নিজেই ঘোষণা করেছেন, أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন পথ-নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ব্যভিচারী নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখতে হবে। যা প্রমাণ করে যিনার এই শাস্তি ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী (temporary panalty) প্রকৃতির। অতএব কারণে অস্থায়ী বিধান সম্বলিত আয়াত দু'টিকে মানসুখ পরিগণিত করার কোন যুক্তি নেই।[৮০]

বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় যৌন স্পৃহা পূরণ করা যাবে না

উহুদ যুদ্ধের পর তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে সূরা আন-নিসা নাযিল হয়। ইতিপূর্বে উক্ত সূরার ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে যিনার অস্থায়ী শাস্তির বিধান বিধিবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে একই সূরার ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে বৈধ বিবাহ ব্যতিত অন্যান্য পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আয়াত দু'টি যথাক্রমে,

ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

'এবং নারীদের মধ্য সধবাগণ, (অর্থাৎ যাদের স্বামী রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম) কিন্তু তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী তারা ব্যতীত। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের (মোহর) বিনিময়ে অন্বেষণ করবে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য। ব্যভিচারের জন্য নয়'।[৮১]

খ) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

---

৭৮ মাওলানা সফিউর রহমান মুবারকপূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭
৭৯ https//en.wikipedia. org-wiki/Battle of Uhud, visited on 23/11/2018
৮০ শায়েখ আহমাদ মোল্লাজিউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৮১ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৪

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিবাহ করবে, আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সমতুল্য। সুতরাং তাদের বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর নিয়ম অনুযায়ী দিয়ে দাও। এই হিসাবে যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এই হিসাবে নয় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত প্রণয়ণী'।[৮২] উক্ত আয়াতে শরি'য়ত সমর্থিত পন্থা ব্যতিরেকে (অর্থাৎ মোহরানা ধার্য করা, সাক্ষী থাকা এবং বিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য না হওয়া ইত্যাদি) শুধু অর্থের বিনিময়ে যিনা, 'মুতআ' তথা খণ্ডকালীন বিবাহ ইত্যাদি সকল ধরনের অবৈধ পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চারিতার্থ করা সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 'মুহসিনিন' অর্থ ব্যভিচার হতে মুক্ত পবিত্রা নারী, সতী-স্বাধী নারী। মুহসিনিন অর্থ সৎ থাকা, পাপমুক্ত থাকা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা). বলেন 'আখদানুন' শব্দটি 'খিদনুন' শব্দের বহুবচন। অর্থ নারী বন্ধু, প্রণয়ী যার সাথে গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। কেননা মহান আল্লাহ প্রকাশ্য বা গোপনে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও ব্যভিচার পরিহার করতে নিষেধ করেছেন।[৮৩] আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে 'মোসাফেহীন' শব্দটি 'সিফাহুন' ধাতু হতে উদ্ভূত। অর্থ নীচুও ঢালু ভূমিতে পানি নিক্ষেপ করা। ব্যবহারিক অর্থে নারী ও পুরুষ যৌথভাবে জীবনের পানি ঢালবে। একটি জাতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সন্তান জন্ম দেয়া, তার প্রশিক্ষণ, লালন পালন এবং সংরক্ষণের মত কাজগুলো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা ঠিক যে ভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, অথচ তা না করে তারা জীবনের পানি ঢালা তথা যৌন স্বাদ আস্বাদন করবে এবং ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির কামনা বাসনা চারিতার্থ করবে এটা আল্লাহ তা'য়ালা চান না।[৮৪]

অবিবাহিতদের ব্যভিচারের চূড়ান্ত শাস্তি

পঞ্চম হিজরী মতান্তরে ৪র্থ হিজরীতে 'ইফক' এর ঘটনার অব্যবহিত পরে সূরা আন-নূরে অবিবাহিত নর-নারীদের ব্যভিচারের চূড়ান্ত শাস্তির বিধান নাযিল হয়। উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আমার নিকট থেকে তাদের সম্পর্কিত আল্লাহ তা'য়ালার বিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্যে যে পন্থা বাতলে দিয়েছেন তা হচ্ছে সে বিধানটি যা সূরা আন-নূরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

৮২ আল-কুর'আন, আন-নিসা , ৪ : ২৫
৮৩ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী , প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৮
৮৪ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৯

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে যদি তোমরা (প্রকৃতই) আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে'।[৮৫] অত্র আয়াতটিতে শুধুমাত্র অবিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি অকাট্যভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এই বিষয়ে সর্বযুগের ফকিহগণ একমত। অতএব এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো অবিবাহিত নারী কিংবা পুরুষের যিনার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। ড. হামিদুল্লাহ বলেন, 'এ বিধান হচ্ছে অবিবাহিত ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীদের জন্য। যদি তারা বিবাহিত হয় ? এ ব্যাপারে আল-কুর'আন মৌন। এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, পূর্ববর্তী শরি'য়তের বিধান আল্লাহ তা'য়ালা বহাল রেখেছেন, সে বিধানটি হচ্ছে প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড তথা রজম। ডক্টর মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ বলেন যে, 'এর কারণ এটাই বুঝা যায় যে, বিবাহিত লোকদের ব্যভিচার সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কিতাবেই রজম তথা প্রস্তাঘাতের মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সহীহ বুখারী প্রভৃতির ভাষ্য অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স.) ও এর প্রভাবান্তি বিশুদ্ধতার অনুমোদন করেছেন। সুতরাং তাওরাত ও ইঞ্জিলের যে সব বিধান সম্পর্কে আল-কুর'আন মৌনতা অবলম্বন করেছে, সেগুলো বহাল থাকবে। তাই ইসলামেও রজমের বিধান রাসুলুল্লাহ (স.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও ফকীহগণ বহাল বলে গণ্য করেছেন এবং কার্যকরী করেছেন।[৮৬]

বিবাহিতদের ব্যভিচারের শাস্তি

বিবাহিত নারী কিংবা পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি 'রজম' এ বিষয়ে ইসলামের সকল কালের সকল দেশের সকল মণীষীই সম্পূর্ণ একমত কেবল খাওয়ারিজরা ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ ভিন্নমত প্রকাশ করেনি। পাথর বর্ষণের দণ্ডের বর্ণনা অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর মারুফু ও কাউলি হাদীস তথা তাঁর কথা ও কাজ-উভয় দিক দিয়েই প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনও এই আইন কার্যকার করেছেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো উপস্থাপন করা হল,

১) হযরত উবাদাতা ইবনে সামিত (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর (অর্থাৎ বিধান বা ব্যবস্থা পত্র গ্রহণ কর) আল্লাহ ওদের

---

৮৫ আল-কুর'আন,আন-নূর, ২৪ : ২

৮৬ ড. হামীদুল্লাহ, *খুতবাতে বাহাওয়ালপুর* (পাকিস্তান : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৭ম সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ১৯৪

সম্পর্কে ব্যবস্থা জানিয়ে দিয়েছেন। অবিবাহিতদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের শাস্তি বেত্রাঘাত ও 'রজম'।[৮৭]

২) 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (স.) বলেছেন, তারা ইসলাম ত্যাগকারী 'এমন কোন মুসলিম ব্যক্তি নেই যে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতার মালিক নেই, এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল,তার রক্তপাত বা প্রাণদণ্ডাদেশ জায়েয নেই, তবে তিনটি কারণের যে তথা ইসলাম ত্যাগকারী কোন একটি কারণ ব্যতীত (১) প্রাণের বদলে প্রাণ হিসেবে (২) বিবাহিত ব্যভিচারী ও (৩) দ্বীনত্যাগী (মুসলিম) জামাতত্যাগী'।[৮৮] উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী লিখেন, এই হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করেছে প্রমাণিত হলে তাকে অবশ্যই রজম করতে হবে।

৩) হযরত উমর (রা.) হতে হযরত মুসায়িব (র.) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, উমর (রা.) মিনা হতে প্রত্যবর্তন করলেন। অতঃপর তিনি মদীনা চলে গেলেন। মদীনায় এসে তিনি উপস্থিত জনতার সামনে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, হে সুধীগণ! শরি'য়তের আদেশ এবং তোমাদের সামনে ফরজ আহকাম সমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রয়েছে। তোমাদেরকে স্বচ্ছ পথের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরাই পথচ্যুত হয়ে পড়ো, জনসাধারণকে সেই পথ হতে বিচ্যুত করে এদিক ওদিক বিভ্রান্ত করে নিয়ে চল, তবে তোমরা নিজ দোষেই পথচ্যুত হবে। অতঃপর তিনি বললেন, খবরদার! হুশিঁয়ার! রজমের আয়াত সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে তোমরা সতর্ক থেকো। কোন ব্যক্তি এরূপ না বলে যে, আমরা তো আল্লাহর কুর'আনে ব্যভিচারের দুই প্রকার শাস্তির উল্লেখ পাই না। (শুধু বেত্রদণ্ডই উল্লেখ পাই) দেখ, আল্লাহর রাসূল প্রস্তারাঘাত করেছেন। ঐ আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে যদি মানুষ এ কথা না বলত যে, উমর আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত করেছেন, তাহলে আয়াতটি আল-কুর'আনে লিখে দিতাম। আয়াতটি হচ্ছে 'আশ্-শাইখু ওয়াশ্-শাইখাতু' অর্থ বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিত নারী। অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিত নারী যেনা করলে অবশ্যই রজম কর।[৮৯]

৪) কোন আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হলেই তার বিধিও রহিত হবে, এটা অপরিহার্য নয়। আবু দাউদ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ উক্তি বর্ণনা করেছেন। আহমদ ও তাবরানি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নাযিলকৃত কুর'আনে এ আয়াতটি ছিল, 'কোন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন ব্যভিচার করে,

---

৮৭ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪২৬৭ ; আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশআয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪১৫

৮৮ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইস্মাঈল আল-বুখারী, *সহিহ আল-বুখারী* (তুরস্ক : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, ১৯৮১ খ্রি.), পরিচ্ছেদ : ইন্নান্নাফফসা বিন-নাফস; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত ; হাদীস নং ১৬৭৬; আবু-দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৩৫২

৮৯ ইমাম মালেক (র.), *মুয়াত্তা* (অনু . মুহাম্মাদ রেজাউল করীম ইসলামবাদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ২০০৭), খ.২,পৃ. ৫২৮, সহীহ্ আল- বুখারী, প্রাগুক্ত, হাসীস নং ২৫৬৪; সহিহ্ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪২৭১

তখন তারা যে আনন্দ উপভোগ করেছে তদ্রুপ তাদের উভয়কে অবশ্যই রজম করবে।' আর ইবনে হাব্বান উবাই বিন কা'ব এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, সূরা আহযাব ইতিপূর্বে সূরা আল-বাকারার মতো বড় ছিলো এবং তাতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সংক্রান্ত আয়াতটি ছিলো।[৯০] এ আয়াত তিলাওয়াত করা হতো এবং তার পর তার তিলাওয়াত মানসুখ হয়ে যায় এবং হুকুম বাকী থাকে।[৯১]

৫) মাইয আসলামী (রা.) এসে বলেলেন যে, তিনি ব্যভিচার করেছেন। নবী করীম (স.) তখন মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি অপরদিকে গিয়ে আবার বললেন, তিনি ব্যভিচার করেছেন। তারপর চতুর্থবারের (স্বীকারোক্তির) পর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ব্যাপারে আদেশ জারী করলে তাকে হারারা প্রান্তরের দিকে বের করে নেয়া হলো এবং পাথর বর্ষণ করা শুরু হলো। যখন প্রস্তরাঘাতের তীব্রতা তাকে স্পর্শ করলো তখন তিনি দ্রুতবেগে ছুটে পালালেন। তখন তিনি এমন এক ব্যক্তির মুখোমুখি হলেন যার হাতে একটি উটের চোয়াল ছিল। সে ব্যক্তি তা দিয়েই তাকে আঘাত করলো এবং অন্যরাও তাকে প্রহার করতে লাগলো। এমনকি তার মৃত্যু হয়ে গেল। তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন'? [৯২] অপর বর্ণনায় দয়াল নবীর প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে, 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন ? হয়তো সে তওবা করে নিতো এবং আল্লাহও তার তওবা কবুল করে নিতেন'।[৯৩]

৬) 'আযাদ গোত্রে গামিদ বংশের এক মহিলা এসে বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পাক করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য, ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা কর। তখন সে বললো, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন- যেমন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মাইযকে! এ যে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভবতী! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, যে পর্যন্ত না তোমার গর্ভস্থিত সন্তানটি প্রসব করছ। জনৈক আনসারী সাহাবী তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তারপর যখন সে সন্তান প্রসব করলো, তখন ঐ আনসারী নবী করীম (স.)-এর নিকট এসে জানালেন যে, ঐ গামেদী মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। জবাবে তিনি বললেন, এক্ষুণি আমরা তাকে রজম করবো না, কেননা তার সন্তানটি একান্তই শিশু

---

৯০ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৭

৯১ আল্লামা আবুল ফজল শিহাব উদ্দিন আস্ সাইয়্যেদ মাহমুদ আল-আলুসি, *তাফসীরে রুহুল মা'আনী* (মিশর: দারুল হাদীস, ২০০৫), খ. ১৮, পৃ. ৭৯

৯২ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৯৯; আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪১৮

৯৩ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪১৮

এবং তাকে দুধপান করানোর মত কেউ নেই। তখন অপর আনসার সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন,ওকে দুধ পান করানোর দায়িত্বটা আমার উপর ছেড়ে দিন ইয়া রাসুলুল্লাহ! তখন তিনি তাকে রজম করলেন'।[৯৪]

৭) কাসীর ইবনে সালত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা মারওয়ানের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সেখানে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) ও ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা কুর'আন কারীমে পড়তাম 'বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তোমরা অবশ্যই রজম করবে। মারওয়ান তখন জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কুর'আন করীমে এটা লিখেননি কেন ? হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যখন এই আলোচনা চলতে থাকে তখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে সান্তনা দিচ্ছি যে, একটি লোক একদা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে আগমন করে। সে তাঁর সামনে এরূপ বর্ণনা দেয়। আর সে রজমের কথা বর্ণনা করে। কে একজন বলে, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি রজমের আয়াত লিখিয়ে নিন! রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, এখনতো আমি এটা লিখিয়ে নিতে পারি না। এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রজমের আয়াত পূর্বে আল-কুর'আনে লিখিত ছিল। তারপর তিলাওয়াত রহিত হয়েছে কিন্তু বিধান বহাল রয়েছে।[৯৫]

উপরোক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) স্বয়ং রজমের দণ্ড কার্যকর করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, সূরা আন- নূরের যিনা সংক্রান্ত পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হবার পর রজমের বিধান রহিত হয়ে গেছে। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে অসত্য। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, অন্যান্য হাদীসবীদ ও ঐতিহাসিকগণ রজম সংক্রান্ত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, সূরা আন-নূর নাযিল হবার এবং 'ইফক' এর ঘটনার পরও রাসূলুল্লাহ (স.) স্বয়ং রজমের দণ্ড কার্যকর করেছেন। সূরা আন নূরে বর্ণিত বেত্রাঘাতের হুকুম থেকে রজমের বিধানকে খাস বা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা এরূপ খাস করা জায়িয। হানাফীগণের মতে, মাশহুর ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আয়াতকে খাস করা বৈধ। যেহেতু রজমের হাদীসসমূহ অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, তাই বেত্রাঘাতের বিধান থেকে রজমের বিধানকে খাস করা অধিকাংশ ইমামের মতে সঠিক হয়েছে।সুতরাং সূরা নূরের মধ্যে যদিও শুধু বেত্রাদণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তার সাথে বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান হয়তো রাসুলূল্লাহ (স.) কর্তৃক প্রবর্তিত হওয়াও অতি সুস্পষ্ট। এই সূত্রেই সাহাবাগণ হতে আরম্ভ করে সকল স্তরের ফকীহগণের ইজমা এই যে, সূরা নূরে

৯৪ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৯৬; আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪৪০-৪৫

৯৫ ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ২৪

উল্লেখিত একশত বেত্রাদণ্ড শুধু কেবল অবিবাহিতের জন্য, আর বিবাহিতের জন্য রজম। তাছাড়া খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর (রা.) উপস্থিত সাহাবাগণের সামনে অতিশয় দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'সূরা নূরের বর্তমান বেত্রদণ্ড বিধানের আয়াতের সঙ্গে রজমের বিধান সম্বলিত আয়াতও ছিল যাহা আমরা তিলাওয়াত করে থাকতাম। বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি শুধু পাথর মারা মহানবি (স.) এ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে পাথর মেরেছেন, কিন্তু বেত্রাঘাত করেননি।' তদ্রুপ রাসূলুল্লাহ (স.) ইহুদী পুরুষ ও মহিলার ঘটনায় কেবল তাদেরকে পাথর মেরেছিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ব্যবহারিক কাজও প্রমাণ করে এটাই এ পর্যায়ে সর্বশেষ নির্দেশ। উপরোক্ত নির্ভুল ও অকাট্য হাদীস দ্বারা বিবাহিত ব্যক্তি যিনার শাস্তি 'রজম' প্রমাণিত হয়।[৯৬]

দাস-দাসীর ব্যভিচারের শাস্তি

বিবাহিত দাস কিংবা দাসী যিনার অপরাধ করলে তাদেরকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'সুতরাং তাদের বিয়ে করবে তাদের (দাসীদের) মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর নিয়ম অনুযায়ী দিয়ে দাও। এই হিসাবে যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এই হিসাবে নয় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত প্রণয়ণী। তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক। এটা (অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা) ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে (লিপ্ত হওয়ার) আশংকা করে, এবং (দাসীদেরকে বিবাহ করা অপেক্ষা) তোমাদের সংযমী হওয়া অতি উত্তম। আর আল্লাহ তা'য়ালা অতীব ক্ষমা পরায়ণ এবং পরম করুণাময়'।[৯৭]

উক্ত আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে আয়াতটি সূরা আন-নূর নাযিল হওয়ার অব্যাহিত পর নাযিল হয়েছে। কারণ, সূরা আন-নূরের দ্বিতীয় আয়াতে ব্যভিচারের যে শাস্তির উল্লেখ রয়েছে তা কেবল মাত্র অবিবাহিতা স্বাধীন মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য এবং তাদেরই মোকাবেলায় এখানে বিবাহিতা ক্রীতদাসীদের অর্ধেক শাস্তির বিধান আরোপ করা হয়েছে।[৯৮]

এটা জানা কথা যে, একমাত্র বেত্রাঘাতের শাস্তিই হচ্ছে এমন শাস্তি যা বিভাজনযোগ্য। এই বিভাজন পাথর নিক্ষেপের মতো শাস্তির বেলায় সম্ভবপর নয়। কাজেই কোন বিবাহিত ক্রীতদাসী ব্যভিচারী সাব্যস্ত

৯৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৬
৯৭ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৫
৯৮ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০৯

হলে কোন স্বাধীন কুমারী নারীর অর্ধেক শাস্তি প্রদান করতে হবে।[৯৯] অতএব এ আয়াত প্রমাণ করে, দাসীরা যদি ব্যভিচার করে, তবে তার উপর কার্যকর হবে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি।' যেহেতু রজম কম বা বেশি হতে পারেনা, তাই এখানে 'শাস্তি' দ্বারা রজম নয়, বেত্রদণ্ড বুঝানো হয়েছে।[১০০]

২। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কোন দাসী যেনা করে এবং তার যেনার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে তাকে শরি'য়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে কোন প্রকার ভর্ৎসনা করবে না। এরপর দ্বিতীয়বার যদি সে যেনা করে তবে তাকে শরি'য়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে কোন প্রকার ধমকি দিবে না। এরপর তৃতীয়বার যদি যেনা করে এবং তার যিনার কথা প্রকাশ পায় তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, চুলের দড়ি পরিমাণ মূল্যে হলেও। (অর্থাৎ কম মূল্য হলেও)।[১০১]

দাস-দাসীর ব্যভিচারের শাস্তি স্বাধীন ব্যভিচারী নর-নারীর তুলনায় লঘু প্রকৃতির

ইসলাম দাসত্ব জীবনের নিম্ন মর্যাদাকে অধিক শাস্তি বিধানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেনি যেমনিভাবে তৎকালীন জাহেলী সমাজে করা হতো। তৎকালীন সমাজে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী অথবা উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের লোকদের মাঝে ব্যবধান করা হতো। ফলে একজন উচ্চবর্ণের অপরাধী লঘু শাস্তি পেতো, পক্ষান্তরে একজন নিম্নবর্ণের অপরাধী পেতো কঠিন ও নির্মম শাস্তি। কিন্তু ইসলামে এক্ষেত্রে একজন দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তারজন্য তুলনামূলক নমনীয় শাস্তির বিধান রয়েছে। এটা সভ্যতার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। এর অন্তর্দশন হচ্ছে একজন স্বাধীন সতী নারীর তুলনায় সে চারিত্রিকভাবে দুর্বল। তাছাড়া সে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবেও হীন! এমতবস্থায় কোন আর্থিক বা পারিবারিক মর্যাদার লোভে আকৃষ্ট হয়ে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া তার বেলায় বিচিত্র কিছুই নয়। এসব দিক বিবেচনা করে ইসলাম ব্যভিচারী দাসীদের শাস্তি একজন অবিবাহিত ব্যভিচারীর স্বাধীন মহিলার শাস্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত লঘু ও নমনীয় করেছে।[১০২]

ব্যভিচার 'হদযোগ্য' অপরাধ বিবেচিত হওয়ার শর্তাবলী

যিনা হদযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য কতিপয় প্রত্যয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইগুলি হচ্ছে 'যিনা' ও 'মুহসান'।

---

৯৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.১১৪
১০০ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৩২৮
১০১ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৬৪৮
১০২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৪

ব্যভিচারের আইনগত সংজ্ঞা

যিনা শব্দের পারিভাষিক অর্থ 'নিজ স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারী বা পুরুষের সাথে যৌনকর্ম। ইমাম আবু হানিফা (র.) যিনার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, 'এমন কোন নারীর সাথে তার সম্মতিতে তার যৌনাঙ্গে কোন পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে যেনা বলে, যে তার স্ত্রীও নয় এবং স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান নেই।[১০৩] এই সংজ্ঞার দৃষ্টিতে, পশ্চাদ্বারে সঙ্গম, সমকাম, লূতের সম্প্রদায়ের কর্ম, পশুর সহিত যৌনক্রিয়া ইত্যাদি যিনা'র সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।[১০৪] শাফিয়ী মতালম্বীদের মতে, যৌন অঙ্গকে এমন যৌন অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো, যা শরি'য়তের দৃষ্টিতে হারাম, কিন্তু স্বভাবত এর প্রতি আগ্রহ বা আকর্ষণ রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ ও বলৎকার নেই।[১০৫] হাম্বলী স্কুলের আইনবিদগণের মতে, সামনে কিংবা পেছনের দিক দিয়ে অশ্লীলকর্ম সম্পাদনকে যিনা বলে।[১০৬] মালেকী স্কুলের আইনবিদগণের মতে, 'শরি'য়ত ভিত্তিক অধিকার কিংবা এর কোন রূপ সন্দেহ ছাড়াই যৌনাঙ্গে বা গুহ্যদ্বারে পুরুষ বা নারীর সাথে রতিক্রিয়া করা।'[১০৭]

উপরে বর্ণিত যিনার সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (র.) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সবচেয়ে যথার্থ। কারণ অন্যান্য সংজ্ঞাগুলো 'যিনা' শব্দের প্রচলিত অর্থ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কুর'আন মাজীদ শব্দসমূহকে সব সময় এর প্রচলিত ও সর্বজনবোধ্য অর্থেই ব্যবহার করে। কোন বিশেষ শব্দকে বিশেষভাবে কোন পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হলে অন্য কথা। কোন শব্দ যদি বিশেষ পরিভাষায় পরিণত হয়, তবে এটা সেই বিশেষ অর্থ ও ভাবই প্রকাশ করবে। এখানে 'যিনা' শব্দেকে বিশেষ কোন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে বলে কোনই প্রমাণ নেই। কাজেই একে প্রচলিত অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। আর সে অর্থটি হচ্ছে স্বাভাবিক পন্থায় অর্থাৎ বিবাহ ব্যতীত নারীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার করা। যৌন লালসা পরিতৃপ্তির অন্য দিকগুলি এর মধ্যে পড়ে না। এছাড়া একথাও জানা আছে যে, সমকাম বা লূতের জাতির কুকর্মের শাস্তি সম্পর্কে সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় এটাও যদি যিনার মধ্যে গণ্য হত, তবে এরূপ মতভেদ হওয়ার কোন কারণ ছিল না।[১০৮]

---

১০৩ কামাল উদ্দিন ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর* (কায়রো : দারুল হাদীস, ১৩৫৬ হি.), খ.৫, পৃ. ৩০-৩১

১০৪ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৭৮

১০৫ শামছুদ্দিন আল-রামেলী, *নেহায়েত আল- মহতাজ আলা-শারহিল মিনহাজ* (মিশর : মুস্তফা আল-বাবী আল- হলবী লাইব্রেরি প্রেস, ১৩৮৭ হি.), পৃ. ৪০২

১০৬ ইউনুছ আল-বাহুতী, *কাশশফুল কুনা আন মতনি আল- ইকনা* (বৈরূত : আলম আল-কুতুব, ১৪০৩ হি), খ.৬, পৃ. ৮৯

১০৭ আল-মুয়াক্ব ছালেহ আল আবী, *আল-তাজ আল-ইকলীল* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি), পৃ. ২৯০

১০৮ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ .৭৯

মুহসানের সংজ্ঞা

মুহসান 'হিসনুন' শব্দ থেকে এসেছে। কারো সম্পর্কে 'তাহাস্‌সানা' বলা হয় তখন যখন সে দুর্গকে বসবাসের স্থানরূপে গ্রহণ করে।[১০৯]

আল্লামা শাওকানী লিখেন, দুর্গবাসী হওয়ার আসল মানে হচ্ছে প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন হওয়া।[১১০] যেমন কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ

'আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণের শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে'?[১১১]

মুহসান শব্দটি আল-কুর'আনে চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা :

ক. pure অর্থাৎ নির্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র, খাঁটি, Chaste অর্থাৎ পবিত্রা, চরিত্রবতী, সতী, সুরুচিসম্পন্না। যেমন আল-কুর'আনের বাণী,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান।[১১২]

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

'তোমাদের দাসীরা যখন নিজেরাই সতীসাধ্বী থাকতে চায় তখন বৈষয়িক স্বার্থে তাদেরকে বাধ্য করো না।' [১১৩]

উপরোক্ত দুটি আয়াতে 'হিসনুন' শব্দ দ্বারা পবিত্র ও বিশুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুহসানাত ঐ সকল নারী যারা যিনা ব্যভিচার হতে নিজের লজ্জাস্থানকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ রেখেছে।

---

১০৯ আবুল কাশেম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ রাগেব ইস্ফাহানি, *মুফরাদাত* (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি), খ.১, পৃ. ১৩
১১০ প্রাগুক্ত ।
১১১ আল-কুর'আন, আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮০
১১২ আল-কুর'আন, আন-নূর, ২৪ : ৪
১১৩ আল-কুর'আন, আন-নূর, ২৪ : ৩৩

দুই. বিবাহিতা স্বাধীন নারী। যেমন আল-কুর'আনের বাণী,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

'এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ, (অর্থাৎ যাদের স্বামী রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম) কিন্তু তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী তারা ব্যতীত। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের (মোহর) বিনিময়ে তলব করবে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্যে নয়'।[১১৪]

তিন. অবিবাহিতা স্বাধীন নারী। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

'তৎপর তারা (দাসীরা) যদি ব্যভিচার করে, তবে তার উপর কার্যকর হবে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি।'[১১৫] যেহেতু রজম কম বা বেশি হতে পারেনা, তাই এখানে 'শাস্তি দ্বারা রজম নয়, বেত্রদণ্ড বুঝানো হয়েছে।[১১৬] আর বেত্রদণ্ডের শাস্তির উল্লেখ রয়েছে সূরা আন-নূরের দ্বিতীয় আয়াতে যা কিনা অবিবাহিতা স্বাধীন নারীদের জন্য প্রযোজ্য এবং তাদেরই মোকাবেলায় এখানে বিবাহিতা ক্রীতদাসীদের অর্ধেক শাস্তির বিধান আরোপ করা হয়েছে।[১১৭] মুক্ত স্বাধীন-ক্রীতদাসী নয় অর্থ মুহসান শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আল-কুর'আনের বাণী, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

'যে লোক স্বাধীনা ঈমানদার মহিলা বিবাহ করার সামর্থের অধিকারী নয়...। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা মুহসানাতদের বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেন না'। এই মুহসানাত কারা ? এর অর্থ বিবাহিতা নারী যে নয়, বরং এক স্বাধীন পরিবারের নারী হতে পারে, তা সুস্পষ্ট।[১১৮]

চার. ইসলাম গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও

---

১১৪ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৫
১১৫ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ২৫
১১৬ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ৩২৮
১১৭ সাইয়েদ আবুল আ 'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০৯
১১৮ প্রগুক্ত, খ.৯, পৃ.৭৭

পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।[১১৯] অত্র আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে মু'মিনাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুহসানাত শব্দটির অর্থ ঈমানদার স্বাধীন নারী।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'মুহসান' হল ঐ সকল বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত নারী বা পুরুষ যারা মুসলিম, স্বাধীন এবং পবিত্র ও বিশুদ্ধ (যিনা হতে) বুঝানো হয়। ইসলামী শরি'য়তের বিশেষজ্ঞগণ কোন ব্যক্তির মুহসান হওয়ার জন্য আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যথা- বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ও বুদ্ধিমান বা সুস্থ মস্তিস্ক হওয়া। শরি'য়তের মুকাল্লাফ হওয়ার জন্য যে কোন নর-নারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক হতে হবে। এ বিষয়ে রাসূলে পাক (স.)-এর বাণী রয়েছে- 'তিন ব্যক্তি থেকে লিখার কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, বালক থেকে যতক্ষণ সে বালেগ হয়, ঘুমন্ত থেকে যতক্ষণে সে জাগ্রত হয়, পাগল থেকে যতক্ষণে সে অসুস্থ হয়।[১২০] উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা বালিকা কিংবা পাগল ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের উপর যিনার 'হদ' প্রয়োগ করা যাবে না।

'মুহসান' হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে ক) বালেগ; খ) বুদ্ধিমান; গ) স্বাধীন; ঘ) মুসলিম; ঙ) পবিত্র, বিশুদ্ধ নির্মল অর্থাৎ যিনা ব্যভিচার হতে মুক্ত।

মুহসান ব্যক্তির হদযোগ্য যেনার শর্তাবলি

কোন মুহসান পুরুষ বা নারী সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য তার দ্বারা শুধু যিনার কার্য সম্পন্ন হওয়াই যথেষ্ট নয়। উক্ত অপরাধীর মধ্যে কিছু শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী। তবে এই শর্তগুলো অবিবাহিতের যিনা হওয়ার ব্যপারে একরূপ, আর বিবাহিতের যিনা হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যরূপ। এগুলোর মধ্যে কতগুলো শর্ত সর্বসম্মতিক্রমে আর কতিপয় শর্তাবলী মতভেদসহ রয়েছে। শর্তাবলী নিম্নরূপ :

ক) স্বাধীন-অপরাধীকে স্বাধীন ও মুক্ত ব্যক্তি হতে হবে। এই শতর্টি সর্ববাদী সম্মত। কেননা কুর'আন নিজেই ইঙ্গিত করেছে যে, গোলাম বা দাস অপরাধীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার দণ্ড দেয়া যেতে পারে না। একটু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দাসী যদি বিবাহের পর যিনার অপরাধ করে, তবে তাকে অবিবাহিত স্বাধীন মহিলার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক দিতে হবে। [১২১]

---

১১৯ আল-কুর'আন, আন-নূর, ২৪ : ২৩
১২০ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ : হাদীস নং- ৪৩৯৯,৪৪০১,৪৪০২
১২১ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রগুক্ত, খ.৯, পৃ.৮০

খ) নারীর জননেন্দ্রিয়ে সঙ্গম করা, যদি নিজের স্ত্রী নয় এমন কোন নারীর সম্মুখভাগের জননেন্দ্রিয় দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তা হলেই হদ্দ কার্যকর হবে। যদি পশ্চাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তাহলেও অধিকাংশ ইমামের মতে যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা পশ্চাদ্বারও সম্মুখভাগের মতোই যৌনলিপ্সা পূরণের একটি গুপ্তাঙ্গ। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে, এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা হবে না; বরং তা'যীর করা হবে। শাফি'ঈগণের মতে, এমতাবস্থায় কেবল পুরুষের ওপরই হদ কার্যকর করা হবে। নারীকে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসনের দণ্ড দেয়া হবে।[১২২]

গ) পুরষাঙ্গ পুরোই কিংবা পুরুষাঙ্গের কর্তিত সম্পূর্ণ অগ্রভাগ যদি নারীর যোনীতে প্রবেশ করে, তবেই হদের বিধান কার্যকর করা হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, পুরুষাঙ্গ সম্প্রসারিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় হদ কার্যকর করা হবে। যদি পুরুষাঙ্গ মোটেই প্রবেশ করানো না হয়, তাতে হদ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ ধরনের অবস্থাকে যৌন সঙ্গম বলা হয় না।[১২৩] যদি নারী-পুরুষকে একত্রিত অবস্থায় পাওয়া কিংবা রতিক্রিয়াপূর্ব শৃংগারে করতে দেখা অথবা উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে কাউকে যিনাকারী গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। আবার স্ত্রী নারী-পুরুষকে এরূপ অবস্থায় পাওয়া গেলে ডাক্তারি পরীক্ষা করে যিনা প্রমাণ করে দণ্ড কার্যকর করা ইসলামী শরি'য়তের সমর্থিত পন্থা নয়। যে সব লোককে এসব অবস্থায় লিপ্ত দেখা যাবে পরিস্থিতির বিবেচনায় ইসলমী রাষ্ট্রের বিচারপতি কিংবা মজলিশে শুরা (পার্লামেন্ট) তাদের জন্য যে কোন শাস্তি নির্ধারণ করবেন। এই শাস্তি যদি বেত্রঘাত হয়, তাহলে দশটির অধিক ঘা লাগানো যাবেনা।[১২৪]

ঘ) উভয়ে মুসলিম যিনার অপরাধে লিপ্ত নর-নারীকে মুসলিম হতে হবে। যদি কাফির পুরুষ কাফির নারীর সাথে যিনা করে, তাহলে তাদের উপর শরি'য়তের হদ কার্যকর করা যাবে না। এ অনুগত নাগরিক নয় এমন ব্যপারে ইমাম শাফি'য়ী (র.)-এর মতে তার উপর শুধু রাষ্ট্রীয় শাস্তি কার্যকর করা হবে।[১২৫] মুসলিম দেশের অমুসলিম ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে তাকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে। এ ব্যপারে ফকীহগণ একমত। তবে বিবাহিত হলে 'রজম' করা হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি, আবু ইউছুফ ও কাশেমি (র.) প্রমুখের মতে বিবাহিত কাফের যদি প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক হয়, স্বাধীন হয় এবং তার ধর্ম অনুসারে বিশুদ্ধভাবে বিয়ে করে থাকে, তাহলে তাকে 'রজম' করা হবে। আবু হানীফা, মুহাম্মদ, যায়দ বিন আলী (র.) প্রমুখের মতে এক্ষেত্রে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে, রজম নয়। কেননা তাদের নিকট রজমের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) যে দুজন ইহুদীকে রজম

---

১২২ আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ১৯২৪), খ.৯, পৃ. ৭৭-৮; মুহাম্মদ বিন কুদামাহ্, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৫৪

১২৩ কামাল উদ্দিন ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর* (কায়রো : দারুল হাদীস, ১৩৫৬ হি.), খ.৫, পৃ. ২৪৮

১২৪ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত,খ.৯, পৃ. ৭৯

১২৫ আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৫৫-৫৬

করেছিলেন, সেটি তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুসারে করেছিলেন।[১২৬] হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বনু আসলাম গোত্রের একজনকে ও ইহুদীদের একজনকে রজম করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মওদূদী লিখেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইহুদীদের আনীত এক মামলায় পাথর নিক্ষেপের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে ফায়সালা করেছিলেন, তা তিনি দেশের প্রচলিত আইন (Law of the Land) অনুযায়ী জারী করেননি, বরং তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন (Personal Law) অনুসারে প্রয়োগ করেছিলেন।[১২৭] এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সর্বসম্মতভাবে উল্লেখ আছে যে, এই মামলা যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট পেশ করা হয়, তখন তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'পাথর নিক্ষেপে হত্যা সম্পর্কে তোমাদের তওরাতে কি লেখা আছে ? কিংবা বললেন, 'তোমাদের কিতাবে কি লেখা আছে ?' যখন প্রমাণিত হলো যে, তাদের কিতাবে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন 'তাওরাতে যা আছে আমি সেই ফয়সালা দিচ্ছি। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) এ মামলায় ফায়সালা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার হুকুম সর্বপ্রথম জীবিত করবো, যখন এরা একে মেরে ফেলেছিল।' ইমাম মালেকের মতে, অমুসলিম অবিবাহিত নর-নারী যিনা করলে তাদের উপর কোন হদ কার্যকর করা হবে না। তবে যে অমুসলিম মুসলিম দেশের অনুগত না হয়ে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থী, তার উপর আবু ইউছুফ ও ইমাম শাফেই (র.) হদ করার পক্ষপাতী। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) হদ না কারীর পক্ষপাতী।[১২৮] যদি কোন কাফির কোন মুসলিম নারীর সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে, তাহলে ফকীহগণের মতে, তার ওপর হদের শাস্তি বর্তাবে না; তবে মুসলিম মহিলার ওপর হদের শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি সে মুসলিম নারীকে জোরপূর্বক যিনা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[১২৯]

চ) **যৌনকর্ম স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হওয়া;** যদি নারী-পুরুষ দুজনেই সম্মত হয়ে সঙ্গম করে তাহলেই হদ কার্যকর হবে। যিনা অবস্থায় নারী যদি অনড় ও শান্ত থাকে, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে এ কাজে সম্মত রয়েছে। যদি কোন মেয়েকে বলাৎকার করা হয় কিংবা জোরপূর্বক ছিনতাই করে ধর্ষণ করা হয়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আমার উম্মত থেকে ভুল-ত্রুটি ও জোরপূর্বক যে সব কাজ করা হয় তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।'[১৩০] হযরত ওয়া'ইল (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে অন্ধকারে

---

১২৬ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২৮
১২৭ সাইয়েদ আবুল আ 'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৮১
১২৮ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৩০
১২৯ আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৫৫-৬
১৩০ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ আল- কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাযাহ* (ঢাকা : মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ, তা.বি), কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ১৬ ; ইমামুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৪৫

নামাযে যাওয়ার জন্য বের হয়। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে জোরপূর্বক তাঁর সতীত্ব হরণ করে। মহিলার চিৎকারে চারদিক থেকে লোকজন জড়ো হলো এবং ধর্ষণকারীকে ধরে ফেললো। রাসূলুল্লাহ (স.) ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন এবং মহিলাটিকে বললেন, 'তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন'।[১৩১] হযরত উমর (রা.) এর খিলাফত আমলে এক ব্যক্তি একটি নারীর সাথে বলপূর্বক যিনা করলো। হযরত উমর (রা.) তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলেন এবং মেয়েলোকটিকে ছেড়ে দিলেন।[১৩২] অনুরূপভাবে কোন পুরুষকেও জোরজবরদস্তি করে যিনা করতে বাধ্য করা হলে তার ওপর হদ কায়েম করা যাবে না, সে বেকসুর খালাস পাবে।

ঙ) প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন হওয়া: যিনার অপরাধে লিপ্ত নর বা নারীকে মুকাল্লাফ (শরি'য়তের নির্দেশাবলী পালনে আদিষ্ট) অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক নর বা নারী কিংবা পাগল যদি যিনা করে, তাদের উপর হদ কার্যকর করা যাবে না; তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা'যীরের আওতায় আদালত তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবে।

চ) যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত থাকা হদ কার্যকর করার জন্য যিনাকারীর যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। হযরত 'উমর, উসমান ও আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, 'হদ' কেবল সে ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হবে, যে তা জানে'।[১৩৩] যদি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কিংবা মুসলিম সমাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী অথবা যিনার বৈধতায় বিশ্বাসী জনসমাজের সাথে বসবাসকারী কোন ব্যভিচারী যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করে এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণও মিলে, তাহলে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়ায় তার ওপর হদ কার্যকর করা যাবে না। হযরত সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা সিরিয়ায় যিনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, তখন এক ব্যাক্তি বললো, আমিতো গতকাল ও যিনা করেছি। লোকজন বললো তুমি এসব কি বলছ ? সে বললো, আমিতো জানিনা যে, আল্লাহ তা'য়ালা যিনাকে হারাম করেছে। এ সম্পর্কে হযরত 'উমার (রা) এর নিকট চিঠি লেখা হলে উত্তরে উমর (রা.) জানালেন যে, 'যদি সে না জানে, তবে তাকে জানিয়ে দাও। এর পর যদি সে ফের যিনা করে, তাহলে তাকে প্রস্তর আঘাত কর'।[১৩৪] এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, হদ কার্যকর করার জন্য যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যিনাকারীর জ্ঞান থাকতে হবে। তবে মুসলিম সমাজে

---

১৩১ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), *সুনানে তিরমিযী*, (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি) ,কিতাবুল হদুদ, হাদীস নং ১৪৫৪

১৩২ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ

১৩৩ ইবনু কুদামাহ, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৫৬

১৩৪ সহিহ্ আল বুখারি, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ১১

বসবাসকারী কোন মুসলিম যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা মুসলিম সমাজে বসবাস করে যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অনবহিত থাকবে তা অসম্ভব ব্যাপার।[১৩৫]

ছ) ইসলামী রাষ্ট্রে যিনা সম্পন্ন হওয়া হানাফী ফকীহগণের মতে, হদ কায়েমের জন্য যিনা ইসলামী রাষ্ট্রেই সম্পন্ন হতে হবে। কোন মুসলিম যদি দারুল হারবে (অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্র) যিনা করে দেশে ফিরে আসে এবং বিচারকের কাছে নিজের যিনার কথা স্বীকার করে, তাহলে তার ওপর হদ কায়েম করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দারুল হারবে চুরি কিংবা যিনা করে হদের শাস্তি ভোগের উপযোগী হলো। এরপর সে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসল, তাহলে তার ওপর হদ কায়েম করা যাবে না'।[১৩৬] তদুপরি হানাফী ফকীহগণের মতে, কোন অভিযানের সময় শত্রুদেশে অবস্থান কালেও কারো ওপর হদ কায়িম করা যাবে না।[১৩৭] হযরত আবুদ্দারদা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শত্রুদেশে কোন হদের অপরাধীর ওপর হদ কায়েম করতে নিষেধ করতেন।[১৩৮] শাফি'য়ীগণের মতে, দারুল হারবে হদ কায়েম করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি অপরাধী মুরতাদ হয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হবার কোন আশঙ্কা না থাকে। হাম্বলী ফকীহগণের মতে, কোন মুসলিম যদি শত্রুদেশে কোন হদের অপরাধ করে, তাহলে শত্রুদেশে তার ওপর হদ কায়েম করা যাবেনা; বরং দেশে ফিরে আসার পরেই তার ওপর হদ কায়েম করা হবে।[১৩৯]

জ) ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষ বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া : হানাফীগণের মতে হদ কায়েমের জন্য যিনাকারীকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। অতএব, তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাওয়ায় কোন বোবার উপর কোনক্রমেই হদের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। এমন কি সে যদি চার চার বার লিখে কিংবা ইশারা করে বোঝায় যে, সে যিনা করেছে এবং সাক্ষীরাও যদি তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও তার উপর হদ কায়িম করা যাবে না। তবে অপরাপর ইমামগণের মতে, যিনার হদের শাস্তি প্রয়োগের জন্য ব্যভিচারীর বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া শর্ত নয়। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে, বোবা যদি যিনা করে এবং সে যদি লিখে কিংবা ইশারা করে বোঝায় যে, সে যিনা করেছে অথবা সাক্ষীরা যদি তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার ওপর হদ কায়েম করা ওয়াজিব হবে।[১৪০]

---

১৩৫ *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ* (কুয়েত : কুয়েত সরকারের ওয়ক্‌ফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৬), খ.২৪, পৃ. ২৪
১৩৬ কামাল উদ্দিন ইবনে হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৬
১৩৭ যায়নুদ্দিন ইব্‌ন নুজায়ম, *আল- বাহরুর রাইক* (করাচি : রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭) খ.৫, পৃ. ১৮; ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৬৬-২৬৭
১৩৮ ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৬৭
১৩৯ প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৬৬-২৬৭
১৪০ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৫৫

ঝ) দু'জনের এক জন পুরুষ এবং অপরজন নারী হওয়া: যিনার হদ ওয়াজিব হবার জন্য যিনাকারীদের দু'জনের একজনকে পুরুষ আর অপরজনকে নারী হতে হবে। যদি দুজনই সমজাতীয় হয় কিংবা একজন পশু হয়, তাহলে কারো ওপর হদ কার্যকর করা যাবে না।

বিবাহিত মুহসান ব্যক্তির হদ

ব্যভিচারী ব্যক্তি যদি বিবাহিত হয়, তাহলে উপরোল্লিখিত শর্তাবলী ছাড়াও নিম্নলিখিত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে বিবাহিত নারী বা পুরুষের উপর ব্যভিচারের হদ তথা রজম কার্যকরী করতে হবে।[১৪১]

ক) সহীহ্ বিবাহিত ও সঙ্গমক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া

রজমের শাস্তি কেবলমাত্র ঐ বিবাহিত নারী কিংবা পুরুষের উপর কার্যকর হবে যারা ইতিপূর্বে বিশুদ্ধভাবে বিয়ে করেছে ও নির্জন মিলন বা সহবাস করেছে। চাই বীর্যপাত করুক বা না করুক। অতঃপর এইরূ বিবাহিত নারী কিংবা পুরুষ যিনায় লিপ্ত হয়েছে। বিবাহিত হওয়ার শর্ত পূরণের জন্য বিয়ে টিকে থাকা জরুরি নয় । সে যদি একবার বিধিসম্মতভাবে বিয়ে করে থাকে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে, তারপর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তারপর নতুন কোনো বিয়ে না করেই ব্যভিচার করে, তাহলেও তাকে রজম করা হবে। বিবাহিত নারীর বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। তার যদি একবার বিয়ে হয়ে থাকে, তারপর তাকে তালাক দেয়া হয়ে থাকে এবং তালাকের পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাকে বিবাহিত গণ্য করা হবে এবং রজম করা হবে। সহীহ্ বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সঙ্গমক্রিয়া না হয়ে থাকলে ঐ নারী বা পুরুষ মুহসান গণ্য হবে না বিধায় এরূপ স্বামী বা স্ত্রী যিনায় লিপ্ত হলে এদের উপর রজম কার্যকর করা যাবেনা।[১৪২]

খ) যৌনকর্মে লিপ্ত নারী-পুরুষ পরস্পর স্বামী- স্ত্রী নয়

ফাসিদ ও বাতিল বিবাহের অধীন স্বামী-স্ত্রীর যৌনকর্ম হদযোগ্য যেনার আওতায় পড়ে না। যেমন যে সব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, সে সব মহিলার সাথে যদি কেউ আকদ সুসম্পন্ন করে সহবাস করে, তাহলে তার উপরও হদ জারী করা যাবে না। তবে তাকে দেন মোহর আদায় করতে হবে এবং তাকে কঠোর তা'যীরী শাস্তি দেয়া হবে। যদি সে হারাম জেনেই এ কাজ করে থাকে। যদি সে না জেনেই এ কাজ করে, তাহলে না তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে, না তা'যীর। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)- এর অভিমত। তবে ইমাম আবু ইউছুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে,যদি সে হারাম জানার পরে এ কাজ করে থাকে, তাহলে তার ওপর হদ জারী করা হবে। যদি না জেনেই করে থাকে, তবেই তার

---

১৪১ ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি ও আইন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ১৩৮
১৪২ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩৮

ওপর হদ জারী করা হবে না।[১৪৩] যে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়নি যেমন সাক্ষ্য ছাড়া বিয়ে করা কিংবা যে বিয়ের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে যেমন অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা। কেউ যদি এ ধরনের বিয়ে করে সহবাস করে, তাহলেও তার উপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না। এ বিষয়ে ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই।[১৪৪] বিবাহিত মুহসান নারী বা পুরুষের যিনার হদযোগ্য শাস্তি কার্যকর করার জন্য কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারবে না। কেননা শরি'য়তের সাধারণ মূলনীতি হল 'সন্দেহ শাস্তিকে পরাহত করে'। ফলে বাতিল বিয়ে হোক আর ফাসিদ বিয়ে হোক কোন নারী-পুরুষ পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যৌন মিলন করে তাহলে তা হদযোগ্য শাস্তির আওতায় পড়বে না। কারণ এ বিষয়ে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে যে, হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সন্দেহ হলে শাস্তি রহিত করে দাও।[১৪৫]

যিনার-ব্যভিচারের প্রমাণ (The proofs of Adultery)

আল-কুর'আন যেনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর আবশ্যকতা ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের আয়াতগুলো হচ্ছে,

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জতার কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ না করেন।'[১৪৬] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (যিনার) অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না'...[১৪৭]

---

১৪৩ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৮৫-৬; ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী, *বদা'ই সানাই* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৭), প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৫-৬

১৪৪ আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.৩৫; ইবনু কুদামাহ, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৫

১৪৫ ইমাম আবু হানীফা (র.), *মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)* (অনু. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬), হাদীস নং ৩১৫

১৪৬ আল-কুর'আন,আন- নিসা, ৪ : ১৫

১৪৭ আল-কুর'আন, আন-নূর, ২৪ : ৪

لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

'তারা কেন এই (যিনার অপবাদের) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি...'[১৪৮]

এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করলে মহানবি (স.) তাকে বলেন-'চারজন সাক্ষী হাযির কর, যারা তোমার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।'[১৪৯]

সাদ ইবন উবাদা (রা.) মহানবি (স.) কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষকে (যিনায় লিপ্ত) দেখতে পাই, আমি কি তাকে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসা পর্যন্ত অবকাশ দেব ? তিনি বলেন হাঁ।[১৫০] অতএব সাক্ষীর সংখ্যা চার এর কম হলে যেনা প্রমাণ হবে না, এই বিষয়ে উম্মতের সকল যুগের ফকীহ্গণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৫১]

যিনা প্রমাণের পদ্ধতি

নিম্নোক্ত পদ্ধতির যে কোন একটি দ্বারা যিনা প্রমাণ করা যায় :

ক) ব্যভিচারী নারী বা পুরুষের মৌখিক স্বীকৃতি

খ) চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা যিনা প্রমাণিত হওয়া। এই দুটি সর্বসম্মতিক্রমে যিনা প্রমাণের দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

১. মৌখিক স্বীকৃতি

যিনাকারী পুরুষ বা নারী যদি নিজেই মুখে স্বীকার করে যে, সে যিনা করেছে, তাহলে তা দ্বারা যিনা প্রমাণিত হবে। এরূপ স্বীকৃতির খবর শাসকদের নিকট পৌঁছলে তখন আর এই অপরাধ ক্ষমা করার কোন সুযোগ থাকে না। কারণ স্বীকারোক্তিকে বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হযরত মা'য়েজ ও গামেদী স্বীকারোক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স.) গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে কোন ইমাম দ্বিমত করেনি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- আল্লাহর শাস্তি সমূহ নিজেদের মধ্যে মাফ করে দিতে থাক। কিন্তু শাস্তি যোগ্য যে অপরাধের খবর আমাদের নিকট পৌঁছাবে, তবে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা অপরিহার্য হয়ে যায়।[১৫২] তবে এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো হল,

---

১৪৮ আল-কুর'আন, আন-নূর, ২৪ : ১৩

১৪৯ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪) খ.১, পৃ.৩১৫

১৫০ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তান, প্রাগুক্ত, কিতাবুত দিয়াত, হাদীস নং-৪৫৩৩, ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল লি'আন, হাদীস নং ১৫

১৫১ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩১০-৩১১

১৫২ সাইয়েদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৬৩

ক. স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করলেও হদ কার্যকর করা হবে না।

২. সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। পাগল ও মাতাল ব্যক্তির স্বীকারোক্তি আমলে নেয়া হবে না।

৩. বাকসম্পন্ন হতে হবে। ইশারা ও লিখিতভাবে স্বীকার মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার মতো। তবে বোবাদের স্বীকারোক্তি হানাফীগণের মতে আমলযোগ্য নয়। অন্য তিন ইমামের মতে বোবার লিখিত ও ইশারায় স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে, যদি ইশারা দ্বারা যিনা বোঝায়।[১৫৩]

৪. পূর্ণ স্বাধীনতা ও এখতিয়ার থাকতে হবে। জোর-জবরদস্তি করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

খ. স্বীকারোক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। এটা হানাফী ও হাম্বলী ফকীহগণের অভিমত। তাঁদের মতানুযায়ী চারবারের কম স্বীকারোক্তি করলে যিনার শাস্তি কার্যকর হবে না। বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইয (রা) রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে এসে যিনার স্বীকারোক্তি দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে তিনি চারবারই স্বীকারোক্তি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রথম তিন বারেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার তার কথা আমলে নিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, যদি একবার স্বীকারোক্তিই হদের জন্য যথেষ্ট হত, তা হলেই রাসূলুল্লাহ (স.) কেনই বা চতুর্থবার স্বীকারোক্তি দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। ইমাম মালেক, শাফি'য়ী, দাউদ, তাবারি ও আবুস সাওর বলেন, চার চারবার স্বীকার করার প্রয়োজন নেই; এরং একবার স্বীকার করাই শাস্তি কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট। কেননা আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে উনাইসকে রাসূলুল্লাহ (স.) যে মহিলার স্বীকারোক্তি নিতে বলেছিলেন, সে ক্ষেত্রে সংখ্যা উল্লেখ করেননি।[১৫৪]

২. ভিন্ন ভিন্ন এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে

যে সব ইমামের দৃষ্টিতে, চারবার স্বীকৃতি দিতে হবে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ হানাফীগণের মতে, এই চারবার স্বীকৃতি ভিন্ন ভিন্ন চারটি এজলাসে সম্পন্ন হতে হবে। তবে অন্যদের মতে, এক মজলিসে চারবার স্বীকৃতি দানও যথেষ্ট হবে।[১৫৫]

---

১৫৩ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৯৮
১৫৪ সাইয়েদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৩২; আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৮৯-৯২
১৫৫ ফিক্‌হুস সুন্নাহ্, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৩২; আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৮৯-৯২

৩. বিচারকের এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে।[১৫৬]

৪. স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনা সম্বলিত হতে হবে। অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কখন, কার সাথে, কোন স্থানে, কোন অবস্থায় ও কীভাবে সঙ্গম করা হল তার বিশদ বিবরণ স্বীকারোক্তিতে থাকা প্রয়োজন।[১৫৭] এ পর্যায়ে সুস্পষ্ট যিনা করার স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। তাকে স্বীকার করতে হবে যে, তার জন্য হারাম ছিল এমন একটি নারীর সাথে সে সুর্মাদানীতে কাঠি ভরার ন্যায় এই যিনার কাজ করেছে। সেই সাথে আদালতেরও এ মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, অপরাধী বাহ্যিক কোন চাপ ছাড়াই সম্পূর্ণ ও সজ্ঞানে যিনার কথা স্বীকার করেছে।[১৫৮]

৫. স্বীকারোক্তির ওপর অটল থাকতে হবে এবং স্বীকাররোক্তি প্রত্যাহার করলে শাস্তি রহিত হবে। স্বীকৃতি প্রদানে সুদৃঢ় ও অটল থাকতে হবে। বার বার স্বীকারোাক্তি থাকতে হবে এবং স্বীকৃতি ফিরিয়ে নিতে পারবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) স্বীয় অপরাধ স্বীকারোক্তকারী মা'ইজ আসলামী (রা.) কে বলেছিলেন হয়তো বা তুমি তাকে চুমু খেয়েছো অথবা স্পর্শ করেছো অথবা তার দিকে তাকিয়ে দেখেছো ? (আর এটাকেই গুরুতর পাপ বিবেচনায় ব্যভিচার বলে প্রকাশ করছো)। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.) না, তা নয়। নবী করীম (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি তার সাথে এক বিছানায় শুয়েছ'? সে বলল, হ্যাঁ, হুযুর। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি তার সাথে রতিক্রিয়া করেছ'? সে বলল, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তার সাথে সঙ্গম করেছ' ? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করিলেন, যা আরবী ভাষায় বিশেষভাবে যৌন সংগম ও রতিক্রিয়া বুঝাবার জন্য বলা হলেও তা ছিল অশ্লীল শব্দ। এরূপ অশ্লীল শব্দ নবী করীম (স.) এর মুখে এর পূর্বেও কখনো শোনা যায়নি, এরপরও কখনো শোনা যায়নি। এক ব্যক্তির জীবন নাশের প্রশ্ন দেখা না দিলে রাসূল (স.) এর পবিত্র মুখে তোমার শব্দ কখনো উচ্চারিত হতো না। কিন্তু সে এর জবাবেও হ্যাঁ বলে দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সেই অঙ্গ তার সেই অঙ্গের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল'? সে বলল হ্যাঁ। পুনরায় জিজ্ঞেসা করলেন, 'তা কি ঠিক সেইরূপ, যেমন করে কাঠি সুরমাদানীর মধ্যে ঢুকে যায় এবং পানি তোলার রশি কুপের ভিতরে চলে যায় ? সে বলল, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, যিনা কাকে বলে তা কি তুমি জান ? সে বলল, জি হ্যাঁ। আমি তার সাথে অবৈধভাবে সেই কাজ করেছি যা স্বামী বৈধভাবে নিজের স্ত্রীর সাথে করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি বিবাহ হয়েছে ? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি মদ খাও নাই তো ? সে বলল, না। এক ব্যক্তি উঠে তার মুখ শুকে দেখল এবং তার কথার সত্যতা

---

১৫৬ আব্দুল কাদের আওদাহ্, *আল তাশরিয়ী'ল জিনায়ী আল-ইসলামী* (বৈরূত: মুয়াছছাছাতু আল- রিসালাহ, ১৪০১ হি.) খ.২, পৃ. ৩৯৫

১৫৭ ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৩৩; ইবনু কুদামাহ, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৬১

১৫৮ সাইয়েদ আবুল আ 'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৮৮

স্বীকার করলো। অতঃপর নবী করীম (স.) মহল্লাবাসীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এই লোকটি পাগল নয় তো? তারা বলল, ‘আমরা তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে কোনরূপ দোষ দেখিনি।, তিনি হাজ্জালকে বলিল, ‘তুমি যদি এর বিষয়টি লুকিয়ে রাখতে তবে তোমার পক্ষে খুবই ভালো হতো। অতঃপর নবী করীম (স.) মাইজকে ‘রজম’ (প্রস্তরঘাতে হত্যা) করার ফয়সালা জারী করলেন। মোটকথা মা‘ইজকে তার স্বীকারোক্তির সম্ভাব্য সকল সুযোগই দিয়েছিলেন কিন্তু তার মনে আল্লাহর ভয় এত বেশি পরিমাণে ক্রিয়া করেছিল যে, সেরূপ কোন সুযোগই তিনি গ্রহণ না করে স্বীকারোক্তিতে অবিচল থাকেন।[১৫৯] যদি স্বীকারোক্তি প্রদানকারী নারী-পুরুষ কোন পর্যায়ে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ কার্যকর করা যাবে না। তাছাড়া হদ কার্যকর করার সময়েও যদি কেউ নিজের স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে, তাহলে বাকী হদ কার্যকর করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা‘ইয (রা.) যখন পাথরের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে পালাতে শুরু করলেন, তখন লোকেরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরে ফেলে এবং প্রস্তারাঘাতে তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘটনাটি জানতে পেরে বললেন, ‘তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? হয়ত সে তাওবা করত এবং আল্লাহও তার তাওবা কবুল করতেন’।[১৬০] এ থেকে জানা যায় যে, স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তার ওপর হদ কার্যকর করা যাবে না। স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এরূপ অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যায় না।[১৬১]

৬. অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পর স্বীকারোক্তি দান

অধিকাংশ ইমামের মতে, অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পরেও যদি কেউ যিনার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তা আমলে নিয়ে হদ কার্যকর করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যদি কেউ চল্লিশ বৎসর পরে এসেও স্বীকার করে, তাহলেও আমি তার ওপর হদ কার্যকর করব।[১৬২]

৭. সাক্ষ্য-প্রমাণ যিনা প্রমাণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো সাক্ষ্য-প্রমাণ। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাবে। তবে এ জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন

ক. সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. সাক্ষীদেরকে মুসলিম হতে হবে; পুরুষ হতে হবে এবং সাক্ষীর সংখ্যা চারজন হতে হবে। অমুসলিমদের সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদের প্রত্যেককে মুসলিম হতে হবে। যদি

---

১৫৯ ইবরাহীম আহমাদ আল-অকফী, *তিলকা হুদূদুল্লাহ* (পাকিস্তান: ইসলামাবাদ, দারুল ইলম, ১৯৮৩), পৃ. ৩১
১৬০ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশ্‌শয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ৪৪১৯
১৬১ ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২২২-২৩
১৬২ আস সারাখসি, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৯৭

কোন একজন সাক্ষীও অমুসলিম হয়, তাহলে সাক্ষ্যের সংখ্যা পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

'তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও।'[১৬৩] এ আয়াতে ' مِّنكُم শব্দের মধ্যে যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়েছে তা পুরুষবাচক শব্দ। এখানে مِّنكُم 'তোমাদের মধ্য থেকে এর দ্বারা কেবল মুসলিম পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এই মুসলিম পুরষদের সংখ্যা হবে চার যা আয়াতের 'নস' দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কেননা উপরে বর্ণিত তিনটি আয়াত যথাক্রমে সূরা আন-নিসার ১৫ নং আয়াত, সূরা আন-নূরের ৪ নং ও ১৩ নং আয়াতে হদযোগ্য যিনা প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যপারে চার মাযাহাবের ইমামগণ একমত। অতএব যদি সাক্ষীদের সংখ্যা একজনও কম হয় অথবা চারজন পুরুষ সাক্ষীর পরিবর্তে কোন মহিলা সাক্ষীর সাক্ষ্য যিনা প্রমাণের কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।[১৬৪]

২. সাক্ষীদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

অর্থাৎ 'সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে থেকে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক'।[১৬৫] এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষী যদি প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা সে পুরুষ হিসেবে গণ্য নয়, এবং তার সাক্ষ্যের উপর জনসাধারণের কোন আস্থা বা সন্তুষ্টি থাকে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত, বালক যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ মস্তিক হয়'।[১৬৬] অতএব অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও পাগলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।[১৬৭]

৩. সাক্ষীদের প্রত্যেককে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদের প্রত্যেককে সত্যবাদী হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 'তোমাদের মধ্য

---

১৬৩ আল-কুর'আন, আন-নিসা, ৪ : ১৫
১৬৪ সাইয়েদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩৫ ; সাইয়েদ আবুল আ 'লা মওদুদী, খ.৯, পৃ. ৮৫
১৬৫ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ২৮৫
১৬৬ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ১৭৫৯
১৬৭ সাইয়েদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩৪

থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে'।[১৬৮] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

'হে মুমিনগণ! যদি কেনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না করো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও'।[১৬৯] উপরোক্ত আয়াত দু'টি প্রামাণ করে, কোন পাপাচারী ও মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. সাক্ষীদেরকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। যিনা প্রমাণের জন্য বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, বোবার সাক্ষ্য ইঙ্গিতে হোক বা লিখিত হোক গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৭০]

৫. সাক্ষীদেরকে আইনগত ও শার'য়ী প্রতিবন্ধকতা হতে মুক্ত থাকতে হবে। শরি'য়তের সাক্ষ্য আইনের দৃষ্টিতে সাক্ষীদেরকে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। যেমন সাক্ষীগণ নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কিংবা একান্ত আদর, মহব্বতের শ্রেণীভুক্ত হতে পারবে না।[১৭১] সাক্ষীগণ এরূপ হতে হবে যে, তারা ইতিপূর্বে কোন মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়নি অথবা তারা ইতিপূর্বে কোনরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়নি অথবা তারা বিশ্বাসঘাতক বা আমানতের খিয়ানতকারীও নয়।[১৭২]

৬. সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে। সাক্ষীদের থেকে শুনে কেউ সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৭৩] সাক্ষীদেরকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, সুরমাদানীর মধ্যে সুরমা লাগানোর কাঠি যেমন ঢোকা অবস্থায় থাকে, তেমনি তারা পুরুষাঙ্গকে নারীর যোনীর মধ্যে ঢোকানো অবস্থায় দেখেছে। কেননা অনেক সময় সাক্ষীরা এমন অনেক আচরণকে যিনা মনে করে নিতে পারে যে, যা মূলত যিনা নয়। তাই এ ক্ষেত্রে যিনার বিবরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেমন হাদীসের ভাষ্য হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) পরপর চারবার যিনার স্বীকারোক্তিকারী মাইয আসলামীকে বলেছিলেন, 'হয়তো বা তুমি তাকে চুমু খেয়েছো অথবা স্পর্শ করেছো অথবা তার দিকে তাকিয়ে দেখেছো ? (আর এটাকেই গুরুতর পাপ বিবেচনায় ব্যভিচার বলে প্রকাশ করছো) এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) আভাস ইংগিত বাদ দিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় তাকে

---

১৬৮ আল-কুর'আন, আত- তালাক, ৬৫ : ২
১৬৯ আল-কুর'আন, আল-হুজরাত, ৪৯ : ৫
১৭০ আস- সারাখসি , প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ. ১৩০
১৭১ ইবনে হুমাম, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২২৭
১৭২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৮৫
১৭৩ আস সারাখসি, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৬৭

জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, হ্যাঁ পুরনায় তিনি বললেন, সুর্মার শলাকা যেভাবে সুর্মাদানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে ? সে বললো, হ্যাঁ।[১৭৪] এরূপক্ষেত্রে মানুষের শরীরের গোপনীয় অংশে দৃষ্টি দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে সাক্ষ্য দানের উদ্দেশ্যে, যেমন ডাক্তার ও ধাত্রীর জন্য অনুমতি আছে।[১৭৫]

৭. সাক্ষীদের দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে, দৃষ্টি প্রখর ও দর্শন ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে এবং সাক্ষীদের স্মরণ শক্তি প্রখর থাকতে হবে। অতএব অন্ধের সাক্ষ্য তা বর্ণনা ভিত্তিক কিংবা শ্রুতিভিত্তিক হোক তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রুপ চক্ষুষ্মানের জন্য দর্শনীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। যারা বেশি ভুলে যায় ও যাদের বেশি ভুল হয় তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।[১৭৬]

৮. সাক্ষীগণ কবে, কোথায়, কাকে, কি অবস্থায়, কখন, কোথায় ও কার সাথে যিনা করতে দেখেছে, এ বিষয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণ একমত হতে হবে।[১৭৭] এ থেকে জানা যায়, তারা দুজনে যিনা করেছে- সাক্ষীদের এমন কথার ওপর ভিত্তি করে কারো ওপর হদ কার্যকর করা যাবে না। যদি নারী-পুরুষকে একত্রিত অবস্থায় পাওয়া কিংবা রতিক্রিয়াপূর্ব শৃংগারে করিতে দেখা অথবা উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে কাউকে যিনাকারী গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়।[১৭৮]

৯. নারীর জননেন্দ্রিয়ে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের প্রবেশের বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করতে হবে, আভাসে ইংগিতে নয়।[১৭৯]

১০. চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য একই বৈঠকে পেশ করতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য একই বৈঠকে হতে হবে। যদি সাক্ষীরা বিচ্ছিন্নভাবে এক এক জন করে কিংবা দুজন দুজন করে বা তিন জন এক সাথে আর অপর একজন পৃথকভাবে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু, তাদের সকলের ওপর যিনার অপবাদ দেয়ার শাস্তি কার্যকর করা হবে। তবে শাফি'ঈগণের মতে এ শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন নয়। যদি তারা সম্মিলিত কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে সাক্ষ্য দেয়, একই মজলিসে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

১১. সাক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের সাহায্যে কোন রূপ পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন যদি দুজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা জুম'য়ার (শুক্রবার) দিন যিনা করেছে এবং অপর দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, তারা শনিবারে যিনা

---

১৭৪ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ৭১
১৭৫ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩৪
১৭৬ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, *নাইলুর আওতার* (বৈরূতঃ দার আল-ফিকর, ১৪০২ হি.), খ.৪, পৃ. ২২৭
১৭৭ তাফহীমুল কুর'আন, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৮৫
১৭৮ প্রাগুক্ত।
১৭৯ সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩৪

করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি তাদের দুজন দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যিনার সাক্ষ্য দেয় আর অপর দুজন যদি দিনের অন্য সময়ে যিনার সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে গরমিল হলে তা ধর্তব্য হবে না। তদুপরি সাক্ষীদের মধ্যে কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিলেও যিনা প্রমাণিত হবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীগণের কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তা বিবেচ্য হবে না।[১৮০]

১২. সাক্ষ্য দানে বিলম্ব না করা হানাফি মাযহাব অনুসারে, যিনার অপরাধ সংঘটিত হবার দীর্ঘ দিন পর যিনার সাক্ষ্য দেয়া হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা কাউকে কোন অপরাধে লিপ্ত হতে দেখার পর প্রত্যক্ষকারীর এ ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছে করলে সমাজের সার্বিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সাক্ষ্য পেশ করবে।[১৮১] অথবা অপরাধটি গোপন করে রাখবে।[১৮২] অপরাধ দেখার পর দীর্ঘ দিন নীরব থাকার মানে হল সে দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিয়েছে। আর দীর্ঘ দিন পর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এখন সাক্ষ্য প্রদান করছে। অধিকন্তু, যে সাক্ষ্য সম্পর্কে জানা যাবে যে, সাক্ষীদাতা কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৮৩] কেননা হযরত ‘উমর (রা) বলেন, ‘যে সব লোক হদের কোন অপরাধ সংঘটিত হবার সময় সাক্ষ্য না দিয়ে অন্য সময় সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা হিংসা-বিদ্বেষমূলকভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৮৪] ‘অন্যান্য ইমামগণের মতে, যিনার অপরাধ সংঘটিত হবার দীর্ঘ দিন পরেও যদি যিনার সাক্ষ্য দেয়া হয়, তাও গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের কথা হল, যুক্তি সঙ্গত বিভিন্ন কারণেও সাক্ষ্য প্রদানে বিলম্ব হতে পারে।[১৮৫]

১৩. সাক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারবে না।[১৮৬] হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, ‘যে সম্প্রদায় হদের সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু হদের মামলা আদালতে উত্থাপিত হলে আর সাক্ষ্য দেয় না, সুনিশ্চিতভাবে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৮৭] রাসূলুল্লাহ (স.)-এ

---

১৮০ আস- সারাখসি, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৬১-৬২; ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৮৫
১৮১ দ্র. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা সত্য সাক্ষ্য দাও। আল-কুর'আন, আত-তালাক, ৬৫ : ২
১৮২ রাসূল্লাহ (স.) বলেছেন,‘যে কোন মুসলিমের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করে রাখবে।’ দ্র. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ আল- কাযবীনী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ২৫৪৪
১৮৩ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ.৯; পৃ. ৯৭-১১৫, আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৬
১৮৪ আস-সারাখসী, খ.৯, পৃ. ৯৭-১১৫, আল-কাসানী, খ.৭, পৃ.৪৬
১৮৫ যেমন অসুস্থ হয়ে যাওয়া বা জরুরী প্রয়োজনের দূরে কোথাও গমন করা প্রভৃতি।
১৮৬ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৫৬-৯,
১৮৭ মুসনাদে আহমদ, কায়রো : আল- মাকতাবা আল-ইসলামিয়া, ১৯৩০হি.,খ.৩, পৃ. ৯১, হাদীস নং ২৫৭, ২৮৯

প্রসঙ্গে বলেন, 'যে মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন রাখে। আল্লাহ তা'য়ালা আখিরাতে তাঁর দোষ গোপন করবেন'।[১৮৮] এটা হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত। তাতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত।[১৮৯]

কেন চারজন স্বাক্ষী ?

ক) কোন নারী যখন তার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তখন অভিযুক্ত চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর স্বাক্ষ্য ছাড়া অভিযুক্ত নারীকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা যাবে না।

ইসলামী শরি'য়ত পারতপক্ষে অপরাধের কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করতে চায় না

আবু দাউদের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- মাইজ ইবনে মালিক আসলামী যখন নিজ জবানে মহানবি (স.)-এর নিকট চারবার যিনার অপরাধের কথা স্বীকার করেন তখন মহানবি (স.) তাকে রজম এর শাস্তি দিলেন, অপর দিকে তার অভিভাবক হাজ্জাল ইবনে নু'আইম (রা.) কে বললেন, 'তুমি যদি তার অপরাধকে লুকিয়ে রাখতে তবে এটা তোমার জন্য ভালোই হত। (আবু দাউদ) মাইজ (রা.) মসজিদে-নববীতে গিয়ে মহানবি (স.) এর নিকট বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন, আমি যিনা করেছি। মহানবি (স.) এটা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আহ্ যাও, চলে যাও, আল্লাহর নিকট তওবা কর ও ক্ষমা চাও। যখন তাকে প্রস্তারাঘাতের তিব্রতা স্পর্শ করল তখন তিনি দ্রুতবেগে ছুটে পালালেন, তখন তিনি এমন এক ব্যক্তির মুখোমুখি হলেন যার হাতে একটি উটের চোয়াল ছিল। সে ব্যক্তি তা দিয়েই তাকে আঘাত করলো এবং অন্যরা তাকে প্রহার করতে লাগলো এমনকি তার মৃত্যু হয়ে গেল। তারা রাসুলুল্লাহ (স.) এর নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত করলে তিনি বললেন 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন ? হয়তো সে তওবা করে নিতো এবং আল্লাহ ও তার তওবা কবুল করে নিতেন।

বুখারীতে ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এ প্রসঙ্গে বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ উক্ত ঘটনার স্বীকারোক্তিকারী মাইয আসলামীকে বলেছিলেন 'হয়তো বা তুমি তাকে চুমু খেয়েছো অথবা স্পর্শ করেছো অথবা তার দিকে তাকিয়ে দেখেছো ? (আর এটাকেই গুরুতর পাপ বিবেচনায় ব্যভিচার বলে প্রকাশ করছো)[১৯০]

মোটকথা তাকে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের সম্ভব্য সকল সুযোগই তিনি দিয়েছেলেন, কিন্তু আল্লাহ্র বান্দার মনে আল্লাহ তা'য়ালার ভয় এত বেশি পরিমাণে ক্রিয়া করেছিল যে, সেরূপ কোন সুযোগই তিনি গ্রহন করেন নি। এজন্যই সাহাবীগণের কেউ কেউ যখন তিনি পরকালে মুক্তি পাবেন কিনা তা নিয়ে

---

১৮৮ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬
১৮৯ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৫৬-৯
১৯০ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল- খতিব আল-তিবরিযী, *মিশকাত আল-মাসাবীহ্* (ইউপি: মাকতাবাতে থানবী, তা.বি.), হাদীস নং ৩৪০৪

বাদানুবাদ করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'সে এমনি তওবা করেছে যে, যদি গোটা উম্মতের মধ্যে তার সে তওবাকে ভাগ করে দেয় হয় তবে তা সকলেরই মুক্তির জন্যেই যথেষ্ট বিবেচিত হবে'।[১৯১]

বস্তুত আল-কুর'আন অবিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি একশতটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছেন। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ্ বিবাহিতদের ব্যভিচারের শাস্তি 'রজম' তথা পাথর বর্ষণে হত্যার বিধান নির্ধারণ করেছে। এর পিছনে সুদূরপ্রসারী দর্শন হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার কলুষতা হতে মুক্ত ও পুতঃ-পবিত্র রাখা। তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুরসহ প্রাচীন প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থ ও লিখিত আইনে (হামুরাবি আইন, রোমান আইন, গ্রিক আইন) প্রসঙ্গ ব্যভিচারের শাস্তি হয় 'রজম' অথবা মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ইহুদী এবং খ্রিষ্টানগণ তাদের আসমানী কিতাবের বিধান হতে বিচ্যুত হয়ে 'রজমের' পরিবর্তে মনগড়া শাস্তির বিধান তৈরি করে নেয়। আধুনিককালের ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচার বুঝাতে 'Fornication' এবং অবিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচার বুঝাতে 'Adultery' পরিভাষা সৃষ্টি করে শুধুমাত্র Adulter এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে, কিন্তু 'Fornication' এর ব্যাপারে তাদের কোন বক্তব্য নেই। এটা সভ্যতার বিপর্যয় এবং চরম নৈরাজ্যকর এক ব্যবস্থা- যেখানে অবিবাহিত নারী-পুরুষদের ব্যভিচারের জন্য অবাধ লাইসেন্স খুলে দেয়। অপরদিকে তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার দাবীদাররা ব্যভিচারের সংজ্ঞাকেই পাল্টে দিয়েছে। তাদের মতে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধ যৌনাচার দোষের কিছু নয়। কেবলমাত্র বলপূর্বক যৌনাচারকে 'rape' বা ধর্ষণ নামে সংজ্ঞায়িত করে এ অপরাধের সীমিত দণ্ড নির্ধারণ করেছে। ফলে পাশ্চাত্য জগতের পরিবারগুলো আজ ক্ষত-বিক্ষত, সেখানকার সমাজের সর্বত্র উলঙ্গপনা ও ব্যভিচারে সয়লাব। যার পরিণতিতে পাশ্চাত্য সমাজে নারী আজ লালসার পণ্য, সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে হতাশা, লক্ষ্যহীন নীতিভ্রষ্ট জীবন এবং আত্মহত্যার ছড়াছড়ি।

---

১৯১ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত আইন

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপ করাকে 'কাযাফ' বলে। কোন ব্যক্তিকে যিনা ও সমকামের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করাকে আরবি পারিভষিক নাম দেয়া হয়েছে 'আল- কাযাফ'। সাধারণভাবে ঠাট্টা বা বিদ্রূপছলে একজন অপরজনকে বলে, হে ব্যভিচারী। অথবা বলে, আমি অমুককে যিনা করতে দেখেছি। ইসলামী শরি'য়তের দৃষ্টিতে এ ধরণের ব্যাক্তি কাযাফ পর্যায়ে গণ্য। আল-কুর'আনে ব্যভিচারের অপবাদ বোঝাতে কাযাফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি বরং 'ইয়ারমুনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। يَرْمُونَ ('ইয়ারমুনা') শব্দটি 'আর-রাময়ু' শব্দ হতে উদ্ভুত। 'আর-রাময়ু' এর অর্থ নিক্ষেপ করা অথবা ছুড়ে মারা যা কাযাফ শব্দের সমার্থবোধক। যেমন আরবি ভাষায় বলা হয় সে অমুককে কদর্য বিষয়ে অপবাদ দিয়েছে অর্থাৎ তার বংশধারার প্রতি অশ্লীলতা তথা ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছে।[১৯২] 'আর-রাময়ু' শব্দের মূল অর্থ পাথর নিক্ষেপ করা। পরবর্তীতে জিহ্বা বা ভাষার মাধ্যমে শব্দবাণ নিক্ষেপ অর্থে 'আর-রাময়ু' শব্দটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেননা শব্দ বা ভাষার মাধ্যমে কাউকে আঘাত করলে তার অনুভূতি অসহনীয় যন্ত্রনায় ক্লিষ্ট হয়।[১৯৩] ইসলামী শরি'য়তের পরিভাষায় কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট আকারে কিংবা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদ আরোপ করাকে কাযাফ বলা হয়।[১৯৪] সতী-চরিত্রবান নারীর প্রতি যিনার অপবাদ ছুড়ে দেয়াকে কাযাফ বলা হয়।[১৯৫]

ব্যভিচারের অপবাদের দণ্ড

আল-কুর'আন ব্যভিচারের অপবাদের তিন প্রকারে শাস্তি ঘোষণা করেছে। ১. আশি বেত্রাঘাত ২.সাক্ষ্য প্রত্যাখান ৩. অপবাদ দানকারীকে ফাসিক হিসেবে গণ্য করা, অর্থাৎ দাগী অপরাধী হিসেবে ব্ল্যাক লিস্টের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (যিনার) অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি 'বেত্রাঘাত মার এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা। এরা তো সত্যত্যাগী।

---

১৯২ ইব্রাহিম মুস্তফা ও অন্যান্য, *মু'জামুল ওয়াসিত* (দিল্লি : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, তা.বি), পৃ.৩৭৫
১৯৩ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৩০,
১৯৪ ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, প্রগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২০৩-২০৪
১৯৫ আব্দুল কাদের আওদাহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৫৫

তবে যদি এরপর তারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। [১৯৬]

আলোচ্য আয়াতে 'يَرْمُونَ' শব্দের অর্থ যে সব লোক মিথ্যা দোষারোপ করে। এখানে দোষারোপ বলতে সব রকমের ' দোষারোপ' বা অপবাদ নয় বরং বিশেষভাবে যিনার দোষারোপকে বুঝানো হয়েছে।[১৯৭] আয়াতে বর্ণিত 'আলমুহসানাত' দ্বারা বিবাহিত নারী উদ্দেশ্য নয় বরং সচ্চরিত্রবতী নারী। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সেই ধরণের ' দোষারোপকে বুঝানো হয়েছে যা চারিত্রিক পবিত্রতার বিপরীত হবে। উপরন্তু দোষারোপকারীদের নিকট দোষারোপের প্রমাণ হিসেবে চারজন সাক্ষী পেশ করার দাবি করা হয়েছে। এসব কারণে মুসলিম জাতির ফকীহগণ একমত যে, এ আয়াতে শুধু যিনার দোষারোপ কথা বলা হয়েছে। এজন্য যিনার মিথ্যা দোষারোপ বুঝাতে ফিকহ্ শাস্ত্রে 'কাযাফ' নামে একটি স্থায়ী স্বতন্ত্র পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যেন অন্যান্য দোষারোপসমূহ (যেমন, কাউকে চোর, মদখোর, সুদখোর, বা কাফির বলা) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে।[১৯৮]

যে কোন অপবাদই হচ্ছে কোন ব্যক্তির সম্মানহানীর একটা নিন্দনীয় অপচেষ্টা। বিশেষত ব্যভিচার ও চারিত্রিক স্খলনের অপবাদদান অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং তা একটি কবীরা গুনাহ হওয়ার সাথে সাথে শাস্তিযোগ্য অপরাধও। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) এজন্য অপবাদকারীদের শাস্তি কার্যকরী করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর উপর 'ইফক' তথা মিথ্যা অপবাদের শাস্তি স্বরূপ হযরত মিসতাহ ইবনে আসাসা. (রা.) হাস্সান বিন সাবিত (রা.) ও হামনা বিনতে জাহাশ (রা) কে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়।[১৯৯]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা মিথ্যা দোষারোপ বা অপবাদ বুঝানো হয়নি বরং বিশেষভাবে যিনার দোষারোপকে বুঝানো হয়েছে।[২০০]

الْغَافِلَاتِ শব্দের অর্থ সহজ সরল, সাধাসিধা ও ভদ্র স্ত্রীলোক যারা কোন ছল-চাতুরী জানে না, যাদের হৃদয় নির্মল ও পবিত্র যারা চরিত্রহীনতা ও পাপাচার এমনকি অসভ্য আচরণ কিভাবে করতে হয় তাও জানে না। তাদের বিরুদ্ধে কেউ চরিত্রহীনতার অভিযোগ তুলতে পারে, এটা যদিও চিন্তা-ভাবনায় কখনো

---

১৯৬ আল-কুর'আন, আন- নূর , ২৪ : ৪
১৯৭ সাইয়েদ আবুল আ 'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত খ.৯, পৃ. ১০২ ; মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২৬
১৯৮ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ১০২
১৯৯ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), প্রাগুক্ত, খ.১, হাদিস নং ৩৪৬; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, খ.১৪, পৃ. ১০৫১
২০০ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, খ. ১৩১

আসেনা।[২০১] রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিষ্কলুষ সতী-সাধ্বী ও চরিত্রবতী নারীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা অত্যন্ত সাতটি কবীরা গুনাহের মধ্যে শামিল, তাবরানীতে হযরত হুজায়ফার বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'একজন সচ্চরিত্র সতী-সাধবী নারীর উপর চরিত্রহীনতার দোষারোপ করা একশত বছরের আমল বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ।[২০২]

অপবাদ আরোপ হারাম

মানুষের মান সম্ভ্রমের হেফাজত ইসলামের একটা প্রধান লক্ষ্য। তাদের সুনাম ও সম্মান সংরক্ষণ তার দৃষ্টিতে অতীব জরুরি। এ উদ্দেশ্যেই ইসলামের কুৎসা রটনাকারীদের জিহ্বাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ অন্বেষণের পথ রোধ করে। অসংযত লোকেরা যাতে মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে আহত করতে ও তাদের মান সম্ভ্রমের হানি ঘটাতে না পারে, সেজন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। সর্বাধিক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা বেহায়াপনা ও ব্যভিচারে বিস্তার ঘটানোকে; যাতে সমাজ জীবন এই ঘৃণ্য পাপাচার থেকে পবিত্র ও মুক্ত থাকে। এ উদ্দেশ্যেই ইসলাম ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এটিকে একটি কবীরা গুনাহ ও জঘন্য অশ্লীলতা বলে আখ্যায়িত করেছে, চাই সে নারী হোক কিংবা পুরুষ। তাকে চিরতরে সাক্ষ্য দানের অযোগ্য ঘোষণা করেছে, তাকে ফাসেক বা পাপাচারী, অভিশপ্ত ও আল্লাহ রহমত থেকে বিতাড়িত বলে অভিহিত করেছে এবং তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহকালে ও পরকালে মর্মান্তিক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা'।[২০৩]

এই নিষেদ্ধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা উপলক্ষে। আয়েশা (রা.) বলেন, যখন অপবাদ থেকে আমার অব্যাহতি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা উল্লেখ করেন এবং কুর'আনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন। মিম্বর থেকে নেমেই তিনি অপবাদ আরোপকারী দু'জন হাসান ও

২০১ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৩
২০২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, খ. ১৩১
২০৩ আল-কুর'আন, আন- নূর, ২৪ : ১৯

মিসতাহকে এবং একজন মহিলা হিমনাকে অপবাদ আরোপের শাস্তি প্রদানের আদেশ দিলেন এবং তা প্রদান করা হলো'।[২০৪]

অপবাদ আরোপকারীর ইহকালীন শাস্তি

অপবাদ আরোপকারী যা বলেছে, তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করতে না পারলে তার জন্য দুটো শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে, এক. আশিটি বেত্রাঘাত, দুই. চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান এবং তাকে ফাসিক বা পাপাচারী হিসেবে আখ্যায়িত করা। কেননা সে আল্লাহ ও মানুষের নিকট অন্যায়পরায়ন ও অবিশ্বস্ত হয়ে যায়। এই অপবাদ আরোপকারী তওবা করে শুধরে না গেলে তার এই শাস্তি সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই।[২০৫]

সূরা আন-নূর- এ বর্ণিত ৪ ও ৫ নং এই দুটো আয়াত প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি অন্য এমন কাউকে অপবাদ দেয়, যে সৎ ও পবিত্র এবং যিনা কাকে বলে তাও জানে না, তার জন্য তিন রকমের শাস্তি, যদি সে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে। শাস্তিগুলো হচ্ছে ১. ৮০ টি বেত্রাঘাত ২. তার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। ৩. শহরে তার অপবাদের শাস্তির কথা প্রকাশ করে দিতে হবে, যাতে করে লোকেরা এ জাতীয় তৎপরতা থেকে বিরত থাকে। তওবা করার পূর্ব পর্যন্ত তার এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। নারী বা পুরুষ যার বিরুদ্ধেই অপবাদ দেয়া হয়, এ শাস্তি সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শরি'য়তের মৌলিক বিষয়ে, দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা মুকাল্লাফ হতে হবে। অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিমান, প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্বাধীন হতে হবে। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত একটি শর্ত হল সে ব্যভিচার হতে মুক্ত পবিত্র থাকতে হবে।[২০৬]

অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখান

সূরা আন-নূরের ৪ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা কোন সতী রমনীকে অপবাদ দেয় তৎপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে এই সকল অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য সম্পর্কে শরি'য়তের বিধান হলো

ক) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার শাস্তি আশিটি কশাঘাত ।

খ) তাদের সাক্ষ্য সর্বআদালতে চিরকালের জন্য অগ্রাহ্য ।

গ) তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদরে জন্য আছে মহাশাস্তি।

---

২০৪ আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস- সিজিস্তানী (র.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪১৭
২০৫ সাইয়েদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫১
২০৬ হাসান আইয়ুব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ* (অনু. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স), পৃ.১৬৪

উপরোক্ত আয়াত বিশ্লেষণ করে যে বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে, অভিযোগকারী যদি স্বাধীন ও শরি'য়ত পালনে বাধ্য হওয়ার উপযোগী হয় এবং অভিযোগটা হয় যিনা সংক্রান্ত। এমতাবস্থায় অভিযোগটা যদি মিথ্যা হয় বা প্রমাণিত না হয় তাহলে অভিযোগকারীকে আশিটি কশাঘাত করতে হবে। অপরপক্ষে অভিযোগটি যদি যিনা বা পুংমৈথুন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হয়, আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে তার উপর তা'যীর ধার্য হবে।[২০৭]

সকল ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি অপবাদকারী তওবা না করে,তবে তার কোন সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। হানাফীগণের মতে, যদি সে তওবা করে, তার থেকে ফাসেকের কলঙ্ক মুছে যাবে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[২০৮]

অপবাদ আইনের দর্শন

আল-কুর'আন ব্যভিচারের শাস্তি যেমন কঠোর তদ্রুপ ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি বাস্তবায়নের পন্থা আরো কঠিন। নিম্নে ব্যভিচারের অপবাদের হদ আইনের দর্শন তুলে ধরা হলঃ

কারো বিরুদ্ধে অসত্য যিনার অভিযোগ তোলা অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের অপরাধ। এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া সমাজে খুব ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। তাতে সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি জনগণের আস্থা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সমাজে যে ব্যাপক প্রচারণা ও রটনা চলতে থাকে তার কুপ্রভাব মুছে ফেলা তার পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হয় না। এ অবস্থা আরো মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নারী হয়। এই কলংক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃপুরুষ এমনকি গর্ভজাত সন্তানের মুখকে কালিমা লিপ্ত করে। অবিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে এই অপবাদের কলংক মাথায় নিয়ে সারজীবন কাটাতে হয়। এই বিধানটির তাৎপর্য হচ্ছে সমাজে লোকদের গোপন প্রণয়-প্রেম এবং অবৈধ সম্পর্কের কিসসা- কাহিনীর চর্চা ও আলোচনাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। ইসলামী শরি'য়ত এই খারাপ ভাবধারাকে প্রথম পদক্ষেপে বন্ধ করে দিতে চায়। এজন্য একদিকে সে হুকুম দেয়, কেউ যিনা করলে এবং সাক্ষ্য প্রমাণে এর প্রমাণিত হলে তাকে এমন চরম ধরনের শাস্তি দিতে হবে, যা অপর কোন অপরাধেই দেয়া হয় না। আর অপরদিকে শরি'য়ত এই ফায়সালা করে যে, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলে, তবে সে

---

২০৭ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

২০৮ আবু বকর আহমাদ আল-জাস্সাস (র.), *আহকামুল কুর'আন* (বৈরূত : দার আল- কিতাব আল- আরাবী, ১৩৫৫ হি), খ. ৩, পৃ.৩৯৯-৪০১

হয় সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা এর প্রমাণ করবে, আর তা না পারলে তার উপর ৮০ ঘা চাবুক মারতে হবে, যেন সে নিজের মুখে এই ধরনের প্রমাণহীন কথাবার্তা আর কখনো উচ্চারণ না করে। [২০৯]

এই বিধান কার্যকর হবে কেবল তখনই, যখন দোষারোপকারী কোন সচ্চরিত্র পুরুষ বা সচ্চরিত্র নারীর উপর দোষারোপ করবে। কোন চরিত্রহীন নারী বা পুরুষের উপর এই দোষারোপ করা হলে এই শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কোন 'চরিত্রহীন' ব্যক্তি যদি খারাপ কাজে সুপরিচিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে মিথ্যা দোষারোপের কোন প্রশ্ন উঠেনা। কিন্তু সে যদি এইরূপ না হয় তবে তার উপর প্রমাণহীন কোন দোষ আরোপ করা হলে বিচারক আরোপকারীর জন্য যে কোন শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন কিংবা এই ধরনের অপরাধের জন্য আইন-পরিষদ প্রয়োজন মত কোন আইন রচনা করতে পারে।

'কাযাফ' যিনার (মিথ্যার দোষারোপ) সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ কিনা, এই সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আবী-লাইলা বলেন, এটা আল্লাহর হকের উপর হস্তক্ষেপ; অতএব যার উপর 'কযফ' করা হয়েছে সে দাবি করুক আর নাই করুক, কাযাফকারীর উপর অবশ্যই শরি'য়ত-নির্ধারিত শাস্তি জারী করা হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং তার সঙ্গীদের মতে অপরাধ প্রমাণ করা হলে শাস্তি জারি করা ওয়াজিব, এই হিসেবে এটা আল্লাহর অধিকারের ব্যাপার। কিন্তু কাযাফকারীর বিরুদ্ধে মামলা চালানো তো যার উপর 'কাযাফ' করা হয়েছে, তার দাবির উপর নির্ভর করে। আর সেই হিসেবে তো এটা ব্যক্তির হক। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আওযায়ী এই মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালিকের মতে, যদি বিচারক বা দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর সামনে কযফ-এর অপরাধ করা হয়, তা হলে এটা সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য মামলা হবে। অন্যথায় যার উপর 'কাযাফ' করা হয়েছে, তার দাবীর উপর নির্ভর করবে এর বিরুদ্ধে মামলা করা।[২১০]

আল-কুর'আন কখনো চায় না যে, গোপনীয় কলঙ্কজনক অপরাধের কথা প্রকাশিত হয়ে সমাজ জীবন কলুষিত হোক। কারণ এরূপ অপরাধের ছিটেফুটাও যদি কেউ প্রকাশ করে তাহলে তা নারী-পুরুষের মুখে মুখে, পেটে-পেটে ফেরি হয়। এ নিয়ে নানারকম মুখরোচক গল্প, কানা-খুষা সমাজের সর্বত্র চলতে থাকে। যেই এটা শুনে সে অপরের কাছে এই লাইন বাড়িয়ে নানা রংচং মাখিয়ে বলতে থাকে। ফলে দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য যে গোপনীয়তার উপর নির্ভর করে সেই গোপনীয়তা যা স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র আমানত তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মনে হয় এটা যেন একটি দুষ্ট চক্র যা থামবার নয়। ফলে সমাজ জীবন অশ্লীলতা-বেহায়াপনার চর্চার অঘোষিত লাইসেন্স পেয়ে যায়। ফলে ইসলাম মুখ খোলার আগেই বুদ্ধিমত্তার সাথে ভেবে- চিন্তে পা বাড়ানোর কৌশল প্রত্যেকেই শিক্ষা দেয়। কারণ পাছে চারজন স্বাক্ষীর অভাবে রয়েছে ত্রিবিধ পার্থিব শাস্তির আশঙ্কা ।

---

২০৯ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
২১০ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৫

সপ্তম অধ্যায়

নর হত্যা ও চুরি সংক্রান্ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : নর হত্যা সংক্রান্ত আইন

◊ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নর হত্যা ও নর হত্যার বিধান
◊ আল-কুর'আনে নর হত্যা সম্পর্কিত বিধান
◊ নর হত্যা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য
◊ ন্যায় সঙ্গত ও সুবিচারমূলক হত্যা
◊ নর হত্যা ও এর প্রকারভেদ
◊ কিসাসের সংজ্ঞা
◊ ইচ্ছাকৃত নর হত্যার শাস্তি কিসাস
◊ কিসাস আইনের যৌক্তিকতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চুরি সংক্রান্ত আইন

◊ চুরির সংজ্ঞা
◊ চুরির শাস্তি
◊ চুরির হদ প্রয়োগের শর্তাবলী
◊ বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে চুরির সংজ্ঞা
◊ চুরির শাস্তির আইনের দর্শন
◊ চুরি সম্পর্কে রবার্ট রবার্টস কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি ও এর জবাব

সপ্তম অধ্যায়

নর হত্যা ও চুরি সংক্রান্ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নর হত্যা সংক্রান্ত আইন

বিশ্বের সকল ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নর হত্যাকে নিকৃষ্টতম নিন্দনীয় ও অমানবিক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মানুষ যখন এ অপরাধ করে তারই এক মানুষ ভাইয়ের বিরুদ্ধে তখন সে গোটা মানবতার সাথে শত্রুতা করে। সে মানুষকে হত্যা করে এবং আল্লাহর আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। আল-কুর'আনে মানব হত্যার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। একমাত্র ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধের দণ্ড হিসেবে আল-কুর'আন ন্যায়বিচারভিত্তিক 'কিসাস' তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যার মত কঠিন শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছে। পাশাপাশি 'কিসাস' এর পরিবর্তে 'দিয়াত' তথা রক্তপণের বিধানও আল-কুর'আন প্রবর্তন করেছে। 'দিয়াত' তথা রক্তপণ প্রদানের বিধানের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে সন্ধি চুক্তিমূলে হত্যাকারীর নিকট থেকে বড় ধরনের আর্থিক জরিমানা নিয়ে কিসাসের দাবী পরিত্যাগ করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। উপরন্তু নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে আল-কুর'আন এযাবৎ কালের বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে হত্যাকারীর জন্য সংশোধনমূলক, ন্যায়ভিত্তিক, মানবতাবাদী অত্যুচ্চ এক আইন সৃষ্টিতে পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছে।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নর হত্যা ও নর হত্যার বিধান

এই পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মে নর হত্যাকে ঘৃণার চোখে দেখে। নর হত্যাকারীকে সামাজিকভাবে হীন জ্ঞান এবং বয়কট করে থাকে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নর হত্যা ও এর শাস্তি সম্পর্কে বিধানাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

Old Testament - এ নর হত্যার বিধান

Old Testament - এ নর হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হল :

a. 'The man- slayer shall surely be put to death ' (cf, num, chap-35)[১]

b. 'Thine eye shall not pity him but thou shalt put away innocent blood fom israel that it may not with thee ' (Deut. 19.13)[২]

---

১ Robert Roberts, *The social Laws of the Quran* (New Delhi: kitab Bhavan, 1977) , p.83

'তাওরাত গ্রন্থে নিষ্পাপ রক্তক্ষরণের শাস্তি নিশ্চিতভাবেই মৃত্যুদণ্ড লিপিবদ্ধ ছিল। কোন অবস্থাতেই হত্যাকারীর জীবনের পরিবর্তে আর্থিক কোন জরিমানা গ্রহণের বিধান ছিল না'।

প্রাচীন মিশরে নর হত্যার বিধান

'Among the ancient Egyptians also wilful murder, even of a slave, was punishable with death; and the witness thereof who did not try to prevent the crime was similarly punished' [৩]

'প্রাচীন মিশরে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এমনকি যদি কোন দাসকে হত্যা করা হতো তাহলেও অনুরূপ শাস্তি প্রযোজ্য। কোন প্রত্যক্ষদর্শী হত্যার অপরাধ প্রতিরোধে এগিয়ে না এলে তাকেও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হত'।

রোমান আইনে নর হত্যার বিধান

রোমান আইনে যে নয়টি অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছিল, তার মধ্যে নাগরিকের উপর ইচ্ছাকৃত হত্যা অন্যতম।[৪]

হিব্রু আইনে নর হত্যার বিধান

হোমারিক জগতের নরঘাতকের শাস্তির দণ্ড নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের উপর ন্যস্ত করা হত। তারা দণ্ড স্বরূপ আর্থিক ক্ষতিপূরণ কিংবা নরঘাতককে নির্বাসনের পাঠাত।[৫]

মুসা (আ.) এর শরি'য়তে নর হত্যার বিধান

ক. 'যদি কেউ কাউকে খুন করে তবে তাকেও হত্যা করতে হবে'।[৬]

খ. 'হাড় ভাঙ্গার বদলে হাড় ভাঙ্গা, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। সে অন্যের যে ক্ষতি করেছে তারও সেই ক্ষতি করতে হবে।[৭]

গ. ইহুদিদের শরি'য়তে হত্যার বিধান ছিল কিসাস অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা।[৮]

---

২ Robert Roberts, Ibid , p.83

৩ Robert Roberts, *The social Laws of the Quran,* Ibid , p.83

৪ Ibid.

৫ Ibid.

৬ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা কর্তৃক অনুদিত, *পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন* (ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১), লেবীয় পুস্তক ২৪ : ১৭, পৃ. ১৫৪

৭ *পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন*, প্রাগুক্ত, লেবীয় পুস্তক ২৪ : ২০, পৃ. ১৫৪

৮ প্রাগুক্ত।

ঈসা (আ.) এর শরি'য়তে নর হত্যার বিধান

খ্রিষ্টানদের শরি'য়তে হত্যাকারীর উপর শুধু 'দিয়াতের' বিধান প্রযোজ্য ছিল।[৯]

আল-কুর'আনে নর হত্যা সম্পর্কিত বিধান

আরবে আগে থেকেই হত্যা ও কিসাস সংক্রান্ত কিছু আইন কানুন চালু ছিল। ইহুদি সম্প্রদায় যারা এ অঞ্চলে একটি বিশেষ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছিল তারা তাওরাতের দণ্ডবিধি ও শাসন-শাস্তি বিষয়ক কিছু কার্যক্রম চালু রেখেছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আরবে সুশৃঙ্খল কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি বা চারিত্রিক প্রাণ বন্যার স্ফূরণ ছিল না।[১০] এ কারণে আরবরা হত্যা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন-কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। অপরদিকে মহানবী (স.) এর হাতে হিজরতের পূর্বে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্র শক্তি ছিল না বিধায় তাঁর পক্ষেও হত্যা সংক্রান্ত দণ্ডবিধি সমাজে কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে লক্ষ্য করা যায় যে, আল-কুর'আনের মাক্কি সূরাগুলোর আলোচ্য বিষয় কেবল আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আইনের আদর্শিক, তাত্ত্বিক ও বিশ্বাসগত ভিত্তি গড়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ছাড়া এতে আইন সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য নেই।[১১] আল-কুর'আনের সর্বাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত একটি বর্ণনা পদ্ধতি হল, অসময়োচিত ইসলামী আইন ও শরী'য়ত সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর আলোচনা মাক্কি সূরায় পরিহার করা হয়েছে। অপরদিকে হিজরতের কয়েক বছর পর মাদানী সূরার বিভিন্ন আয়াতে একটি পূর্ণাংঙ্গ সমাজ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক আইন-বিধিসহ ফৌজদারী আইন, দণ্ডবিধি ও নিবর্তনমূলক শাস্তির ব্যবস্থা সম্বলিত আইন-কানুন নাজিল হতে শুরু করে।

আল-কুর'আনে বর্ণিত নর হত্যা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

আল-কুর'আনে বর্ণিত নর হত্যা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের নৈতিক-আদর্শিক ও দার্শনিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে নর হত্যা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের শানে নুযূল[১২] জানা অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি নাজিলের ক্রমধারা আনুযায়ী বিন্যস্ত করে আল-কুর'আনে বর্ণিত হত্যা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করাও অতি জরুরী। মাক্কি তিনটি সূরার অন্তর্গত তিনটি আয়াতে নর হত্যাকে ঘৃনার্হ ও নিষ্ঠুরতম অন্যায় কাজ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

৯ *পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন*, প্রাগুক্ত, লেবীয় পুস্তক ২৪ : ২০, পৃ. ১৫৪

১০ আল্লামা শিবলি নু' মানী (র.) রচিত, এ. কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী অনূদিত, *সীরাতুন নবী (স.)* (ঢাকা : দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৮), খ.২, পৃ .৫৭৪

১১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীরে ফী যিলালিল কুর'আন* (অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ঢাকা: আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯৮), খ.৬, পৃ. ৩৪৫

১২ বিভিন্ন ঘটনা, উপলক্ষ ও প্রেক্ষাপটে আল-কুর'আনের যখন যে সকল আয়াত মহানবী (স.) এর উপর অবতীর্ণ হয়- এগুলোর বিবরণকে শানে নুযুল বলে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَثَامً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا لَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'এবং ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না। এবং আল্লাহ তা'য়ালা যে প্রাণকে মর্যাদাবান করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া ঐ প্রাণকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না । এবং যারা ঐ সকল কাজ করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে, ইমান আনে ও সৎকর্ম করে ।[১৩]
সূরা আল-ফুরকানের অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য আয়াতটি মহানবী (স.) এর মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়।[১৪] এখানে বলা হয়েছে যে, মুমিনগণের অন্যতম নৈতিক গুণ হল তারা হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচার করে না। কারণ তারা এগুলোকে পাপ (sin) মনে করে। হানাহানি হতে মুমিনদের হৃদয় ও মনকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিরত রাখাই আলোচ্য আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য।[১৫] কেননা ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করাকে পাপ মনে করা এমন একটি সামাজিক গুণ যা হানাহানিমুক্ত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবনের জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ
إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'আপনি বলুন এসো আমি তোমাদের ঐ সকল বিষয়গুলো পড়ে শোনাই যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, তা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কোন কিছুকে শরীক বা অংশীদার স্থির করো না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, কেননা আমিই তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার যোগাই। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবনকে মর্যাদাবান

১৩ আল-কুর'আন, আল-ফুরকান, ২৪ : ৬৮-৭০
১৪ সাইয়েদ আবুল আ 'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুর'আন* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০), খ.১০, পৃ. ৫
১৫ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৪১

করেছেন তাকে কখনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার’।[১৬]

আলোচ্য আয়াতটি নবুয়াতের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বছর নাযিল হয়।[১৭] আয়াতটির শানে নুযূল জাহিলি যুগের আরব সমাজে তাদের ফসল, জীবজন্তু ও সন্তানাদিকে ঘিরে নানারকম ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও রীতি প্রথার প্রচলন ছিল। যেমন উৎপন্ন ফসল ও পশু সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করে একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে অপর অংশ তাদের মনগড়া দেবদেবীর জন্য নির্দিষ্ট করা, ধর্মীয় পুরোহিতদের উৎসাহ প্রেরণায় সন্তানদের হত্যা করা কিংবা কিছু নির্দিষ্ট পশু ও ফসল ভোগ করাকে নিজেদের জন্য হারাম ঘোষণা করা ইত্যাদি নানারকমের মনগড়া কুপ্রথার অসারতা সূরা আল-আন‘আমে ১৩৬-১৩৯ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তৎপর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন, মুশরিক নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কী কী অকাট্যভাবে হারাম করেছেন তার সার নির্যাস একটি মাত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৮] ঘোষণাটির মাধ্যমে আরব মুশরিক-কাফিরদেরকে এই অমোঘ সত্য জানান দেয়া হয় যে, আইন রচনার সার্বভৌম ক্ষমতা বিশ্বজগতের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার, অন্য কারো নয়। উক্ত আয়াতে শিরক, ব্যভিচার ও হত্যাকাণ্ড এ তিনটি অপরাধের বিরুদ্ধে প্রায় এক সাথে নিষেধাজ্ঞামূলক আইন (Probihitory Law) জারী করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি অপরাধই হত্যাকাণ্ড বিশেষ। প্রথমটি অর্থাৎ শিরক হচ্ছে মানুষের ফিতরাত তথা সহজাত বিবেক, মন ও মনীষাকে হত্যা করার শামিল। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ব্যভিচার সমাজ ব্যবস্থাকে হত্যা করার শামিল আর তৃতীয়টি অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষকে বধ করা সকল মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল।[১৯]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

‘আল্লাহ তা'য়ালা যে প্রাণকে সম্মানিত করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে অবশ্যই আমি তার উত্তরাধীকারীকে ক্ষমতা প্রদান করি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে’।[২০]

---

১৬ আল-কুর'আন, আল-আন‘আম, ৫ : ১৫১
১৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪১
১৮ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৪৬-৪৮
১৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৬৮
২০ আল-কুর'আন, আল-বনী ইসরাঈল, ১৬ : ৩৩

আলোচ্য আয়াতটি মানুষের জীবননাশের অবৈধতা ঘোষণা করে হিজরতের এক বছর পূর্বে মক্কায় নাজিল হয়। মেরাজ প্রসঙ্গে যে সকল চরিত্র সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রদান করা হয় এগুলোর মাঝে এও ছিল একটি।[২১]

এ আয়াতটি মহানবি (স.) এর মাক্কি জীবনে হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। এখানে সরাসরি হত্যার শাস্তি 'কিসাস' (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) শব্দটির উল্লেখ নেই। কারণ এ সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ হিজরতের এক বছর পূর্ব কাল) রাষ্ট্র ক্ষমতা মহানবী (স.) এর হাতে আসেনি। উক্ত আয়াতে হত্যার প্রতিবিধান স্বরূপ খুনীকে হত্যা করার আইনগত কর্তৃত্ব নিহত ব্যক্তির উত্তরাধীকারীকে প্রদান করা হয়েছে। এই কর্তৃত্ব যাতে ন্যায়সংঙ্গতভাবে বাস্তবায়িত হয়, হত্যাকারী বা তার পরিবার পরিজনের উপর যেন কোনরূপ সীমালঙ্ঘন করা না হয় এই ন্যায়পর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মনে হয় আয়াতটি যেন হত্যার শাস্তি 'কিসাস' যা কিছু দিন পরে মহানবী (স.) এর মাদানী জীবনে বিধিবদ্ধ হবে তার পূর্বে হত্যার শাস্তি সংক্রান্ত আইনের একটি সামাজিক নীতিমালা স্বরূপ। এটা যেন হত্যার শাস্তি 'কিসাস' সংক্রান্ত আইনের 'preamble'বা পূর্ব প্রস্তাবনা।

পরবর্তীতে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবি (স.) এর বাহুতে যখন প্রশাসনিক ক্ষমতা চলে আসে তখন হত্যার শাস্তি বিধিবদ্ধ থাকে দুটি পূর্ণাঙ্গা আয়াত নাযিল হয়। আয়াত তিনটি যথাক্রমে:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ইমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে 'কিসাস' বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে, দাস দাসের পরিবর্তে এবং নারী নারীর পরিবর্তে, অবশ্য তার ভাইয়ের (নিহত ব্যক্তির পরিবারের) পক্ষ হতে অর্থ দণ্ডের বিনিময়ে হত্যাকারীর রক্তপণের দাবি যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ এবং সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ভার লাঘব এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, হে বুদ্ধিমান! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার'।[২২]

২১ আল্লামা শিবলি নু' মানী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৪
২২ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ১৯৪

আলোচ্য আয়াতটি হিজরতের অব্যবহিত পর নাযিল হয়।[২৩] ইবনে কাসির এই আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা.) এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে এই আয়াত ('নিহত স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা') নাযিল হয়েছিলো আরবের দুটি গোত্র সম্পর্কে, যারা ইসলামের আগমনের কিছু পূর্বে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে বহু লোক হতাহত হয়, সে যুদ্ধে বহু দাস ও নারী নিহত হয়। তারপর উভয় গোত্রই পরস্পর প্রতিশোধ গ্রহণ করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে। তখন এক গোত্র অন্য গোত্র থেকে সংখ্যা ও সম্পদে বেশী থাকার কারণে তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তাদের দাসের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের কোন স্বাধীন ব্যক্তি এবং তাদের কোনো নারীর পরিবর্তে প্রতিপক্ষের কোন পুরুষকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা কোন সমঝোতায় রাজি হবে না। তাদের প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।[২৪]

এ প্রসঙ্গে শাবী ও কাতাদাহ্ বলেছেন, আউস ও খাজরাজ নামক দুটি আরব গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ কাল ধরে যুদ্ধ চলছিল। তাদের একটি অপর গোত্রের উপর প্রাধান্য সম্পন্ন ছিল। তখন তারা বলল, আমরা থামব না, থামব তখন, যখন আমাদের একটি দাসের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে, আমাদের একজন নারীর পরিবর্তে প্রতিপক্ষের একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারব। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, 'তোমাদের প্রতি কিসাস (সমান সমানদণ্ড) ফরজ করা হয়েছে। একজন স্বাধীন ব্যক্তির বদলে অনুরূপ একজন স্বাধীন ব্যক্তি, একজন দাসের পরিবর্তে অনুরূপ একজন দাস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।' এই কথা দ্বারা ওদের কথাটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং হত্যাকারীর উপর কিসাস যে ফরজ তা তাগীদ করে বলা হয়েছে। এর কমে কিসাস হয় না। কেননা ওরা হত্যা করত যে আসল হত্যাকারী নয় তাকে। এই কারণে আল্লাহ তাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন।[২৫]

পরবর্তীতে প্রথম হিজরীতে[২৬] কিংবা দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের পর সূরা আল-মায়েদার অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।[২৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আমি তাদের (বনী-ইসরাঈলদের) জন্য তাতে ('তাওরাত' কিতাবে) এই বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চেখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং

---

২৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ,প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৮
২৪ সাইয়েদ কুতুব শহীদ,প্রাগুক্ত, খ.১ , পৃ. ১০২
২৫ আবু বকর আল- জাস্সাস, *আহকামুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮), খ. ১, পৃ.২৯৩
২৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ,প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৬
২৭ আল্লামা শিবলি নু'মানী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৪

জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা ফয়সালা করে না, তারাই অত্যাচারী'।[২৮]

আয়াতটির শানে নুযূল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, বনু কুরায়যা ও বনু নাযীর-ইহুদিদের এ দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বনু নাযীর সম্প্রদায়টি অধিক সম্মানিত ছিল। বনু কুরায়যা সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি বনু নাযীর সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হতো। অপরদিকে বনু নাযীর সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি বনু কুরায়যা সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে একশ 'ওয়াসক' [২৯] শস্য রক্তপণ দিতে হতো। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মদীনায় আসেন, সে সময়ে বনু নাযীর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বনু কুরায়যা সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করে। তখন বনু নাযীর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের বলে 'আমাদের ও তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (স.) আছেন, চল ফয়সালার জন্য তাঁর কাছে যাই'। তারা রসূলে করীম (স.) এর কাছে আসলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- 'যদি আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তবে ইনসাফের সাথে করবেন'। আর ইনসাফ হলো- জানের বিনিময়ে জান। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় 'তারা কী জাহেলি যুগের ফয়সালা পছন্দ করে'? [৩০]এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কতুব শহীদ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেন, উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরা আল-মায়েদার ৪১-৪৬ নং আয়াত নাযিল হয়।[৩১] এ আয়াতটিতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিধৃত হলেও যেহেতু এ আয়াতটি মানসুখ হবার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলিল নেই, সেহেতু আয়াতের বিধান মুসলমানদের জন্যও সমভাবে কার্যকর।[৩২]

৩.আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'কোন মুমিন ব্যক্তিই অপর কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে না। তবে ভুলবশত হত্যা করে ফেললে তা স্বতন্ত্র। এবং যদি কোন মুমিন ব্যক্তি ভুলবশত কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে একজন

২৮ আল-কুর'আন, আল- মায়েদা, ৫: ৪৫

২৯ এক ওয়াসাক = প্রায় সাড়ে ছয় মণ। দ্র. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবদী (র.), কানযুল ঈমান ওয়া *তাফসীর খাযাইনুল ইরফান* (অনু. আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, চট্টগ্রাম : গুলশান-ই- হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, ২০১০), পৃ. ২২১

৩০ ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস (র.), *সুনানে আবু দাউদ* (ঢাকা : মীনা বুক হাউজ ২০০৮), হাদীস নং ৪৪৩৬, পৃ. ৯৫৯

৩১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৭

৩২ আলাউদ্দীন বাবু বকর ইবনে মাসউদ আল-কাসানী, *বাদা'ই আস-সানাই* (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৪০২ হি.) খ.৭, পৃ.২৩৩

মুসলিম ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করতে হবে এবং রক্তপণ সমর্পণ করতে হবে নিহতের স্বজনদেরকে। তবে তারা যদি রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। অতঃপর নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তাহলে একজন মুসলিম ক্রীতদাস ও দাসী মুক্ত করা বিধেয়। অপরদিকে নিহত ব্যক্তি যদি এমন এক সম্প্রদায়ের কেউ হয়ে থাকে, যাদের সাথে তোমাদের কোন সন্ধি চুক্তি আছে, তাহলে নিহত ব্যক্তির স্বজনদের নিকট রক্তপণ অর্পণ করতে হবে এবং সেই সাথে একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করা বিধেয়। এবং যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। এই ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে তওবা স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়'।[৩৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনামতে কিসাস ও কতল সংক্রান্ত এটাই ছিল সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত।[৩৪] ইতোপূর্বে ইচ্ছামূলক হত্যা ও ভুলবশত হত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। হিজরী ষষ্ঠ সালে মদিনায় মুসলমাদের মধ্যে ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি এই হযরত আইয়াশ ইবনে রবী'আহ মাখযুমী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করায় তার বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিস ও আবু জেহেল তাকে ভীষণ নির্যাতন করে। তিনি মনে মনে সংকল্প করেন, সুযোগ পেলেই হারিসকে হত্যা করবেন। কিছু দিন পর হারিস ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। কিন্তু হযরত আইয়াশ (রা.) তার ইসলাম গ্রহণের খবর জানতেন না। একদিন কোবার নিকটে হারিস তার চোখে পড়া মাত্রই কাল বিলম্ব না করে তিনি তাঁকে হত্যা করে ফেলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভুলবশত হত্যা প্রসঙ্গে উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়।[৩৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কিসাস ও হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ইসলামি শরি'য়তের বিভিন্ন বিধি, উপ-বিধি, ব্যবহারিক আইন (Procedural Law) ও দর্শন নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এই সকল বিধি-বিধানগুলো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারমূলক হত্যা

ইচ্ছাকৃত সব ধরনের হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারমূলক হত্যাকাণ্ডের বৈধতা ইসলাম অনুমোদন করে। ইসলাম ছয়টি অপরাধের ক্ষেত্রে মানব হত্যাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে। সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়টি অপরাধের শাস্তি হিসেবে মানবহত্যার বৈধতা ইসলাম রাষ্ট্র তথা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। যথা,

---

৩৩ আল-কুর'আন, আন - নিসা, ৪: ৯৩

৩৪ আল্লামা শিবলি নু'মানী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৬

৩৫ ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর, *তাফসীর ইবনে কাসীর* (অনু. ড. মুহাম্মদ মজীবুর রহমান, ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, ২০১১), খ. ৪, পৃ. ১১০

ক. কোন অপরাধের দণ্ড স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা। কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার করে তখন হত্যাকারীর উপর 'কিসাস' তথা মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য হবে। এ সম্পর্কে আল-কুর'আনের সূরা আল-বাকারার ১৭৮ নং ও সূরা আল-মায়েদার ৪৬ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে।

খ. ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে কেউ যদি প্রতিবন্ধক বা বাধাদানকারী হয়ে দাঁড়ায় এবং তার সাথে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধে তাকে হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

'যাদের উপর আক্রমণ চালানো হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা নির্যাতিত এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এজন্য যে, তারা বলেছিল আল্লাহ আমাদের প্রভু'।[৩৬] কাফিরদের পক্ষ হতে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে মুসলমানদেরকে প্রাথমিকভাবে অস্ত্র ধারণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এই অনুমতি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ করা ও তাদেরকে ক্ষমতাশীন করার পূর্বাভাস মাত্র। পরবর্তীতে সুরা আল-বাকারার ১৯০ নং থেকে ১৯৫ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩৭]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের উপরে আক্রমণ চালায়, কিন্তু সীমা লংঘন করো না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা কখনো সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না'।[৩৮]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِين

'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা তথা নৈরাজ্য অপসারণ হয় এবং দ্বীন-ইসলাম (জীবন ব্যবস্থা) একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত পন্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে

৩৬ আল-কুর'আন, আল -হাজ্জ, ২২ : ৪০
৩৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৯
৩৮ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ১৯০

তারা যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারী ব্যতীত অন্য কারোর উপর আর কোন শত্রুতা নয়'।[৩৯] এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে মুসলমানদেরকে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ তথা জিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। কোন অপশক্তি যদি মানবতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠতম উৎস ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধাঁ দেয় কিংবা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে নানারকম প্রলোভন ও নির্যাতন- নিস্পেষণের মাধ্যমে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য বা প্ররোচিত করে তখন মানবতার এই দুশমনকে প্রতিহত করা ও হত্যা করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য নিহত ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকতে হবে। অর্থাৎ সে যদি অন্য কোন অপরাধ যেমন হত্যা ধর্মত্যাগ ও ব্যভিচার প্রভৃতি) হত্যাদণ্ডে হয় কিংবা রাষ্ট্রে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অমুসলিম (হারাবী) হয় তাহলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না।

গ. কেউ যদি দারুল ইসলামে ইসলামের রাজ্যসীমার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটাবার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

'এই জন্যই আমি বনী ইসরাইদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন নৈরাজ্য বিস্তার ব্যতীত তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল এবং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করে তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল'।[৪০]

ঘ. ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং ভূ- পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা

৩৯ আল-কুর'আন, আল-বাকারা, ২ : ১৯৩
৪০ আল-কুর'আন, আল- মায়েদা, ৫ : ৩২

দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি'।[৪১]

আলোচ্য আয়াত দুটি দ্বারা এই বিধান বিধৃত হয়েছে যে, ডাকাতি, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিংবা পাপাচার ও রক্তপাতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অশান্তি সৃষ্টির মত অপরাধ সংগঠনকারীর শাস্তি হচ্ছে প্রাণ দণ্ডাদেশ।[৪২]

উপরোক্ত তিনটি কারণকে আল-কুর'আন ইনসাফমূলক আখ্যা দিয়ে এর যে কোন একটি কারণে মানব হত্যাকে বৈধতা দিয়েছে। এছাড়া নিম্নোক্ত ২টি কারণ সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কারণ দুটি এই,

ঙ. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। প্রকাশ্যভাবে যিনা বা ব্যাভিচারের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ উক্ত ব্যাভিচারী ব্যক্তিকে হত্যা করা।

চ. কেউ যদি মুরতাদ তথা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন (ইসলাম) হতে ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে এরূপ লোকদের কর্মসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই দোযখের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে'।[৪৩] এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম ত্যাগী (মুরতাদ) হওয়ার কারণে সমস্ত কর্মফল নিষ্ফল হয়ে যায়। পরকালে এরা কোন প্রতিদান ও পুরষ্কার পাবে না। পৃথিবীতে এদের রয়েছে হত্যার শাস্তি। তার স্ত্রী তার জন্য বৈধ থাকে না। সে নিকট আত্মীয়ের তেজ্যসম্পত্তি তথা মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়। তার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে না এবং তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা ইসলামী শরি'য়তে বৈধ নয়।[৪৪] আলোচ্য আয়াতটি হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহাইব, বেলাল এবং খাব্বাব (রা.) সর্ম্পকে অবতীর্ণ হয়। যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যা হুমকি দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করতে বলেছিল। তাদের মধ্যে ইয়াসির, সুমাইয়্যা, এবং খাব্বাব (রা.) কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। অবশেষে মুশরেকরা

---

৪১ আল-কুর'আন, আল- মায়েদা, ৫ : ৩৩
৪২ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুত্ তাফাসীর* (মিশর : দারুল সাবুনি, ১৯৮৯), খ. ১, পৃ. ৩৪০
৪৩ আল-বাকারা, আল-বাকারা, ২ : ২১৭
৪৪ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবদী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

তাদেরকে হত্যা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে হযরত আম্মার (রা.) কুফরির মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তার অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকটে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যখন কুফরী কালাম পড়ছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল?' তিনি আরয করলেন, আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এর জন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সত্যায়নেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৪৫]

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, কারো প্রবল চাপ ছাড়াই কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলেই তা ধর্মত্যাগ বলে ধর্তব্য হবে। অতএব কেউ প্রবল চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়ে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা কুফরী কাজ করলেই ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে না, যে যাবত তার অন্তকরণে পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকবে।[৪৬] কারো রক্তপাত হালাল ও বৈধ হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এ ছয়টি ভিত্তিকেই সীমিত করে দিয়েছেন। এই ছয়টি অবস্থা ছাড়া অপর কোন কারণে মানুষকে হত্যা করা কারো জন্য বৈধ নয়। সে মুমিন মুসলমানই হোক কিংবা জিম্মি অথবা সাধারণ কাফির যে হোক না কেন।[৪৭]

ইসলাম হচ্ছে বেঁচে থাকার বিধান এবং শান্তির বিধান। ইসলাম নরহত্যাকে অত্যন্ত ভয়াবহ বিপর্যয়কারী হিসেবে মনে করে। জীবনদাতা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা। কোন ব্যক্তির এই অধিকার নেই যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিত এবং তাঁরই নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছাড়া কারো প্রাণ সংহার করা। প্রত্যেক প্রাণই পবিত্র। তাকে সঙ্গত কারণ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না এবং বৈধ উপায় ছাড়া হত্যা করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালার এই নির্ধারিত এই সীমারেখার মধ্যে কোন অস্বচ্ছতা নেই, বরং তা হচ্ছে সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও ঋজু। এটা ব্যক্তিগত কারো খেয়াল খুশী ও মনগড়া মতামতের উপর ন্যস্ত করে রাখা হয়নি।[৪৮]

---

৪৫ মুফতী মুহাম্মদ শফী, পৃ. ৭৫৭

৪৬ আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ১৯২৪), খ. ১০, পৃ. ১২৩, খ. ১২৪, পৃ. ৪৫-৬, ২৯-৩০, ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ৩০

৪৭ সাইয়েদ আবুল আ 'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬২

৪৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, খ. ১২, পৃ. ১৯৮

আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা ও মানব হত্যা

ইসলাম বিশ্বের সকল মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও'।[৪৯] রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম করা হলো। তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হত্যাকারী হয়ে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না। অতঃপর তিনি তার এই নসিহত কার্যকর করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, 'জাহিলী যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত করা হলো। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবী'আ ইবনুল হারিস এর দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম'।[৫০] মূলত ইসলাম সকল মানুষের এই প্রাকৃতিক ও মৌলিক ভ্রাতৃত্বকে উচ্চকিত করেছে। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কোন মানুষই এ ভ্রাতৃত্ববোধ লংঘন করতে পারে না। অতএব কারণে ইসলাম একটি নিষ্পাপ প্রাণ হত্যাকে গোটা মানব জাতিকে হত্যার সমতুল্য মনে করেছে। এমনিভাবে একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখাকে সমস্ত মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার সমতুল্য মনে করে। আল-কুর'আনের ভাষায়,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

'এই কারণে আমি বনী ইসরাঈলদের জন্য এই আইন জারী করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা বা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির কারণ ছাড়াই অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল'।[৫১]

ইসলাম মানব হত্যার ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানবজাতিকে একটি মাত্র প্রাণসত্তা ঘোষণা করেছে। প্রতিটি মানুষই যেন এই বিশ্ব পরিবারের একজন সদস্য। তাই ইসলাম বিনা কারণে মানব হত্যাকে কোনক্ষেত্রেই বরদাশ্ত করতে চায় না। এটা হচ্ছে ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের উদার

৪৯ আল-কুর'আন, আল- হুজরাত, ৪৯ : ১০

৫০ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহীহ আল-মুসলিম* (ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি), কিতাবুল হজ, খ.১, পৃ. ৩৯৭

৫১ আল-কুর'আন,আল-মায়েদা, ৫ : ৩২

নৈতিক দর্শন। একটি স্থিতিশীল ভারসাম্যপূর্ণ (Stable equilibrium) সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজবদ্ধ প্রতিটি সদস্যের জীবনের নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। বস্তুত বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি মানুষের জন্য সমভাবে মূল্যবান ও অকাট্য। তাই যে কোন একজন মানুষকে হত্যা করা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের ওপরই আক্রমণের শামিল। সমগ্র মানবজাতি এ অধিকারের অংশীদার। অনুরূপভাবে একজন মানুষকে খুন হওয়া থেকে রক্ষা করা সমস্ত মানব জাতির প্রাণ রক্ষার শামিল। এটা হতে পারে ব্যক্তির বেঁচে থাকা অবস্থায় তাকে হত্যার চেষ্টা থেকে বাঁচানো অথবা নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে খুনীকে হত্যার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে উক্ত খুনীর হাত থেকে সম্ভাব্য খুন হওয়া থেকে বাচাঁনো। কেননা এভাবে প্রাণ রক্ষার মধ্যে সেই সর্বজনীন অধিকারটি সুরক্ষা পায়-যা কিনা সকল মানুষের সম্মিলিত সম্পদ।[৫২]

নর হত্যা ও এর প্রকারভেদ

ইসলাম সব ব্যাপারে নিয়ত বা অন্তর্নিহিত ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, সমস্ত কর্মের ফলাফল নিয়তের তথা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। [৫৩] আল-কুর'আন সর্বপ্রথম নিয়ত ও উদ্দেশ্যর বিচারে হত্যাকাণ্ডের প্রকারভেদ সুস্থির করেছেন। তা হল কতলে 'আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড) এবং কতলে খাতা (ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড) এই প্রকার হত্যার শাস্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তিতে ইসলামি আইনজ্ঞগণ মহানবী (স.) এর সুন্নাহ ও সূক্ষ্ম বিবেক বিবেচনার আলোকে উদ্দেশ্য ও ধরন বিচারে হত্যাকে নিম্নোক্ত পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যথা,

অ. ইচ্ছাকৃত হত্যা খ. প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা গ. ভুলবশত হত্যা ঘ. প্রায় ভুলবশত হত্যা এবং ঙ. কারণবশত হত্যা

ইচ্ছাকৃত হত্যা

কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যখন এমন কাজ করে যার দ্বারা অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়, তখন তার সে কাজকে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' বলা হয় এবং এর জন্য কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' সাব্যস্ত করার জন্য লৌহাস্ত্র বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহার প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) এবং অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, লৌহাস্ত্র বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহার শর্ত নয়। তাদের মতে অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' সংঘটিত

---

৫২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯০

৫৩ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), *সহীহ বোখারী* (কলকাতা : দার আল-ইশায়াদ ইসলামীয়া, তা.বি), কিতাবুল ইমান, খ.১, হাদিস নং ১

হতে পারে। যেমন পানিতে ডুবিয়ে, শ্বাসরুদ্ধ করে, বিষ পান করিয়ে বা উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হলে তাও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' হিসেবে গণ্য হবে।[৫৪]

প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা

যে ধরনের বস্তুদ্বারা সাধারণত হত্যা সংঘটিত হয় না, সে ধরনের কোন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে সে হত্যাকে 'প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা' বলা হয় এবং এর জন্য দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে, দেহ কাটে না বা দেহে বিদ্ধ হয় না এ ধরনের কোন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা সংঘটিত হয় তাকে 'প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা' বলা হয়। অপরদিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এবং মুহাম্মদ (র.) এর মতে, যে সব বস্তুদ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায় না, এ ধরনের বস্তু যেমন ক্ষুদ্র পাথর, ক্ষুদ্র লাঠি, চাবুক, কলম ইত্যাদি দ্বারা হত্যা সংঘটিত হলে তাকে প্রায় ইচ্ছমূলক হত্যা বলে। এ প্রকারের হত্যার ক্ষেত্রে যেহেতু হত্যাকারীর হত্যা করার ইচ্ছা ছিল কিনা, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, তাই এ ধরনের হত্যার বেলায় কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না; কিন্তু দিয়াতের কঠোর বিধান প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবার ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কাফ্ফারা বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু অগ্রগণ্য মত হল কাফফারা ওয়াজিব হবে।[৫৫]

ভুলবশত হত্যা

নিষিদ্ধ নয়, এমন কোন কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে ভুলবশত হত্যা সংঘটিত হলে তাকে ভুলবশত হত্যা বলা হয় এবং এর জন্য দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ ভুল কর্তার ধারণার মধ্যে হতে পারে, কাজের মধ্যেও হতে পারে এবং ধারণা ও কাজ উভয়ের মধ্যেও হতে পারে।[৫৬]

প্রায় ভুলবশত হত্যা

কোন ব্যক্তির কোন কাজের দ্বারা হত্যা সংঘটিত হলে তাকে প্রায় ভুলবশত হত্যা বলা হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীর কোন ধরনের সংকল্প ছাড়াই হত্যা সংঘটিত হয় বলে তাকে প্রায় ভুলবশত হত্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় অপর কোন ব্যক্তির উপর উল্টে পড়ল এবং এর ফলে অপর ব্যক্তিটি মারা গেল। এ প্রকারের হত্যা একদিকে যেহেতু অপরাধীর অসতর্কতার দরুণ সংঘটিত হয়েছে, তাই তা ভুলবশত হত্যার মধ্যে গণ্য হবে এবং এ জন্য

---

৫৪ ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী, *বদা'ই, সানাই* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৭), খ.৭, পৃ. ২৩৩
৫৫ ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৩৩
৫৬ প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৩৪

দিয়াত ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যেহেতু অপরাধীর কর্ম ও হত্যার মধ্যে সরাসরি 'কারণ' এর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তাই এ জন্য কাফফারাও ওয়াজিব হবে।[৫৭]

কারণবশত হত্যা

কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হলে তাকে কারণবশত হত্যা বলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যাতায়াতের রাস্তার পাশে গর্ত খনন করল এবং তাতে কোন পথচারী পড়ে গিয়ে মারা গেল। অথবা কেউ পথের পার্শ্বে প্রকাণ্ড এক পাথর রাখল এবং তার সাথে ধাক্কা খেয়ে পথচারী মারা গেল। এ প্রকারের হত্যায় অপরাধী সরাসরি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে না, বরং তার কোন সম্পাদিত কাজই হত্যার কারণ হয়। এখানে অপরাধী যে কাজটি করে, তা তার জন্য বৈধ; তবে সে কর্ম সম্পাদনে সীমা লংঘন করেছে, যার ফলে তার কর্মটি হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রকারের হত্যায় মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৫৮]

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি

ইচ্ছাকৃত হত্যার তিন ধরনের শাস্তি ইসলামী আইনে নির্ধারিত।

১. প্রকৃত বা মূল শাস্তি, তা হল কিসাস;

২. মূল শাস্তির বিকল্প শাস্তি বা দিয়াত;

৩. ক্ষমা ও অনুগামী শাস্তি।

কতলে আম্‌দ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড। কিসাস ও দিয়াত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এদের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা আব্যশক।

কিসাস এর সংজ্ঞার্থ

'কিসাস' শব্দটি (قص) 'আল-কাস্‌সুন' শব্দ থেকে উৎপত্তি। অর্থ কর্তন করা বা সমতা।[৫৯] অথবা 'আল-'কাস্‌সু' শব্দের অর্থ পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা।[৬০] শব্দটির ব্যবহার আল-কুর'আনে এভাবে এসেছে, مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا 'তারা দুজনেই পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে পুনরায় ফিরে গেল'।[৬১]

আয়াতে 'কাসাসান' অর্থ পায়ের চিহ্নের উপর পা রাখা'। যেহেতু হত্যাকারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হত্যাকারীকেও অনুরূপভাবে হত্যা করা হয়, সেহেতু হত্যার শাস্তি স্বরূপ কাউকে হত্যা করাকে 'কিসাস'

---

৫৭ আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত,খ.২ ৬, পৃ. ১০৪
৫৮ আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৬৬
৫৯ ইবরাহিম কাদরায, *আল-মুজামুল ওয়াসিত* (তুরস্ক : দারুল দাওয়াহ, ১৯৮৯), পৃ. ৭৪০
৬০ ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত : দার আল-সদর, তা.বি), খ.৮, পৃ. ৩৪১
৬১ আল-কুর'আন,আল-কাহাফ, ১৮ : ৬৪

বলা হয়। অথবা এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ। এর চেয়ে বেশি কিছু করা বৈধ নয়।[৬২]

অথবা 'কিসাস' এর শাব্দিক অর্থ 'আল-মুছাওয়াতু' বা সাম্যতা, সমপরিমাণ বা অনুরূপ।আরবি ভাষায় বলা হয় অমুকে যেমন করেছে, তার সাথে সমান সমান তেমনই কর।অতএব, শাব্দিক অর্থে কিসাস হচ্ছে কারো সাথে যে রূপ আচরণ করা হয়েছে, তার সাথে সেরূপ আচরণ করা।[৬৩]

পবিত্র আল-কুর'আনে কিসাস শব্দটি মোট ৪ বার উল্লেখ হয়েছে। সুরা আল-বাকারার ১৭৮ নং

আয়াতে, ১৭৩ নং আয়াতে ও ১৯৪ নং আয়াতে এবং সুরা আল-মায়েদার ৩২ নং আয়াতে 'কিসাস' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। আল-কুর'আনে কিসাস শব্দটি সমতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন- الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 'যদি তারা (কাফিরগণ) তোমদের সাথে সম্মানিত মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমারাও তাদের সাথে সম্মানিত মাসেই যুদ্ধে লিপ্ত হও' ।[৬৪] এখানে 'কিসাস' শব্দটির অর্থ সমতা। আলোচ্য আয়াতটির আয়াতটির ব্যাখ্যায় কাজি ছানাউল্লা পানিপথি (র.) লিখেন 'হে মুসলিম বাহিনী! মুশরিকরা যদি সম্মানিত মাসের সম্মান রক্ষা না করে তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তোমরাও যুদ্ধ শুরু করো । এটাই সমতা, এটাই তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব।[৬৫]

'কিসাস' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হত্যার দাবী করা। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকে কিসাস বলে।[৬৬]

২. ইসলামী আইনজ্ঞগণের মতে ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানী কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তি স্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা ।[৬৭]

৩. أن يعاقب المجرم بمثل فعله অর্থাৎ অপরাধী যে পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তদ্রূপ পদ্ধতিতে তাকে শাস্তি বিধান করার নাম কিসাস ।[৬৮]

---

৬২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯১

৬৩ আবু বকর আল-জাস্সাস, *আহকামুল কুরআন* (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), খ.১, পৃ. ২৯১

৬৪ আল-কুর'আন, আল - বাকারা, ২ : ১৯৪

৬৫ কাজি ছানাউল্লা পানিপথি (র.), *তাফসিরে মাজহারী* (অনু.মাওলানা তালেব আলী, ঢাকা: হাকিমাবাদ খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া, ১৯৮৫), খ.১, পৃ. ৪০০

৬৬ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল কারীম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৪৩

৬৭ বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ও অন্যান্য, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১),খ.২, পৃ.১৩১

কিসাসের সমার্থবোধক আরবি প্রতিশব্দগুলো ثَأْرٌ 'ছারুন' (প্রতিশোধ) قَتْلٌ 'কাতলুন' (হত্যা) ও قُوَدٌ 'কুদুন' (নিহতের পরিবর্তে হত্যাকারীকে হত্যা করা)। কিন্তু পবিত্র আল- কুর'আনে এই শব্দগুলোর কোনো একটিও তার বক্তব্য বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেনি। তার কারণ হচ্ছে, প্রথম শব্দটিতে শত্রুতা, প্রতিহিংসা (ill will), অসংবৃত ক্রোধ, রক্তপাতের অত্যুৎসাহ এবং তাতে অন্যদেরও শরীক হওয়ার জন্য উত্তেজিত করা বোঝায়। জাহিলিয়াতের যুগে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয় শব্দটি কাতলুন (হত্যা) বললে প্রথমটাও হত্যা আর তার দণ্ডস্বরূপ যা করা হলো সেটাও 'হত্যা' হয়ে যায় । ফলে ইচ্ছাপূর্বক বা সীমালংঘনমূলকভাবে হত্যা ও বিচার স্বরূপ হত্যা- এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোঝায় না। তৃতীয় শব্দ 'কুদুন' অর্থ লাঞ্ছণা ও অপমান বোঝায় ঠিক যেমন গরু বা ছাগল বা ভেড়া হত্যা করার জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, এও যেন তেমনি। কিন্তু আল-কুর'আন ইচ্ছামূলক হত্যার শাস্তি স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান দিয়েছে তাতে উপরোক্ত ধরনের কোন ভাবধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং আল-কুর'আনে কিসাস শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাস্তবায়ন। আল- কুর'আনে 'কিসাস, শব্দটির ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, এ শব্দটি সুবিচার (Justice), সমান সমান (Sameness) ও অনুরূপতা (Simialarity) বোঝায়। কিসাস শব্দটি হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীকে হত্যা করার, যখমের পরিবর্তে যখম করার এবং অঙ্গ কর্তনের পরিবর্তে অঙ্গ কর্তনকারীর অঙ্গ কর্তন করার অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ।[৬৯]

ইসলামী শরি'য়তে 'দীয়াত' ব্যবস্থা

কাউকে হত্যা করার ফলে অথবা অন্যায়ভাবে দৈহিক আঘাত করার ফলে নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উত্তরাধিকারীকে বা আহত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমান নগদ মুদ্রা, পশু বা ব্যবহারিক সামগ্রী প্রদান করাকে দিয়াত বলে। দিয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রদেয় বস্তু। একে 'আকল' বলা হয়ে থাকে। সীমিত অর্থে ইসলামী আইনে দিয়াত হচ্ছে এরূপ ক্ষতিপূরণ যা হত্যার পরিবর্তে প্রদান করা বাধ্যতামূলক হয়। বিশেষভাবে অন্য কোনরূপ দৈহিক আঘাতের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণকে 'আরস' বলা হয়।[৭০]

ইচ্ছাকৃত নর হত্যার শাস্তি কিসাস

'কিসাস' তথা হত্যার প্রতিবিধানে হত্যাকারীকে হত্যা করা শরি'য়তের অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। কিসাসের শাস্তি কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

---

৬৮ আব্দুল কাওদার আওদাহ, *আত-তাশরী আল-জিনিঈ* (লেবানন: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৯, হি.), খ.১, পৃ.৬৩২
৬৯ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১০৮
৭০ বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৮৮

মহান আল্লাহ বলেন ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ইমানদারগণ। তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে 'কিসাস' বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে, দাস- দাসের পরিবর্তে এবং নারী নারীর পরিবর্তে, অবশ্য তার ভাইয়ের (নিহত ব্যক্তির পরিবারের) পক্ষ হতে (হত্যাকারীকে) অর্থ দণ্ডের বিনিময়ে কিসাসের দাবি যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ভার লাঘব এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, হে বুদ্ধিমান! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার'।[৭১] আলোচ্য আয়াতটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য। আলোচ্য আয়াতে কারিমা দ্বারা মুমিনদের উপর কিসাস ফরজ তথা বাধ্যতামূলক (mandatory) করা হয়েছে। আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ এই বক্তব্য তুলে ধরে যে, সমস্ত নর হত্যার ক্ষেত্রে 'কিসাস' কার্যকর করতে হবে। কিসাস নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর উপর কার্যকর হবে। কেননা 'আল-কাত্লা' অর্থাৎ 'নিহত' শব্দটি 'কাতীল' শব্দের বহুবচন। এটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা সব ধরনের নিহত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর লক্ষ্য হচ্ছে হত্যাকারীগণ। কেননা যখন হত্যাকার্য ঘটে তখন ঐ কার্যের কর্তা হবে হত্যাকারী। তাই প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপরই কিসাস কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে সব হত্যাকারীই সমান ও নির্বিশেষে দণ্ডনীয়। নিহত ব্যক্তি যে-ই হোক, ক্রীতদাস হোক, জিম্মী হোক, পুরুষ হোক, নারী হোক। কেননা মূল আয়াতে ব্যবহৃত 'নিহত' শব্দটি এই সবকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৭২]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ তা

---

৭১ আল-কুর'আন ,আল -বাকারা, ২ : ১৭৮-১৭৯
৭২ আবু বকর আল-জাস্সাস, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৯১

ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম '।[৭৩]

এ আয়াতটিতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিধৃত হলেও যেহেতু এ আয়াতটি মানসুখ হবার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলিল নেই, সেহেতু আয়াতের বিধান মুসলমানদের জন্যও সমভাবে কার্যকর।[৭৪]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, 'এবং যারা এরূপ যে যখন তাদের প্রতি (কারো তরফ হইতে) কোন উৎপীড়ন পৌঁছে তখন (তারা প্রতিশোধ গ্রহণে) সমান প্রতিশোধ নেয়। আর মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ। অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং (পারস্পরিক বিষয়াদির) সংশোধন করে নেয় তবে তার প্রতিদান আল্লাহু তা'য়ালার দায়িত্বে রয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা অনাচারিদের পছন্দ করেন না। এবং যারা নিজেদের উপর উৎপীড়ন হবার পর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তবে এমন লোকদের উপর কোনই দোষারোপ নাই। দোষারোপ শুধু তাদের উপর যারা মানুষকে উৎপীড়ন করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে। তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর যে ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে দেয়। এটা হবে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।'[৭৫]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং, পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন'।[৭৬]

কিসাস সাব্যস্ত হবার ব্যাপারে প্রমাণিত রাসুলুল্লাহ (স.) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد

'যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো, তার পরিবার পরিজন দুটো বিধানের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয়তো দিয়াত গ্রহণ করবে কিংবা তার কিসাস গ্রহণ করা হবে, ।[৭৭]

এছাড়াও কিসাস ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। হত্যা করা হারাম কাজ এ সম্পর্কে সকল মুজতাহিদ একমত।

প্রতিশোধ গ্রহণে নীতি

প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে আল-কুর'আন সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই কোন কোন ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীর জখমের সমপরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা

---

৭৩ আল-কুর'আন , আল - মায়েদা, ৫ : ৪৫

৭৪ আলাউদ্দীন বাবু বকর ইবনে মাসউদ আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৩৩

৭৫ আল-কুর'আন , আস-শূরা, ৪২ : ৩৯-৪৩

৭৬ আল-কুর'আন, আল -হাজ্জ, ২২ : ৬০

৭৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৬৫ ; ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৯৮৮-৯৮৯।

করলে নিহতের অভিভাবককে অধিকার দেয়া হবে সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

এরূপ অবৈধভাবে ও অত্যাচারিত হয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয় আল্লাহ তা'য়ালা তার অভিভাবককে হত্যাকারীর উপর দুটি এখতেয়ারের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন যে, সে ইচ্ছা করলে কিসাস গ্রহণ করতে পারে অথবা দিয়াত বা রক্তপণ নিয়ে ক্ষমাও করে দিতে পারে, এভাবে হত্যাকারীর ব্যাপারে সে স্বাধীন ইচ্ছামাফিক সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। কেননা হত্যাকারীর রক্ত তারই প্রাপ্য। অপরদিকে প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম করতে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। প্রতিশোধ নানাভাবে অতিক্রম হয়ে থাকে। যেমন খুনীর নিরপরাধ পিতা, ভাই, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনকে প্রতিশোধের মাত্রাতিরিক্ত আক্রোশে হত্যা করা। হত্যাকারীকে হত্যার পর লাশ বিকৃত করা অঙ্গচ্ছেদ করা, মুখমন্ডল বিকৃত কিংবা অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করা। ইসলাম এসব কাজকে সীমালংঘনমূলক কাজ মনে করে। কঠোর ভাবে তা হতে বিরত থাকার আহ্বান জানায়।[৭৮]

কিসাস আইনের যৌক্তিকতা

ইসলামি আইনে কিসাস বিধিবদ্ধ করে দেয়ার পেছনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যৌক্তিকতা রয়েছে। নিম্নে কিসাস আইনের দর্শন ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হল :

১. কিসাসের দ্বারা নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্য নয়, কিংবা এটা হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত প্রতিশোধ স্পৃহা নির্বাপক কোনো বিধান নয়, বরং এটা তার থেকে অধিক উন্নতর ও উচু পর্যায়ের এক পদক্ষেপ যার দ্বারা সামাজিক জীবনের নিরাপত্তার বিধান সুনিশ্চিত হয়। অসংখ্য জীবনের জন্য এবং অসংখ্য জীবন সংরক্ষণের জন্য এই বিধান। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়। এ কাজটি অর্থাৎ 'কিসাস' নিজেই যেন এক জীবন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া। যখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির এই বিধান জানা থাকবে যে, কাউকে হত্যা করলে অবশ্যই তার পরিণামে 'কিসাস' আইনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে এবং এই শাস্তির দৃষ্টান্ত তার সামনে থাকায় সে নিশ্চিত জানে, কোনভাবেই সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবেনা তখন হত্যাকাণ্ড ঘটানো থেকে তার হাত আপনা আপনি থেমে যাবে। এভাবে 'কিসাস' এর মধ্যেই জীবন বা প্রাণ, কথাটা সত্য পরিণত হয়।[৭৯]
২. নিশ্চয় 'কিসাসের বিধানে নিহিত রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন। আল-বাকারায় বর্ণিত এই আয়াতটির তাৎপর্য, পবিত্র আল-কুর'আনে বর্ণিত আল-মায়েদার ৩২ নং আয়াতে এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'এই কারণে আমি বনি ইসরাইলদের জন্য এই আইন জারী করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা বা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির কারণ ছাড়াই অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে যেন

৭৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৬
৭৯ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯০

সমস্ত মানুষকে হত্যা করল'। বস্তুত বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি মানুষের জন্য সমভাবে মূল্যবান ও অকাট্য। তাই যে কোন একজন মানুষকে হত্যা করা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের উপরই আক্রমণের শামিল। সমগ্র মানবজাতি এ অধিকারের অংশীদার। অনুরূপভাবে একজন মানুষকে খুন হওয়া থেকে রক্ষা করা সমস্ত মানব জাতির প্রাণ রক্ষার শামিল। এটা হতে পারে ব্যক্তির বেঁচে থাকা অবস্থায় তাকে হত্যার চেষ্টা থেকে বাঁচানো অথবা নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে খুনীকে হত্যার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে উক্ত খুনীর হাত থেকে সম্ভাব্য খুন হওয়া থেকে বাচাঁনো। কেননা এভাবে প্রাণ রক্ষার মধ্যে সেই সর্বজনীন অধিকারটি সুরক্ষা পায়-যা কিনা সকল মানুষের সম্মিলিত সম্পদ।

৩. যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবনাশংকা অনুভব করলে সে নর হত্যা মত নিন্দনয় আপরাধ সংঘঠনে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে। এরপর হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড কার্যকরীর মাধ্যমে হন্তার আত্নয় স্বজনের অন্তরে প্রজ্জলিত জিঘাংসার আগুন নিভে যাবে এবং উভয় পক্ষ শান্তির দিকে এগিয়ে যাবে।[৮০]

৪. কিসাস সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ একটি বিধান। এতে হত্যার পরিবর্তে হত্যার এবং আঘাতের বিপরীতে সমপরিমাণ আঘাত দেয়ার অধিকার বিচারককে প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে সর্বোচ্চ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। কারণ, পাশবিক শক্তি দ্বারা তাড়িত ব্যক্তি কোন স্বার্থ হাসিল করার জন্য কাউকে খুন করলে কিংবা আহত করলে তার উপর কিছুটা দেরীতে হলেও সমপরিমাণ শক্তি আরোপিত হবে মর্মে যখন সে জানতে পারবে, তখন সে আর হত্যা বা আহত করার পথে পা বাড়াবে না। যদি কিসাসের বিধান না থাকত তবে অপরাধী আরো বেপরোয়া হয়ে ব্যাপক খুনের মত ভয়াবহ অপরাধে জড়িয়ে পড়ত।

৫. আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও দেখাতে পাই যে, মানুষের স্বভাবিক প্রবৃত্তি হল অন্যের উপর বিজয়ী হওয়া। অন্যের উপর নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা। অন্যকে দমনের জন্য সকল পথ গ্রহণ করা, প্রয়েজনে হত্যা করা। কিন্তু যখনই সে জানতে পারবে যে, তার এই বিজয় একান্ত সাময়িক। এ অন্যায়ের ফলে কিছু সময় পরই তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে, তবে অপরাধী অপরাধ থেকে বিরত থকবে এবং সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করবে।

৬. কিসাসের ফলে সমাজে হত্যা, খুন আহতকরার মত ঘটনা হ্রাস পায়। এ ধরনের বিচারের ফলে (কিসাসের মাধ্যমে) কিছু অপরাধীর প্রাণ সংহার হলেও এর মাধ্যমে ঐসব মানুষের জীবন বেঁচে যাচ্ছে যদি এই খুনীরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকলেও প্রাণ দিতে হত। তাই কিসাসকে বাহ্যত দৃষ্টিতে কিছুটা অমানবিক ও কঠিন বিচার মনে হলে ও প্রকৃত অর্থে এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে কল্যাণকর ।

---

৮০ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, খ. ২, পৃ. ১০৪

৭. যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবনাশংকা অনুভব করলে সে নরহত্যার মত নিন্দনীয় অপরাধ করতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে। এরপর হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাধ্যমে হত্যাকারীর আত্মীয়-স্বজনের প্রজ্জলিত হিংসার আগুন নিভে যাবে এবং উভয় পক্ষ শান্তির দিকে এগিয়ে যাবে।[৮১]

৮. জীবনের সাধারণ অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, কিসাসের মধ্যেই জীবন। প্রকৃতপক্ষে এক ব্যাক্তিকে হত্যা করার অর্থ একজনকেই হত্যা করা নয় বরং সমস্ত মানব জাতিকেই হত্যা করা বুঝায়। তাই হত্যার শাস্তি যদি অনুরূপ হত্যার শাস্তি দ্বারা কার্যকর না হয় এর ফলে হত্যা প্রবণতা বেড়েই চলবে এবং অসংখ্য হত্যার দরজা খুলে যাবে।[৮২]

৯. কিসাসের মধোই রয়েছে মহাজীবনের মহাসাফল্য। একথার উপলব্ধি করতে পারলে কিসাসের ভয়াবহরূপ অন্তরে বদ্ধমূল থাকবে। এতে করে হত্যা কাণ্ডে কেউ আর উৎসাহ বোধ করবে না। অন্যকে হত্যা করলে নিজেকেই নিহত হতে হবে এ বিশ্বাসের কারণে সম্ভাব্য নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ের জীবন রক্ষা পাবে।

১০. According to all classical commentators it is alsmost synonynous with musawah, i.e., making a thing equal (to as other thing) in this instance, making the punishment equal or appropriate to the crime - a meaning which is best rendered as `just retribution` and not (as has been offten, erroneously, done as, retaliation)[৮৩]

অর্থাৎ সকল ধ্রুপদী আল-কুর'আনের ভাষ্যকরদের মতে 'কিসাস' শব্দটির সমার্থবোধক শব্দ হল مُسَاوَةٌ 'মুসাওয়া'। ফলে কিসাস শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হল কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর সমপর্যায়ে পরিণিত করা। এই দৃষ্টান্তে কিসাসের সংজ্ঞার্থ দাঁড়ায় কোন অপরাধের সীমারেখা অনুযায়ী এর দণ্ডকে ন্যায়পর, সমতাপূর্ণ এবং সমান-সমান পরিগণিত করা। তাই কিসাস শব্দের ইংরেজি 'retaliation' একটি ত্রুটিপূর্ণ পরিভাষা- যা সচারচর আল-কুর'আনে ইংরেজি ভাষ্যরা গ্রহণ করে থাকেন। যেহেতু 'retaliation' শব্দের প্রতিদান ও প্রতিশোধ যে অর্থই নিহিত থাকুক না কেন, তাতে ন্যায়পর ও সমতাপূর্ণ ভাবধারা নেই। তাই মুহাম্মদ আসাদ মনে করেন, কিসাস শব্দের ইংরেজি 'just retribution' পরিভাষা দ্বারা রূপান্তর করলে সর্বোত্তম ভাবধারা অবলম্বন করা যায়।

---

৮১ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়েউল বায়ান তাফসীরে আয়াতিল আহকামি মিনাল কুর'আনে* (মিশর : দারুস সাবুনী, ২০০৭), খ. ১, পৃ.১৮৫-১৮৬

৮২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪

৮৩ Muhammad Asad, *The Message of the Quran* (Gibraltar: Dar Al- Andaalus Limited, 1980) , p.37

১১. মূলত ইসলামি শরি'য়ত অন্যায় ও পাপের মূলোৎপাটন করতে চায়, তাই স্ব-ইচ্ছায় হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হয়। এই অভিভাবকগণের পক্ষ হতে হত্যাকারীর উপরে কিসাস গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের সংরক্ষণ। কেননা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হতে দুষ্কৃতিকারীকে যে বিষয় প্রায়াশ ফিরিয়ে রাখে তা হচ্ছে জীবনে বেঁচে থাকার প্রতি অদম্য বাসনা এবং নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে স্বয়ং তাকে হত্যা করার ভয় । অতএব কিসাসই তাদের জীবন রক্ষা করল । সেই সাথে ঐ সকল ব্যক্তির জীবন রক্ষা পায় - যারা তাদের হত্যার কথা মনে মনে চিন্তা করছিল।[৮৪]

১২. কিসাসের কঠোর আইনের ভয়ে হত্যার অপরাধ সংঘটন করতে গিয়ে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। এতে বহু জীবন রক্ষা পাবে। আশা করা যায়, এমন শাস্তির আইন লংঘন করার ব্যাপারে সমাজের সকল সদস্য সাবধানতা অবলম্বন করবে। [৮৫]

১৩. ইসলাম 'ফিতরাত' তথা প্রকৃতির ধর্ম। ইসলাম এক্ষেত্রে বিবেচনা করেছে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রকৃতগত দাবীকে। এজন্য ইসলাম হত্যাকারীর জন্য কিসাসের বিধান বিধিবদ্ধ করেছে। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের মর্যাদাকে নিঃশেষ করে দিয়ে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, এমতবস্থায় ইনসাফের দাবী হচ্ছে হত্যাকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির ব্যবস্থা কার্যকর করা। এই শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির অভিবাবকের মধ্যে প্রজ্জলিত ক্রোধাগ্নি নিভানোর যৌক্তিকতা ইসলাম স্বীকার করে। যেহেতু ন্যায় বিচারই অন্তরের ক্রোধ প্রশমিত করার প্রতিবিধান। অপর দিকে এই শাস্তির বিধানই দুষ্কৃতিকারীকে বারংবার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা হতে বিরত ও প্রতিহত করবে।[৮৬]

১৪. ইজ্জত আব্রুর হিফাজত : লম্পট ব্যক্তিরা কখনো কখনো অবৈধ পন্থায় নারীর ইজ্জত হানির ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু আত্মীয় স্বজন এবং অভিভাবকগণ এবং ভিকটিম নারী স্বয়ং এই অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলে। ফলে প্রায়শ সমাজে হত্যাকাণ্ড ঘটে। কেবল ইজ্জত হানির জন্যই অপরাধী হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পক্ষান্তরে কিসাসের বিধান কার্যকরী করা হলে এরূপ কর্ম ঘটাতে কেউ সাহস করবে না। এমন কি কেউ নারীর শ্লীলতা হানির ধারে কাছে ও যাবে না। এভাবে নারীর ইজ্জত আব্রুর লজ্জা সম্ভ্রম সংরক্ষিত থাকবে।[৮৭]

১৫. জাতির প্রকৃত জীবন 'কিসাস বা হত্যাকাণ্ডের শাস্তি স্বরূপ 'মৃত্যুদণ্ড' দানের উপর নির্ভর করে। যে সমাজ মানুষের জীবনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারীকে সম্মান প্রদর্শন করে, সে সমাজ নিজেই নিজের সমাধি রচনা করে। সে সমাজ একজন হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে বহু নির্দোষ মানুষের

---

৮৪ আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ্ ইবনে তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করিম ইসলামাবাদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩) , পৃ. ২২৭

৮৫ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বংলাদেশ, ১৯৯০) খ, ১, পৃ. ৪৮৪

৮৬ সাইয়েদ কতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০২

৮৭ আকরাম নিশাত ইব্রাহিম, *আল-হুদুদ আল কানুয়্যিাহ* (ইরাক : দারুল মাতবায়তু আল-শায়াব, ১৯৬৫),পৃ. ৬৯

প্রাণকে বিপন্ন করে তোলে। এজন্য Daniel Wepstter বলেছেন, `Every unpunished murder takes away something from the security of every man's life' অর্থাৎ 'যে হত্যাকাণ্ডের শাস্তির বিধান করা হয় না, সেই হত্যাকাণ্ড প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা হরণ করে'।[৮৮]

১৬. 'কিসাস' অর্থ রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ। হত্যাকারীর সাথে সেরূপ ব্যবহার করা যেরূপ সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যেভাবে ও যে পন্থায় নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে ও সেই পন্থায়ই তাকে হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির প্রাণ সংহারের যে কাজ হত্যাকারী করেছে, তার সাথে সেই কাজই করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে। (সূরা আল- বাকারা, আয়াত নং ১৯১)[৮৯]

ইসলামি শরি'য়তে 'দিয়াত' ব্যবস্থা

ইসলামি শরি'য়তে কিসাসের সাথে সাথে 'দিয়াত' এর বিধান উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি একটি অন্যতম দয়াপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। পূর্ববর্তী ইহুদি জাতির জন্য মুসা (আ.) এর শরি'য়তে হত্যাকারীর উপর শুধু কিসাসের বিধান কার্যকর ছিল। আর খ্রিস্টানদের জন্য ছিল শুধু দীয়াতের ব্যবস্থা। কিন্তু ইসলামি শরী'য়াত মধ্যমপন্থী দণ্ড বিধান উপাস্থাপিত করেছে। আর এ মধ্যম পন্থা অবলম্বনই ইসলামী শরি'য়তের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ইসলাম একদিকে পূর্ণমাত্রার সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিসাসের বিধান দিয়েছে। তা পাওয়ার ও দাবি করার অধিকার দিয়েছে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের। এই স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে যে তারা ইচ্ছা করলে কিসাস বাস্তবায়নের পরিবর্তে হত্যাকারীর নিকট থেকে রক্তমূল্য বাবদ প্রচুর পরিমাণ অর্থ নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিতেও পারে। কোন নিহত ব্যাক্তির অভিভাবকরা ক্ষমা করলে অবশ্য আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট থেকে তাকে বিপুল সওয়াব দেওয়ার ও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে নিহত ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধের দাবিদার হচ্ছে তার অভিভাবকরা। তাদের জন্যই শরীয়তে এই এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে ।[৯০]

হত্যাকারী কখনো কখনো ক্রোধের আতিশয্যে বিবেকশূন্য হয়ে ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। এজন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদেরও কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণের বিধান দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা। হারানো ভ্রাতৃত্ববোধ ফিরিয়ে

---

৮৮ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

৮৯ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, তাফহীমুল কুর'আন (অনু. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকাঃ খায়রুন, প্রকাশনী, ২০০০),খ.২০, পৃ. ১৩৬

৯০ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

আনা। যেহেতু নিহত ব্যক্তির উওরাধীকারগণ তার আয়-রোজগারের উপর নির্ভরশীল ছিল। রক্তপণ বাবদ প্রচুর পরিমাণ অর্থ উওরাধিকারীগণকে প্রদানে বাধ্য হয়। ফলশ্রুতিতে একদিকে হত্যাকারীর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়, অপরদিকে উওরাধিকারীগণের হস্তগত হয় প্রচুর অর্থ- যে কারণে অন্তরের প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হয় হত্যাকারীর প্রতি ঘৃণা ক্ষোভ প্রতিহিংসা দূরীভুত হয় । উভয়ের মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃত্ববোধের দৃঢ় বন্ধন।[৯১]

'ভাই' শব্দের উল্লেখ দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম পন্থায় রক্তপণ গ্রহণের মাধ্যমে ঘাতকের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়াছে। আয়াতের ভাবার্থ এরকম, তোমার ও অপর ব্যক্তির মধ্যে পিতৃ হত্যার শত্রুতা থাকলেও সে ব্যক্তি তো তোমার মানবীয় ভাই। কাজেই তোমরাই এক অপরাধী ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধে ক্রোধ যদি দমন কর, তবে মানবতার দিক থেকে এটা যথোচিত কাজ হবে। এ আয়াত হতে এ কথা জানা গেল যে, দণ্ডবিধিতে নর হত্যার মত দণ্ড পর্যন্ত উভয় পক্ষের মর্জির উপর নির্ভরশীল এবং হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা আদালতের পক্ষে বৈধ নয়।[৯২]

আল-কুর'আনে নর হত্যা সংক্রান্ত আইনে সার সংক্ষেপ এ বলা যায় যে, আল-কুর'আন নিয়ত বা অন্তর্নিহিত ইচ্ছার উপর গুরুত্ব দিয়ে নর হত্যার প্রকারভেদ নির্ণয় করেছে। এ ক্ষেত্রে কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের জন্য কিসাসের বিধান বিধিবদ্ধ করেছে। পাশাপাশি নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে কিসাসের পরিবর্তে 'দিয়াত' অথবা সাধারণ ক্ষমা বেছে নিয়ে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। আল-কুর'আনের এই বিধান আধুনিক আইন বিজ্ঞানের জগতে অভূতপূর্ব। কারণ নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হত্যাকারীর শাস্তি গ্রহণে সাধারণত তিন ধরনের শ্রেণি প্রকৃতিতে বিভক্ত দেখা যায়। কেউ হয়ত কিসাসের মাধ্যমে তাদের ক্রোধাগ্নি নির্বাপন করবে। কেউ হয়ত হত্যাকারীর অনুশোচনায় সাড়া দিয়ে কিসাসের পরিবর্তে চুক্তিমূলে দিয়াত গ্রহণ করে হত্যাকারী ও তার পরিবারবর্গের সাথে নতুন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। কেউ হয়ত কিসাস বা দিয়াত কোনটিই গ্রহণ না করে হত্যাকারীকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিবে। তাই ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তিন ধরনের শাস্তি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ব্যক্তিগত এখতিয়ারের উপর ছেড়ে দিয়ে আল-কুর'আন হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধানে মানবাধিকারকে সুরক্ষিত করেছে।

---

৯১ আবু- জুহরা, *ফালসাফাতু আল-উকুবাত* (বৈরুত : দারুল ফিকর আল- আরাবি, তা.বি.), পৃ. ৩৩৭
৯২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, খ. ১, পৃ. ১৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চুরি সংক্রান্ত আইন

জননিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি স্বরূপ নিকৃষ্টতম অপরাধ হচ্ছে চুরি। সমস্ত মানব জাতির দৃষ্টিতে চুরি একটি ঘৃণিত, নিকৃষ্ট ও মানবিক মূল্যবোধহীন দণ্ডযোগ্য অপরাধ।[৯৩] ইসলামী আইনবিদগণ চুরির সংজ্ঞা, এর স্বরূপ ও শাস্তি সম্পর্কে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। অপরদিকে প্রচলিত আইনবিদগণও তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে থেকে চুরির সংজ্ঞা ও শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। ইসলাম চুরিকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।[৯৪] এজন্য ইসলামে চুরির শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আর তা হচ্ছে হাত কাটা। হাত কাটার শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ আইন (হদ্দ)। তবে হাত কাটার শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রকে তার প্রতিটি নাগরিকের মৌল-মানবিক অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তারপরও যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিক চুরি করে তাহলে ইসলামী শরি'য়তের নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কিছু শর্তাদি ও প্রমাণাদির সাপেক্ষে হাত কাটার বিধান প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। উক্ত শর্তাদি ও প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে চুরির শাস্তি 'হাত কাটা' প্রয়োগ করা যায় না। বরং বিচারক তার নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেরূপ ন্যায়সঙ্গত মনে করবেন তিনি সেইরূপ শাস্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু প্রচলিত আইনে চুরির শাস্তি হাত কাটা নয় বরং জেল-জরিমানা।

চুরির সংজ্ঞা

আরবী অভিধানে চুরি শব্দের বেশ কিছু মূলধাতু রয়েছে। তবে চুরির আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে (السرقة) 'আস্-সিরকাতু' শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৯৫] এ শব্দটি 'আল- ইসতিরাক' শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ গোপনে ছিদ্র করা।[৯৬] আরবিতে বলা হয় استرق السمع 'ইসতিরাক আস-সম'উ' অর্থ গোপনে শ্রবণ করা।[৯৭] অতএব গোপনে চুরি করে শ্রবণ করা।(السرقة) আস-সিরাকাতু এর শাব্দিক অর্থ গোপনে কোন কিছু নিয়ে নেয়া।[৯৮] আরবদের নিকট (السارق) আস-সারিক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়; যে ব্যক্তি কোন সংরক্ষিত স্থানে গোপনে যেয়ে এমন বস্তু সরিয়ে নেয় যাতে তার অধিকার নেই।[৯৯]

---

৯৩ মুহাম্মদ মুসা, 'চুরির অপরাধ: ইসলামী শরি'য়তের বিধান ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি', *ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার* (ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯), বর্ষ ৫ম, সংখ্যা ১৯, পৃ. ২৫

৯৪ বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২), খ. ২, পৃ. ২১৮

৯৫ অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ৫৩

৯৬ জামালুদ্দিন ইবনে মানজুর আল-আফরিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরুত : দারুস সদর লাইব্রেরী, তা.বি.), খ.১০, পৃ. ১৫৫-১৫৬

৯৭ মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর আল-রাজী, *মুখতার আল-ছিহাহ্* (বৈরুত : দার আল-কুতুব, তা.বি), পৃ. ২৯৬

৯৮ আল-ইমাম জাকারিয়া আল-আনসারী, *তুহফাতুল তুল্লাব* (বৈরুত : আল মুয়াচ্ছাছা আল- আরাবিয়া, তা.বি), খ.২, পৃ. ৪৩২

৯৯ জামালুদ্দিন ইবনে মানজুর আল-আফরিকী, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ১৫৬

পারিভাষিক বিশ্লেষণ: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম 'অপরাধ দমনে ইসলাম' গ্রন্থে লিখেন, গোপনভাবে অন্যকে না দেখিয়ে পরের ধন-সম্পদ করায়াত্ত করাই হচ্ছে চুরি। অন্যদের কথা-বার্তা তাদের অজ্ঞাতসারে শ্রবণ করাকে বলা হয় 'চুরি করে শোনা'। অন্যকে না জানিয়ে দেখা হচ্ছে 'চুরি করে দেখা' তবে কেড়ে নেয়া, ছিনিয়ে নেয়া (Snatching) এবং আত্মসাতকরন ও গচ্ছিত ধন অপহরণ (Embezzlement) চুরি নয়, হাত কাটা তার শাস্তি নয়, নবী করিম (স.) বলেছেন খেয়ানতকারী ও অপহরণকারীর শাস্তি হাত কাটা নয়। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (স.) বলেছেন, 'জোর পূর্বক অপহরণকারীর শাস্তি হাত কাটা নয়।[১০০]
ইসলামী আইনের পরিভাষায়, চুরি বলা হয় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের এমন সম্পদ গোপনে হরণ করা, যে সম্পদ কোন স্থানে সংরক্ষক দ্বারা সুরক্ষিত এবং যার মূল্য দশ দিরহাম ।[১০১]

আল্লামা সারাখ্সী বলেন, অপরের সম্পদ গোপনভাবে হরণ করাকে শাব্দিকভাবে চুরি বলে।[১০২] আল্লামা সিরাজী বলেন, চুরি হল প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেক সম্পন্ন স্বাধীন অভাবহীন ব্যক্তি কর্তৃক চুরির উদ্দেশ্যে অনুরূপ সংরক্ষিত সন্দেহবিহীন নিসাব পরিমাণ সম্পদ হরণ করা।[১০৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে চুরির সংজ্ঞা দাঁড়ায়, কোন বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক অপরের দখলভুক্ত 'নিসাব পরিমাণ মাল' কোন সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে হস্তগত করাকে চুরি বলে।[১০৪]

চুরির শাস্তি

চুরি হদের আওতাভুক্ত একটি গুরুতর অপরাধ। এর শাস্তি আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'পুরুষ অথবা নারী চুরি করলে তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।[১০৫] আলোচ্য আয়াত দ্বারা

১০০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০
১০১ ইবনে হুমাম, *শরহে ফতহুল কাদীর* (পাকিস্তান : রাশিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৮), পৃ. ১৩০
১০২ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে আবী ছহল শামছুল আয়েম্মাহ আল-সারাখসী : *মাবসুত* (পাকিস্তান : ইদারাতুল কুর'আন ও আল-উলুম আল-ইসলামীয়া-আশরাফ মঞ্জিল, তা.বি), পৃ. ১৩৩
১০৩ আল-শিরাজী, *মুহাজ্জাব* (বৈরুত: দারুল মারিফ, ১৩৭৯ হি), পৃ. ২৭৭
১০৪ মুহাম্মদ মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১০৫ আল-কুর'আন, আল- মায়েদা, ৫ : ৩৮

অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, চুরির শাস্তি হাত কাটা। তবে হাত কাটার দণ্ড প্রয়োগে ফিকহবিদগণ কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন। এ সকল শর্ত পূরণ না হলে হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। বরং সেক্ষেত্রে তা'যীর আওতায় বিচারক যে শাস্তি নির্ধারণ করবেন সেই শাস্তিই প্রয়োগ করবেন। শাইখ কালিম আল- কুনুভী বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার হেতু ইসলামী আইনের পরিভাষায় হদ হলো নির্ধারিত শাস্তি।[১০৬] আর যে সব অপরাধের কোন শাস্তি কুর'আন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে সেসব শাস্তিকে শরি'য়তের পরিভাষায় তা'যীর তথা দণ্ড বলা হয়।[১০৭]

চুরির হদ প্রয়োগের শর্তাবলী

ইসলামী আইনে চুরির শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। চুরির শাস্তি তথা হাত কাটার হদ প্রয়োগ বেশ কিছু শর্তাবলী উপর নির্ভরশীল। এসব শর্তাবলী ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণ কিছুটা মতভেদ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সকল ফকীহ্ একমত যে, চুরির হদ তথা হাতকাটা বাধ্যবাধকতা চুরির ঘটনার নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।[১০৮] নিম্নে চুরির হদ প্রয়োগের শর্তাবলী উল্লেখ করা হল:

১. চোরকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। এর অর্থ সে যদি মস্তিস্ক বিকৃত বা নাবালেগ হয়ে থাকে, তবে তার উপর চুরির শাস্তি (হদ) কার্যকর হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কলম তুলে রাখা হয়েছে (শাস্তি হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে), শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত; ঘুমন্ত ব্যক্তি, জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল ; সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।[১০৯]

২. মালটি কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত মালিকানাধী হতে হবে, তাতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানার সন্দেহও থাকা চলবেনা এবং চুরিকৃত বস্তুটি এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে হবে, যাতে জনগণের অধিকার সমান; যেমন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও তার বিষয় সম্পত্তি। এতে বুঝা গেল যে, যে বস্তুতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানার সন্দেহ আছে কিংবা যে বস্তুতে জনগণের অধিকার আছে, এমন সকল বস্তু চুরি করলে চুরির হদ তথা চোরের হাত কাটা যাবে না বরং বিচারক তার বিবেচনা অনুযায়ী তাকে অন্য কোন সাজা (তা'যীর) দিবেন।[১১০]

---

১০৬ শাইখ কালিম আল-কুনুভী, *আনিছ আল-ফোকাহা ফি তা'রীফাত আল-আলফাজি আল-মুকতাদী বাইনা আল- ফোকাহা* (জেদ্দা : দারুল ওফ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ১৭৩

১০৭ মুফতি মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মুহিউদ্দিন খান ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), খ.৩, পৃ. ৫৩৭

১০৮ বুরহানুদ্দিন আবুল হাসান আলী বিন আবি বকর আল মুরগিনানি, *আল-হিদায়াহ্* (দিল্লি : রশীদিয়া লাইব্রেরি, তা.বি), খ.১, পৃ. ৫৩৭

১০৯ হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৯০), কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ৮১৭০ ও ৮১৭১

১১০ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৩. মালটি হেফাজতের জায়গায় থাকতে হবে। অর্থাৎ তালাবদ্ধ গৃহে অথবা চৌকিদারের প্রহরায় থাকতে হবে। তবে সংরক্ষিত স্থান থেকে কোন কিছুর নিয়ে গেলে তদ্দরুণ হাত কাটা যাবে না এবং মাল সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও হাত কাটা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, প্রাচীরের বাইরে ঝুলন্ত ফল বা রাতের বেলা পাহাড় থেকে ধরে নেয়া কোন মেষের জন্য হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে মেষ খোয়াড়ে আবদ্ধ থাকলে এবং খেজুর শুকাবার খোলা গোলায় থাকা অবস্থায় হস্তগত করা হলে হাত কাটা হবে-যদি তার মূল্য ১টি ঢালের মূল্যের সমান হয়।[১১১]

৪. চুরিকৃত মালটি বিনা অনুমতিতে নিতে হবে। যে মাল নেয়ার অথবা নিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি কাউকে দেয়া হয়, সে যদি তা একবারেই নিয়ে যায়, তবে চুরির হদ জারী হবে না এবং অনুমতির সন্দেহ গোচরীভূত হলেও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[১১২]

৫. মালটি গোপনে নিতে হবে। কেননা অপরের মাল প্রকাশ্যে লুট করলে তা চুরি নয়, বরং ডাকাতি।[১১৩]

৬. ক্ষুধা বা দুর্ভিক্ষের কারণে নিরূপায় হয়ে কেউ চুরি করলে চুরির হদ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা নবী করীম (স.) বলেছেন, ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।[১১৪]

৭. চুরিকৃত বস্তু মাল বা সম্পদ হতে হবে এবং এর আর্থিক মূল্য থাকতে হবে। চুরির শাস্তি হাত কাটা কেবল সংরক্ষিত হালাল সম্পদ চুরি করার উপর বিধিবদ্ধ হয়েছে।[১১৫] তাই মদ, শূকর, মৃতের চামড়া, ইত্যাদি চুরি করলে হাত কর্তন হদ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ ইসলামে দৃষ্টিতে এগুলো সম্পদ নয়।[১১৬]

৮. চুরিকৃত মালের মূল্য 'নিসাব' পরিমাণ হতে হবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হদযোগ্য অপরাধ গণ্য হতে পারে, মালের পরিমাণ ততখানি হতে হবে। হানাফি মাযহাব মতে এর পরিমাণ এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম। মহানবী (স.) এর প্রসঙ্গে বলেন যে, 'এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম পরিমাণ ছাড়া হাত কাটা যাবে না'।[১১৭] এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) আরো বলেন যে, 'কোন চোরের হাত ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তন করা যাবে না, যতক্ষণ না একটি ঢালের মূল্যমান পরিমাণ চুরি

---

১১১ প্রাগুক্ত।
১১২ প্রাগুক্ত।
১১৩ প্রাগুক্ত।
১১৪ আব্দুল্লাহ আদ-দারিমী, *আস্-সুনান* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবি, ১৪০৭ হি.), কিতাবুল হুদুদ, হাদিস নং ৮
১১৫ মুহাম্মদ মুসা ,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১১৬ ড. আহমেদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৬৩
১১৭ আবু ঈসা মুহাম্মদ আত-তিরমিযী, *আল-জামি আত-তিরমিযী* (বৈরুত : দারুল ইহইয়া'ইত তুরাছিল আরবি, তা.বি), কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ১৪৪৬

করে। আর ঐ সময় একটি ঢালের মূল্যমান ছিল দশ দিরহাম (মুসান্নাফে ইব্‌ন-আবি শাইবা)।[১১৮] অধিকাংশ আলিমদের (মালিকী, হানাফি ও শাফিঈ) মতে, চুরিকৃত সম্পদের নিসাব (নির্ধারিত পরিমাণ) হলো দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তিন দিরহাম বা তার মূল্য। প্রমাণ হল রাসূল (স.) এর বক্তব্য, 'দীনারের এক-চুতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশী চুরি করলে হাত কাটা যাবে। (আহমদ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)। ঐ সময় একটি ঢালের মূল্য ছিল তিন দিরহাম।[১১৯] বর্তমান কালে এক দীনার সমান ২.২৫ গ্রাম স্বর্ণের সমান। আর এক দিরহাম = ২.৯৭৯ মতান্তরে ৩.১৭ গ্রাম রৌপ্য। এ বিরোধপূর্ণ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মূলত মতবিরোধের সূত্রপাত হলো ঢালের মূল্য নির্ণয়ের কারণে চুরিকৃত সম্পদের নিসাবের ক্ষেত্রে বিরোধ তৈরি হয়েছে। ঢালের বিভিন্ন মানের কোয়ালিটির উপর মূল্য কমবেশী হওয়া স্বাভাবিক।[১২০]

৯. মালটি হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। চুরি প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ চুরি বলা হয় অপরের মাল স্থানান্তরিত করে চোরের দখলে আনয়নকে। যেসব মাল স্থানান্তরযোগ্য নয় তা চুরি করা সম্ভবপরও নয়।[১২১]

১০. পসারণকৃত মাল অন্যায়ভাবে দখল বা মালিকানাভুক্ত করার অভিপ্রায় থাকতে হবে।[১২২] এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, 'চোরের পক্ষ থেকে চুরি করার কাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে হতে হবে। তাই জবরদস্তিভাবে চুরি করানো হলে তার উপর হদ কায়েম করা যাবে না।[১২৩]

বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে চুরির সংজ্ঞা

দণ্ডবিধি '১৮৬০ এর ৩৭৮ ধারা মোতাবেক চুরির সংজ্ঞা হল, 'যদি কোন ব্যক্তি কারোও দখল হতে তার সম্মতি ব্যতীত কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত সম্পত্তি অনুরূপভাবে গ্রহণের জন্য অপসারণ করে তা হলে উক্ত ব্যক্তি চুরি করিয়াছে বলিয়া কথিত হয়'।[১২৪] এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে চুরির অপরাধের যে সকল উপাদান প্রতিভাত হয় তা হচ্ছে,

ক) সম্পত্তিটি অস্থাবর প্রকৃতির, খ) তা কোন ব্যক্তির দখলে আছে, গ) অপর ব্যক্তি তা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে, ঘ) স্থানচ্যুত করে, ঙ) দখলদারের সম্মতি ব্যতিরেকে, চ) সেই ব্যক্তি চোর হিসেবে গণ্য। এসব উপাদানের কোন অভাবে বা অনুপস্থিতে চুরি সংঘঠিত হতে পারে না (অর্থাৎ উপরোক্ত

১১৮ আশ-শাওকানী, *নাইনুল আওতার* (বৈরুত : দুরুত-তুরাস, তা.বি), খ.৭, পৃ. ১২৪
১১৯ প্রাগুক্ত।
১২০ বিচারপতি আব্দুস সালাম ও অন্যান্য , প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২১৯
১২১ মুহাম্মদ মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১২২ প্রাগুক্ত।
১২৩ বিচারপতি আব্দুস সালাম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২১৯
১২৪ গাজী শামছুর রহমান, *দণ্ডবিধি* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৭), পৃ. ৮৪৬

উপাদানগুলোর যে কোন একটির অনুপস্থিতিতে দণ্ডবিধির অধীনে চুরির সংজ্ঞার মধ্যে তা পড়বে না)। উপরোক্ত উপাদানের মধ্যে দুটি উপাদান চুরির অপরাধ গঠনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে অস্থাবর সম্পত্তিকে তার দখলদার ব্যক্তির দখল হতে তদীয় বিনা অনুমতিতে সরানো এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসাধু উদ্দেশ্যে উক্ত কাজটি করা। যেখানে অসাধুতা নাই সেখানে চুরি নাই। অসাধুতা বলিতে নিম্ন বর্ণিত তিনটি অবস্থা বুঝায়:

ক) অন্যায় পথ গ্রহণ করা, খ) বেআইনী লাভ বা লোকসান করা, গ) বেআইনী লাভ-লোকসানের জন্য বেআইনী পথ পরিগ্রহ করা'।[১২৫]

প্রচলিত আইন চুরির শাস্তি

দণ্ডবিধিতে ৩৭৯ ধারায় চুরির শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ' যে ব্যক্তি চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।[১২৬] উক্ত দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারায় বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 'যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন গৃহ, তাবু ও জলযান যা মানুষের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডে ও দণ্ডিত করা হবে।[১২৭]

চুরির শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী শরি'য়তের বিধান বনাম প্রচলিত দণ্ড বিধি

চুরির সংজ্ঞা ও এর উপাদানসমূহের মধ্যে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে বেশকিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে ইসলামী আইনে চুরির অপরাধ প্রমাণের জন্য নিম্ন লিখিত শর্তগুলো বিবেচনায় আনা অত্যাবশ্যক যা কিনা প্রচলিত দণ্ডবিধিতে অনুপস্থিত। যথা,

এক. হস্তগত বস্তু মাল তথা হালাল সম্পদ হওয়া। যেমন গবাদী পশু, নগদ অর্থ সোনা-রূপা ইত্যাদি। অর্থাৎ যে বস্তু বা জিনিস নগদ অর্থের সাথে বিনিময়যোগ্য, মানুষের ব্যবহারযোগ্য এবং শরি'য়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ নয় তাকে মাল বলা হয়। অতএব, শূকর, মাদক দ্রব্য, মৃত জীবের গোশত ইত্যাদি মাল হিসাবে পরিগণিত নয়।[১২৮]

দুই. চোরকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

---

১২৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫০
১২৬ গাজী শামছুর রহমান ,প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫১
১২৭ প্রাগুক্ত।
১২৮ মুহাম্মদ মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

তিন. চোর যে মালটি যার দখল থেকে স্থানচ্যুত করেছে উক্ত মালের উপর তার বৈধ মালিকানা থাকতে হবে। অতএব, চুরিকৃত মালটির বৈধ মালিকানা যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে চুরির অপরাধটি হদযোগ্য চুরি হিসেবে গণ্য হবে না। উদাহারণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি ছিনতাই, রাহাজানি বা আত্মসাত করে কিছু মাল নিজ দখলে এনেছে। এ জাতীয় মাল গোপনে স্থানচ্যুত করার কর্মটি হদযোগ্য চুরি হিসাবে গণ্য নয় এবং মালিকানাহীন বস্তুর গোপনে স্থানচ্যুত করাও চুরি হিসেবে গণ্য নয়।[১২৯]

চার. চুরিকৃত মাল 'সযত্ন হেফাজত' থেকে গোপনে সরানোর কর্মটি হদযোগ্য চুরি হিসেবে গণ্য। অযত্ন বা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মালের ক্ষেত্রে হদ (হস্তকর্তন) প্রযোজ্য নয়।[১৩০]

পাঁচ. চুরির মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হবে। যার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, চুরির উপরোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতি কেবল ইসলামী আইনে হদ তথা হাত কাটার শাস্তি নির্ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু উপরোক্ত উপাদানগুলোর অভাবে অপরাধী চুরির দায় হতে নিষ্কৃতি পাবে না, বরং অপরাধীকে তা'যীরের আওতায় বিচারক শাস্তি প্রদান করবেন। তাছাড়া সকল ফকিহ্ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেছেন যে, প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌল-মানবিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করে ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকের উপর চুরির হদ হিসেবে হাত কাটার দণ্ড প্রয়োগ করবেন।[১৩১]

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামী আইনে চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হাতকাটা কিন্তু তা কতিপয় কঠিন শর্তযুক্ত, অপরপক্ষের প্রচলিত আইনে চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছর। আধুনিক আইনে চুরির শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড নির্ধারণ করেছে, যা চুরি তো বটেই অন্য সকল অপরাধ দমনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার কারণ এই যে, কারাদণ্ড এমন কোন প্রেরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না, যা অপরাধীকে চুরি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু ইসলামী আইনে চুরির শাস্তি হাত কাটা কার্যকর করার পূর্বে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিতের বিধান রাখা হয়েছে বলে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে চুরির জন্য সিকিভাগও হাতকাটার মত অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।[১৩২]

চুরির শাস্তি আইনের দর্শন

আল-কুর'আনে চুরির শাস্তি আইনের দর্শন বহুবিধ। নিম্নে এরূপ কিছু দর্শন তুলে ধরা হল:

---

১২৯ মুহাম্মদ মুসা , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৩১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ১০১
১৩২ প্রাগুক্ত।

ইসলাম ব্যক্তির চেয়ে গুরুত্ব দেয় সমষ্টির নিরাপত্তার, সমাজের স্থিতিশীলতার। যেহেতু চুরি হচ্ছে গোপনীয় সংগঠিত অপরাধ, তাই গোপনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে শক্তিশালী কঠোর শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তবে চোর ও চুরি সাব্যস্তকরণের জন্য নিঃসন্দেহাতীত প্রমাণাদি প্রয়োজন। এটা এমন একটা অপরাধ যাতে অপরাধী হারাম উপার্জনের মাধ্যমে সম্পদ বাড়াতে পারে। তাই হাতকাটার শাস্তি দ্বারা এ দিকটি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে অবৈধ পন্থায় অতিরিক্ত উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়।[১৩৩]
এ কঠোর শাস্তি কেউ নিজ ও সন্তানদের ক্ষুৎ পিপাসার যন্ত্রনায় বাধ্য হয়ে চুরি করলে আরোপিত হবে না। কেননা ইসলামের সাধারণ নীতিমালা হল, 'বাধ্য হয়ে অপরাধ করলে তা শাস্তির আওতাভুক্ত নয়'। অনুরূপভাবে সন্দেহের ক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি মওকুফ হয়ে যায়, যেমন মহানবী (স.) বলেছেন, 'সন্দেহসমূহের কারণে শাস্তি দিও না। ক্ষুধাও একটি সন্দেহ। এজন্য হযরত উমর (রা.) তার খেলাফতের সময় দুর্ভিক্ষের কারণে হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করেননি। এ ধরনের শাস্তিকে চরম প্রতিরোধমূলক শাস্তি হিসেবে ইসলাম গণ্য করে। অঙ্কুরেই অপরাধের মূলোৎপাটন এবং জন-সাধারণের শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতাকে সজীব রাখার জন্য চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হাতকাটাকে ইসলাম সুনিশ্চিত করে। [১৩৪]

চুরির শাস্তিতে বেশি কঠোরতার হিকমত হলো, আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদকে নিশ্চিতভাবে চোরের হাত কেটে সংরক্ষণ করতে চান। চুরি ছাড়া অন্য ব্যাপারে এরূপ আইন আল্লাহ তা'য়ালা করেন নি। কেননা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রমাণ প্রদর্শন করতে না পারলে শাস্তি রহিত হয়ে যায়। আর চুরির শাস্তি কঠোর এজন্য যে, তাতে কঠিনভাবে তা থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।[১৩৫]

আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা চোরের হাত কাটার বিধান এজন্য দিয়েছেন যেন চোরকে মনস্তাত্তিকভাবে চুরি থেকে বিরত রাখা যায়। বিশেষ করে সিঁদ কাটা, সংরক্ষণ বিনষ্ট করা, তালা ভাঙ্গা ইত্যাদি থেকে চোরকে নিবৃত্ত করা যায়। যদি হাত কাটার বিধান চুরির ব্যাপারে না থাকত, তাহলে লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে চুরি করে নিয়ে যেত। ফলে সমাজে অনেক বড় ক্ষতি হত। আল্লাহ তা'য়ালা চুরির শাস্তিকে হাত কাটার দর্শন 'যা তার উপার্জন করেছে, তারই বিনিময়' বাণী দ্বারা বর্ণনা করেন এটা ছোট ও সংক্ষিপ্ত বাক্য দর্শনের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। নর-নারী চোর অপরের সম্পদ নিজেদের হাত দ্বারা অবৈধ পন্থায় বিনা সম্মতিতে অর্জন করে। তাই এর শাস্তি হাত কাটা বাধ্যতামূলক।

---

১৩৩ ড. মোস্তফা কামাল, *মৌলিক সমস্যার সমাধানে ইসলামী আইন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৬), পৃ. ২২৭
১৩৪ প্রাগুক্ত।
১৩৫ প্রাগুক্ত।

যেহেতু উভয় হাত ও পা দিয়ে সম্পদ চোর হরণ করে, তাই তার জন্য 'যেমন কর্ম তেমন ফল' হিসেবে এরূপ কঠিন শাস্তি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৩৬]

ইসলামের পূর্বে চুরির শাস্তির ব্যাপারে অনেক কঠিন বিধান লক্ষ্য করা যায়। শাহ্ওয়ালী উল্লাহ (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের পূর্ববর্তী শরি'য়তে হত্যার জন্য কিসাস, ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপ ও চুরির জন্য হাত কাটার বিধান ছিল। যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তাতে সকল নবী ও উম্মতরা একমত। চুরির শাস্তি বনী ইসরাইলদের নিকটও প্রচলিত ছিল, তাওরাত কিতাবের ভাষ্যে এর প্রমাণ মেলে। তাতে আছে যে, চুরির শাস্তি তাদের সময় পাথর নিক্ষেপ দ্বারা মৃত্যুদণ্ড ছিল। কিন্তু চুরির ব্যাপারে এরূপ শাস্তি ছিল অত্যাধিক বাড়াবাড়ি। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। যাতে মানব জাতি জুলুম ও সীমালংঘনের মধ্যে নিপতিত না হয়, চুরির অপরাধ সমূলে উচ্ছেদ হয়, শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে চুরির সকল উপায়-উপকরণ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।[১৩৭]

চোরের হাত কাটার ফলে তার দৈহিক ক্ষতি সাধিত হয়। যা নানা রোগের জন্ম দেয়, ফলে চোরের শরীরে শারীরিক বৈকল্য সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এরূপ দৈহিক ক্ষতি হতে রক্ষার জন্য চোরের হাত কাটা শাস্তি বিধান চালু করা হয়েছে।[১৩৮]

ইসলাম শিক্ষা ও মার্জিত করণ দ্বারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য চুরির ব্যবস্থাপত্র এভাবে করেছে যে, চোর যেন অপরের সম্পদের প্রতি লোভ লালসা না করে স্বপোর্জিত কর্মে নিয়োজিত থাকে। আলস্য-কৃপণতা পরিত্যাগ করে পৃথিবীর কঠিন বাস্তব জীবনের কঠোরতা মেনে নিয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পরে। অনুরূপভাবে ইসলাম বেকারত্ব ও দারিদ্রের জিম্মাদার এভাবে হয় যে, শাসকের মাধ্যমে ধনীদের থেকে সম্পদের যোগান দিয়ে দরিদ্র ও বেকারদেরকে সাহায্য করে। যাকে ইসলামে যাকাত বলা হয়। এভাবে ইসলাম সামাজিক দায়িত্বকে সমাজের লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে জনগণের সম্পদের উপরে সীমালংঘনের কোন পথ খোলা থাকে না। যে ব্যক্তি এ ধরণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা থাকার পরও অপরের সম্পদের উপর সীমালংঘন করে চুরি বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকে সে অবশ্যই নির্ধারিত শাস্তি হাত কাটার যোগ্য হয়ে পড়ে।[১৩৯]

চুরি সম্পর্কে রবার্ট রবার্টস কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি ও এর জবাব

চুরির শাস্তি হাত কাটাকে আল্লাহ তা'য়ালা আদর্শ দণ্ড বলেছেন। এই আদর্শ দণ্ডটিই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কঠোর সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে এবং কতিপয় নামধারী মুসলমান এ সকল পাশ্চত্য পণ্ডিতদের সাথে

---

১৩৬ ড. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত।
১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
১৩৮ প্রাগুক্ত।
১৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

সুর মিলিয়ে চুরির শাস্তি হাত কাটাকে অমানবিক ও নিকৃষ্ট শাস্তি হিসাবে গণ্য করেন। Robert Roberts গ্রন্থে আল-কুর'আনের চুরির শাস্তির আইন সম্পর্কে কিছু অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করেন। এ সকল অভিযোগ আপত্তির জবাব নিম্নরূপ :

প্রথম আপত্তি

> পাশ্চাত্য পণ্ডিত Robert Roberts তার 'The Social Laws of The Quran' গ্রন্থে লিখেন,
>
> Still it seems strange that the matter of theft, which is so fully treated by other legislators, should receive such scant notice by muhammed' [১৪০]
>
> 'তিনি উক্ত গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেন যে, 'How insuffciently the matter is treated by Muhammed himself in the Quran and on the other hand, the peculiar character of the punishment enacted by the Muhammedan's doctors as compared whith those we generally find in other ancient codes.[১৪১]

'চুরির মত এত বড় জঘন্যতম অপরাধ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুর'আনে কেবল একটি মাত্র উদ্ধৃতি পাওয়া যায় এবং তাও আবার মাত্র দু'একটি শব্দে। Robert Roberts যাকে insufficient তথা অপর্যাপ্ত বা নগণ্য আখ্যা দেন পাশাপাশি তৎকালীন অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে বিদ্যমান চুরি সম্পর্কিত আইনসমূহকে পূর্ণাঙ্গ বলে মন্তব্য করেন। উক্ত পণ্ডিত মুসলিম আইনবিশারদদের চুরি সম্পর্কিত যাবতীয় বিধি-বিধানকে অদ্ভুত ও খাপছাড়া গোছের হিসেবেও মন্তব্য করেন।

আপত্তির জবাব

১. আল-কুর'আন হচ্ছে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল বা আকর। কুর'আনের বর্ণনা পদ্ধতিই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ভাব-গম্ভীর, অর্থবোধক ও গভীর দর্শনপূর্ণ। যে বিষয়টি Robert

---

১৪০ Robert Roberts, Ibid , p.92

১৪১ Ibid , p.94

Roberts নিজেই অবচেতন মনে স্বীকার করে নিয়েছেন তার উক্তি Very few words এর উল্লেখ দ্বারা। আল-কুর'আনের সংক্ষিপ্ত বাক্য দর্শনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও এর শক্তিমত্তা বুঝতে Robert Roberts সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে যা ইতিপূর্বের আলোচনায় আল-কুর'আনের চুরি সম্পর্কীত আয়াতটির দার্শনিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. চুরি সম্পর্কিত আল-কুর'আনের আয়াতটি শুরু হয়েছে প্রথম পুরুষ চোরের উল্ল্যেখ পরে নারী চোরের প্রসঙ্গটি এসেছে। এখানে পৃথিবীর আদালতের অধিকাংশ পুরুষ বিচারক পক্ষদুষ্ট হয়ে পুরুষ চোরকে অপরাধের শাস্তি থেকে যাতে অব্যাহতি না দিতে পারে এবং আল্লাহর আইনে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্বা

৩. রোপ করার জন্য পুরুষ চোরের প্রসঙ্গটি প্রথমে এসেছে। এর দ্বারা সমাজে অবহেলিত নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করা অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি (র.) বুখারী শরীফে কিতাবুল হুদুদ অধ্যায়ে 'সবল-দুর্বল নির্বিশেষে দন্ড প্রয়োগ' শিরোনামের অধীনে হযরত আয়েশা (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা.) বলেন যে, এক মহিলার দণ্ড সম্পর্কে নবী করিম (স.) এর কাছে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) সুপারিশ করলে তিনি বললেন যে, প্রকৃত পক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ কারণেই ধ্বংশ হয়ে গেছে। তারা দুর্বল (সাধারণ) লোকদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আর ভদ্রদেরকে (সম্ভ্রান্ত) রেহাই দিত। তারপর হযরত আয়েশা (রা.) কুর'আনের এই বাণী তিলাওয়াত করেন, 'তোমরা পুরুষ ও মহিলা 'চোর' উভয়ের হাত কেটে দাও'।[১৪২]

৪. পবিত্র আল-কুর'আনে চুরির সর্বোচ্চ শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একথা সবর্জনবিদিত যে, কোন বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি উল্লেখ করলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু আল-কুর'আন হচ্ছে সংবিধান। তাই এখানে চুরির শাস্তি 'হাত কাটা' মৌলিক আইন হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। আর চুরির অন্যান্য শাস্তি দেশের সরকার, রাষ্ট্র প্রধান কিংবা বিচারকের বুদ্ধি বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিচার-বিবেচনা করতে হয় ইজমা ও কিয়াসের (Analog) উপর ভিত্তি করে। এই ইজমা কিয়াসের ভিত্তিতে বিভিন্ন ইসলামী আইনবিদগণ চুরির অপরাধটির পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত সমাধান দিয়েছেন।

৫. সর্বশেষ আল্লাহ তা'য়ালা হাত কাটার দর্শন বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যতার সাথে ২টি কারণ বর্ণনা করার মাধ্যমে। প্রথম কারণটি হচ্ছে, 'এই শাস্তি তারা নিজেরাই অর্জন করেছে' আর ২য় কারণ হল এই শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ বা কাংক্ষিত। আয়াতে 'নাকাল' শব্দ

১৪২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈর আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হাদিস নং ৩৫৭৪

উল্লেখ করা হয়েছে। নাকাল বলা হয় এমন শাস্তি যা দেখে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং অপরাধ হতে বিরত হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।[১৪৩]

দ্বিতীয় আপত্তি

Robert Roberts তার আলোচ্য গ্রন্থে আরেকটি গুরুতর আপত্তি করেছেন এভাবে, 'This is not only a crulel punishment but also in the highest degree unreasonable. For while many acts of theft may be attributed to want, a man's chances of earning an honest living are maturally lesyened when he is deprived of one or more of his members'.[১৪৪] এটা (হাত কাটার শাস্তি) শুধুমাত্র একটি নিষ্ঠুর দণ্ডই নয় বরং এটা শাস্তির মাত্রায় সর্বোচ্চ ও অযৌক্তিক। কারণ অনেক সময় চুরির ঘটনাটি ক্ষুধার তাড়নায়ও ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তির সৎ ভাবে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রে সংকুচিত হয় যখন নাকি সে তার এক বা একাধিক সতীর্থ থেকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা না পায়।

আপত্তিটির জবাব নিম্নরূপ

ক. এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুর রহিম লিখেন, 'চুরি হয় গোপনে, লোকক্ষুর আড়ালে। ফলে তা প্রমাণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই গোপন সংঘটিত অপরাধটি যদি অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়, তাহলে তার শাস্তি কঠিনতর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেন তা দেখে অন্যরা শিক্ষা পায়, সর্তক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন, 'তিন দিরহাম মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার জন্য হাত কাটার শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু অপহরণ, আত্মসাতকরণ ও বল প্রয়োগে করায়ত্তকরণ অপরাধে হাত কাটার শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু অপহরণ, আত্মসাতকরণ ও বল প্রয়োগগে করায়ত্তকরণ অপরাধে হাত কাটার শাস্তির ব্যবস্থা না করায় ইসলামী শরি'য়তে নিহিত পরম যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। কেননা চোর থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সে ঘরে সিঁদ কাটে, সর্বপ্রকার রক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বানচাল করে, তালা ভাংগে। ধন-সম্পদের মালিকানা তা থেকে প্রায় বাঁচতে পারে না। এরূপ অবস্থায় চুরির দরুণ লোকেরা কঠিন বিপদে পড়ে যেতে পারে।[১৪৫]

---

১৪৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১
১৪৪ Robert Roberts, Ibid, p. 94
১৪৫ মওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১

খ. চুরির শাস্তি সম্পদের হিফাজতের জন্য রচিত হয়েছে। কেননা সম্পদ জীবন ধারণ ও সমাজিকতার ভিত্তি স্তম্ভ। আর উভয়ের অবর্তমানে এই পার্থিব জীবন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। সম্পদ ভিন্ন জীবন আয়েশের হয় না। যখনই হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, তখন সমাজে চুরির অপরাধ হ্রাস পায়। ফলে ব্যক্তির সম্পদ সুরক্ষিত হয়। মানুষ সমাজ জীবনে সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করে।[১৪৬]

তৃতীয় আপত্তি

Robert Roberts তার গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন যে, To sum up the muhammedan law of theft is by on means such as to commad our praise; on the contrary it is, as already said, a cruel and unreasonable enactment [১৪৭] অর্থাৎ মোট কথা এই যে, চুরি সম্পর্কিত ইসলামী আইনকে কোন অবস্থাতেই আমরা প্রশংসা করতে পারি না। অপরপক্ষে এই আইনকে নিষ্ঠুর, অসভ্য ও অযৌক্তিক দণ্ডদান পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আপত্তির জবাব

তাফসীরে উসমানীতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, ‘ চোরকে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা চোরাই মালের বদলে নয়, বরং তা তার চুরি কার্যের দণ্ড। যাতে করে সে নিজে এবং অন্যান্য লোক এই দণ্ডের মাধ্যমে সতর্ক হতে পারে। সন্দেহ নেই, যেখানেই এ দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়, সেখানেই দু'চারজনের শাস্তির দন্ড কার্যকর হওয়ার পরই চুরির দুয়ারই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। আজ তথাকথিক সভ্যতার দাবিদারগণ এরকম শস্তিকে বর্বরতম আখ্যায়িত করে থাকে কিন্তু চুরিকার্য তাদের নিকট যদি কোন সভ্য কর্ম না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চিত বলা যায়, তাদের কোন সভ্য দণ্ডবিধি এ অসভ্য কর্মতৎপরতার অবসান ঘাটাতে সক্ষম হবে না। কোন লঘু অমানবিকতার অবলম্বনে যদি বহুসংখ্যক চোরকে সভ্য করে তোলা যায়, তবে সভ্যতার ধ্বজাধারীদেরতো এ ভেবে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল যে, বর্বরতা দ্বারা তাদের সভ্যতার মিশনে সাহায্য লাভ হয়।[১৪৮]

ইসলাম ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির গুরুত্ব বেশি দেয়। তাই ইসলামী সমাজে চুরির মত এই ঘৃণিত গোপনীয় অপরাধটি যাতে বিস্তার না ঘটে, তাই সুতা কাটার মত কঠিন শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তবে হাত কাটার শাস্তি অনেকগুলো কঠিন শর্ত ও সাক্ষ্য- প্রমাণের বেড়াজাল ভেদ করে প্রয়োগ করতে হয়। এই সকল শর্ত, সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে প্রচলিত আইনের মতই বিচারকের বুদ্ধি বিবেচনার উপর চুরির

---

১৪৬ ড. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

১৪৭ Robert Roberts, Ibid, p.94

১৪৮ মাওলানা সাব্বির আহমেদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী* (অনু. মাওলানা আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৬), খ. ১ম, পৃ. ৪৪৮

শাস্তির পরিমাপ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তিত রাষ্টীয় ব্যবস্থায় আমরা অসংখ্য এরূপ উদাহারণ পাই, যেখানে তা'যীরের আওতায় চুরির শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল। একথা যে, সম্পদ হচ্ছে যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাণশক্তি তুল্য। সম্পদ অর্জনের সাথে যেহেতু সমষ্টির চেষ্টা-সাধনা প্ররিশ্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, তাই ইসলাম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিকে অবাধ ও গতিশীল রাখার লক্ষ্যে চুরির মাধ্যমে বিনাশ্রমে সম্পদ অর্জনের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ করার জন্য চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হাত কাটার বিধান বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিধিবদ্ধ করেছে। যা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের চোখে 'cruel, barbarous mode of punishment and unreasonable enactment' বটে। তবে মানবতার সামষ্টিক কল্যাণ ও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থেই হাত কাটার শাস্তি কাঙ্খিত। ফলে এই শাস্তির সুফল সৌদিআরবসহ অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশ ভোগ করছে, যা অমুসলিম দেশগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি না।

উপসংহার

আল-কুর'আন বিশ্ব মানবের ইহকাল ও পরকালের সামগ্রিক কল্যাণের পথ প্রদর্শক একটি সর্বজনীন, শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, বিচারিক এককথায় জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পবিত্র আল কুর'আনে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা।

আমরা জানি, কুর'আন নাযিলের অব্যবহিত পূর্বের সময়ে গোটা আরব দেশে চলছিল 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত' বা তথা অন্ধকার যুগ। সে সময় আরব ভূমিতে রাষ্ট্র কাঠামোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পারিবারিক ও সামাজিক পরিকাঠামো ছিল ঠুনকো, নড়বড়ে, ক্ষয়িষ্ণু ও অপসৃয়মান। সে সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের ছিল না কোন প্রতিষ্ঠিত রীতি। নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে ছিল অবাধ যৌনাচার ও অজাচার। একজন পুরুষ নিয়ন্ত্রণহীন অসংখ্য বিবাহ করতে পারত। তুচ্ছ কারণে নারীদের উপর পুরুষরা অমানবিক নির্যাতন করত-যা প্রায়শ বিবাহ বিচ্ছেদে রূপ নিত। বিচ্ছেদী নারীদের স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেয়া হত না। আবার চূড়ান্তভাবে তাদের তালাক দেয়াও হত না। বরং তাদেরকে ঝুলিয়ে রেখে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে বাধার সৃষ্টি করত। বিধবা নারীদের ছিল না কোন সামাজিক অধিকার। বিধবা নারীদের পুনঃ বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। কৌলিন্য প্রথা, নারীত্ব হরণ, এতিমের সম্পদ লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ছিল সেই সময়ের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিচার ব্যবস্থা ছিল একান্তই পক্ষপাতদুষ্ট। ঠিক এ সময়ে পবিত্র আল-কুর'আনের বাণী গোটা আরব সমাজে এক বৈপ্লবিক সংস্কারের সূচনা করে।

মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামী আইন মানুষের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ ও সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। সভ্য সমাজ গঠন ও উন্নততর মানব সভ্যতার উন্মেষে 'আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মূলত আল-কুর'আনে সামাজিক আইন ইসলামী শরি'য়ত থেকে ভিন্ন কোন আইন নয়। ইসলামী শরি'য়তের মূল উৎস চারটি। যথা আল-কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিন্তু সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মৌলিক উৎস হচ্ছে আল-কুর'আন। আল-কুর'আনের সামাজিক আইনসমূহ মানব জাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং স্বার্থপরতা, ধ্বংস, পতন ও ক্ষতির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে।

আল-কুর'আনে সামাজিক আইন মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা এবং বিভিন্ন দণ্ডবিধি তথা কিসাস ও হুদুদকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ আইনে মানব স্বভাব ও মানব প্রকৃতিকে সর্বক্ষেত্রে

লালন করা হয়েছে। সেই সাথে এই আইন প্রয়োগে মানবতার সর্বক্ষেত্রে সাম্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা সনদ রচনার মাধ্যমে মদিনাতে যে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রের সংবিধান ছিল আল-কুর'আন। বস্তুত রাসূল পাক (স.) মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই রাষ্ট্রের সাথে ধর্ম কিংবা পরিবার ও সমাজের কোন বিরোধ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ছিল একই আদর্শ থেকে উৎসারিত। সেই আদর্শ ছিল ঐশী বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূল (স.) আল-কুর'আনের অনুশাসন দ্বারা নারী জাতির সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কার করে বিভিন্ন নীতি বিগর্হিত সামাজিক অপরাধ যেমন শিশু হত্যা, সীমাহীন বহু বিবাহ প্রথা, জুয়া, সুদ, মদ, যিনা ব্যভিচার ইত্যাদি কুপ্রথাকে সমাজ হতে চিরতরে উৎখাত করা। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অধিকার সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। চুরি-ডাকাতি, নর হত্যা শিশু ও কন্যা সন্তান হত্যা ইত্যাদি দুষ্কৃতিমূলক অপরাধ কিসাস ও হুদুদ এর মত কঠোর আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে সমাজ হতে সমূলে উৎপাটন করেন।

আল-কুর'আনে সামাজিক আইনসমূহের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং গবেষণার সময়কাল সীমিত বিধায় আলোচ্য গবেষণায় মৌলিক পাঁচটি সামাজিক আইনের উপর গবেষণা ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যথা পারিবারিক আইন, ব্যভিচার ও অপবাদ সংক্রান্ত আইন, দাসপ্রথা ও পালক পুত্র গ্রহণ সংক্রান্ত আইন, উত্তরাধিকার আইন, নর হত্যা ও চুরি সংক্রান্ত আইন। এ সকল সামাজিক আইন সম্পর্কিত আয়াতে কারীমাগুলোর অনুপঙ্খ বিশ্লেষণ আলোচ্য গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে সামাজিক জীবনের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। পরিবারেই সর্বপ্রথম ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্মিলন ঘটে এবং এখানেই হয় অবচেতনভাবে মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের হাতেখড়ি। এই পরিবার গঠনের একমাত্র সমাজ স্বীকৃত প্রক্রিয়া হল বিবাহ। ইসলাম মানুষের যৌন প্রবৃত্তিকে শুধু স্বীকারই করে না বরং এর লালন ও বিকাশের জন্য ইসলাম সব ধরনের ব্যবস্থা করেছে। কারণ যৌন প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এই প্রবৃত্তির মধ্যে মানুষের মন- মানসিকতা ও স্নায়ুমণ্ডলির পরম শান্তি ও সুস্থতার নিরাপত্তা রয়েছে। তাই আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে পরিবার ও বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও এর চলমানতা ও গতিশীলতার মূলসূত্র সঞ্চিত রয়েছে সূরা আন- নিসার ১ম আয়াত ও সূরা আল-হুজরাতের ১৩ নং আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে। আয়াত দুটি পাশাপাশি একত্রে অধ্যয়ন করলে সমাজের উৎপত্তির মূল তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একক পরিবারের উপর ভিত্তি করে এই সমাজের ক্রমবিকাশের মূল সূত্র অর্ন্তনিহিত (implied) রয়েছে উপরে বর্ণিত আয়াত দুটির অন্তর্ভুক্ত দুটি

শব্দগুচ্ছ যথাক্রমে ‘تسائلون به’ ও ‘لِتَعَارَفُوا’ এর মধ্যে। সূরা আন-নিসায় বর্ণিত ‘تسائلون به’ শব্দগুচ্ছে (phrase) যে বিষয়টি পরিস্ফুট (contemplated) হয়েছে তা এই যে, মানুষ তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য একে অপরের নিকট সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে, পরস্পরে বিভিন্ন চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। একে অপরের নিকট চাওয়া ও পাওয়ার ভিত্তি হল আত্মীয়তার বন্ধন। মূলত পারিবারিক বন্ধন থেকেই আত্মীয়তার বন্ধনের সৃষ্টি হয়, আত্মীয়তার বন্ধন হতে সৃষ্টি হয় সামাজিক বন্ধন। এরূপ বন্ধন সমূহের সূত্রপাত হয় একে অপরকে জানা-শোনার ও পারস্পরিক পরিচিতি লাভের মাধ্যমে।

সূরা আল-হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত ‘لِتَعَارَفُوا’ শব্দটি تَعَارَف শব্দ হতে উদ্ভূত। تَعَارَف (তা'য়ারুফ) শব্দটি تخالف (তাখালুফ) শব্দের বিপরীত। তাখালুফ শব্দের অর্থ হলো বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন , ফলে تَعَارَف (তা'য়ারুফ) অর্থ ঐক্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার গুণটি মানুষের জন্মগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য (Inherent Trait)। এই স্বভাবজাত গুণটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমাজ গঠনের বীজ। সমাজ গঠনের এই বীজ হতে বর্তমান সুবিশাল বিশ্ব সমাজের আত্মপ্রকাশ। নিঃসন্দেহে আয়াত দুটির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে সমাজ সম্পর্কে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতামতের সাথে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া মহা গ্রন্থ আল-কুর'আনের বক্তব্যের সাযুজ্য খুজেঁ পাওয়া যায়।

সংসার ধর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক তরুণী নারী, নিজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের আদর সোহাগের চির অভ্যস্ত পরিবেশকে বিসর্জন দিয়ে, সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশকে সানন্দে অবলম্বন করতে যাচ্ছে-কিসের আশায় কোন্ শক্তিমানের জামানতের (অভয়ের) উপর নির্ভর করে ? সে জামানত (security) হচ্ছে আল-কুর'আনের প্রেম-প্রীতি ও আদর-অনুরাগ পাওয়ার আশ্বাস। তার রক্ষকবচ (safegurd) হচ্ছে, আল্লাহর কালিমা-তাঁর বিধান বা ফরমান। ‘তারা স্ত্রীরা তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে’ আয়াতাংশে বর্ণিত এ অঙ্গীকার হল স্ত্রীরা স্বামীদের সাহচর্য ও শয্যায় স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের জন্য পুরুষদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা মহানবি (স.) এই বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন।

আল-কুর'আন স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পকর্কে একে অপরের জন্য পরিচ্ছদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠপূর্ণ ও নৈকট্যপূর্ণ যেন তাদের দুই দেহ যেন এক দেহে লীন হয়ে একটি অভিন্ন বস্ত্রে আবৃত। কোন জগৎবিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক কিংবা সমাজ চিন্তক স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাতে আল-কুর'আনের মত এত সুন্দর ও সুগভীর তাৎপর্যমণ্ডিত উপমা ব্যবহার করতে আজ পর্যন্ত সক্ষম হয় নাই। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের

বিকাশ ঘটে। এখানে স্বামী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, পিতা হিসেবে, মাতা হিসেবে যে রকম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয়, বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট প্রশিক্ষণ।
প্রাকৃতিক ও বাস্তব ভিত্তিক কারণের জন্য একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধানের যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে আল-কুর'আন নীতিগতভাবে বহু বিবাহ অনুমোদন দিয়ে এর সীমারেখা চারজনে সুস্থির করেছে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধানে অপারগ হলে একজন পুরুষকে একজন নারীকেই বিবাহ করতে হবে। এভাবে আল-কুর'আন বহু বিবাহ এবং একক বিবাহের রীতি-নীতির মধ্যে বাস্তব ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ বিধান মানব জাতিকে উপহার দিয়েছে।

সব সমাজেই পিতা- কন্যা, মাতা-পুত্র ও সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ। সে কারণে এ ধরণের সম্পর্কে বলা হয় ইনছেস্ট (Incest) বা অজাচার। অজাচার তাই টাবু (taboo) বা নিষিদ্ধ প্রথা। পবিত্র রক্তধারা সৃষ্টির লক্ষে মানব প্রজনন কর্ম পরিচালিত করার জন্য আল-কুর'আন রক্ত সম্পর্ক, শশুর সম্পর্ক ও দুগ্ধ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এদেরকে শরি'য়তের পরিভাষায় 'মুহাররমাত' বলা হয়। আল-কুর'আন সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ উত্তরাধিকার আইন বিশ্ব মানবতাকে উপহার দিয়েছে। আল-কুর'আন প্রবর্তিত উত্তরাধিকার আইন তৎকালীন সমকালীন যুগ তো বটেই বর্তমান কালের আধুনিক কোন আইন এর সমকক্ষতায় দাড়াঁতে পারবে না। কারণ এই আইনে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ অকাট্যভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নারী ও পুরুষের উত্তরাধিকার স্বত্ত্বের প্রাপ্যতা পৃথক পৃথকভাবে ঘোষিত হয়েছে। উভয়ের হক যে স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ তা অকাট্য ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই নারীদের আন্দোলন করে কিংবা মিটিং-মিছিল করে জনমত গঠন করে উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব আইন করার প্রয়োজন নেই। স্যার উইলিয়াম জোনস্ বলেন, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যে কোন প্রশ্ন উঠুক না কেন, এক নজরে এবং শুদ্ধভাবে ইসলামী আইন তার জবাব দিয়ে দিবে।

বস্তুত আল-কুর'আন অবিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি একশতটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহ বিবাহিতদের ব্যভিচারের শাস্তি 'রজম' তথা পাথর বর্ষণে হত্যার বিধান নির্ধারণ করেছে। এর পিছনে সুদূরপ্রসারী দর্শন হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার কলুষতা হতে মুক্ত ও পুতঃ-পবিত্র রাখা। তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুরসহ প্রাচীন প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থ ও লিখিত আইনে (হামুরাবি আইন, রোমান আইন, গ্রিক আইন) প্রসঙ্গ ব্যভিচারের শাস্তি হয় 'রজম' অথবা মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ইহুদী এবং খ্রিষ্টানগণ তাদের আসমানী কিতাবের বিধান হতে বিচ্যুত হয়ে 'রজমের' পরিবর্তে মনগড়া শাস্তির বিধান তৈরি করে নেয়। আধুনিককালের ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ বিবাহিত নারী-

পুরুষের ব্যভিচার বুঝাতে ‘Fornication’ এবং অবিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচার বুঝাতে ‘Adultery’ পরিভাষা সৃষ্টি করে শুধুমাত্র Adulter এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে, কিন্তু ‘Fornication’ এর ব্যপারে তাদের কোন বক্তব্য নেই। এটা সভ্যতার বিপর্যয় এবং চরম নৈরাজ্যকর এক ব্যবস্থা- যেখানে অবিবাহিত নারী-পুরুষদের ব্যভিচারের জন্য অবাধ লাইসেন্স খুলে দেয়। অপরদিকে তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার দাবীদাররা যিনা-ব্যভিচারের সংজ্ঞাকেই পাল্টে দিয়েছে। তাদের মতে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধ যৌনাচার দোষের কিছু নয়। কেবলমাত্র বলপূর্বক যৌনাচারকে ‘rape’ বা ধর্ষণ নামে সংজ্ঞায়িত করে এ অপরাধের সীমিত দণ্ড নির্ধারণ করেছে। ফলে পাশ্চাত্য জগতের পরিবারগুলো আজ ক্ষত-বিক্ষত, সেখানকার সমাজের সর্বত্র উলঙ্গপনা ও ব্যভিচারে সয়লাব। যার পরিণতিতে পাশ্চাত্য সমাজে নারী আজ লালসার পণ্য, সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে হতাশা, লক্ষ্যহীন নীতিভ্রষ্ট জীবন এবং আত্মহত্যার ছড়াছড়ি।

আল-কুর’আন কখনো প্রত্যাশা করে না যে, গোপনীয় কলঙ্কজনক অপরাধের কথা প্রকাশিত হয়ে সমাজ জীবন কলুষিত হোক। কারণ এরূপ অপরাধের ছিটেফুটাও যদি কেউ প্রকাশ করে তাহলে তা নারী-পুরুষ মুখে মুখে, পেটে-পেটে তা ফেরি হয়। এ নিয়ে নানারকম মুখরোচক গল্প, কানা-খুষা সমাজের সর্বত্র চলতে থাকে। যেই এটা শুনে সে অপরের কাছে এই লাইন বাড়িয়ে নানা রংচং মাখিয়ে বলতে থাকে। ফলে দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য যে গোপনীয়তার উপর নির্ভর করে সেই গোপনীয়তা যা স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র আমানত তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মনে হয় এটা যেন একটি দুষ্ট চক্র-যা থামবার নয়। ফলে সমাজ জীবন অশ্লীলতা-বেহায়াপনার চর্চার অঘোষিত লাইসেন্স পেয়ে যায়। ফলে ইসলাম মুখ খোলার আগেই বুদ্ধিমত্তার সাথে ভেবে-চিন্তে পা বাড়ানোর কৌশল প্রত্যেকেই শিক্ষা দেয়। কারণ পাছে চারজন স্বাক্ষীর অভাবে রয়েছে ত্রিবিধ পার্থিব শাস্তির আশঙ্কা ।

ইসলাম ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির গুরুত্ব বেশি দেয়। তাই ইসলামী সমাজে চুরির মত এই ঘৃণিত গোপনীয় অপরাধটি যাতে বিস্তার না ঘটে, তাই সুতা কাটার মত কঠিন শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তবে হাত কাটার শাস্তি অনেকগুলো কঠিন শর্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের বেড়াজাল ভেদ করে প্রয়োগ করতে হয়। এই সকল শর্ত, সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে প্রচলিত আইনের মতই বিচারকের বুদ্ধি বিবেচনার উপর চুরির শাস্তির পরিমাপ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমরা অসংখ্য এরূপ উদাহারণ পাই, যেখানে তা'যীরের আওতায় চুরির শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল। একথা যে, সম্পদ হচ্ছে যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাণশক্তি তুল্য। সম্পদ অর্জনের সাথে যেহেতু সমষ্টির চেষ্টা-সাধনা প্ররিশ্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, তাই ইসলাম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিকে অবাধ ও গতিশীল রাখার লক্ষ্যে চুরির মাধ্যমে বিনাশ্রমে সম্পদ অর্জনের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ করার

জন্য চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হাত কাটার বিধান বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিধিবদ্ধ করেছে। যা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের চোখে 'cruel, barbarous mode of punishment and unreasonable enactment' বটে। তবে মানবতার সামষ্টিক কল্যাণ ও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থেই হাত কাটার শাস্তি কাঙ্খিত। ফলে এই শাস্তির সুফল সৌদিআরবসহ অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশ ভোগ করছে, যা অমুসলিম দেশগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি না।

আরব সমাজে পালক পুত্র ব্যবস্থা ছিল আবহমানকাল থেকে প্রচলিত একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রথা। এমনকি পালক পুত্র তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পরও ঐ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা পালক পিতার জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ বিবেচনা করা হত। সেই সময়ে এই সামাজিক প্রথা কারো দ্বারা লংঘন হওয়ার ঘটনা বিরল। আল-কুরআন সর্বপ্রথম বর্বর যুগের এই কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে সুরা আল আহযাবের ৪ ও ৫ নং আয়াত দ্বারা খণ্ডন করেছে। কিন্তু এত দীর্ঘদিন ধরে যে কৃত্রিম পদ্ধতি আরব সমাজে প্রচলিত ছিল তা শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা বা অন্য কারো মাধ্যমে এ পদ্ধতি উৎখাত করা সম্ভব ছিল না । আল্লাহ তা'য়ালা শুধু কথা ও নির্দেশ দ্বারাই এ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন সম্ভব বলে যথেষ্ট মনে করেননি। তাই এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বয়ং রাসূলে করিমকে (স.) আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ প্রদান করেন।[১৪৯] রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তারই পালক পুত্র যায়েদ ইব্ন হারেস (রা.) এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে আরবের এতকালের প্রচলিত প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই কারণে পরবর্তীকালে এই আয়াতের প্রভাবে মুসলিমগণ এই কৃত্রিম প্রথাকে আর কোনদিন চালু হতে দেয়নি, যদিও প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় দত্তক প্রথা রহিত করা নিয়ে বেশ কিছু হৈচৈ হয়েছে এবং ইসলামের শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (স.) কে নানা অপবাদ দিয়ে দোষারোপ করতে কুণ্ঠিত হয়নি এবং একইভাবে আজো তারা দোষারোপ করে চলেছেন।

দত্তক প্রথাসহ আল-কুর'আনের সামাজিক আইন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সম্পকে বিভিন্ন অমুসলিম লেখকদের মনগড়া উক্তি ও এর জবাব আলোচ্য গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহারণত Robert Roberts তার 'The Social Laws Of The Quran' গ্রন্থে আকারে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে রবাট রবার্টস আল-কুর'আনের সামাজিক আইন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পান। উক্ত গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে আল-কুর'আন সম্পর্কে রবার্ট রবার্টসের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট বলে মনে হয়। তিনি তার গ্রন্থে আল-কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক আইনের ব্যাখ্যায় অনেক স্থানেই মনগড়া ধারণার (Surmise & Conjecture) আশ্রয় নিয়েছেন। কোন কোন স্থানে তার বক্তব্য একপেশে, খাপছাড়া, বিদ্বেষমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অনুমিত হয়। রবার্ট রবার্টস-এর

১৪৯ আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

কোন কোন বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবে ও বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে অসত্য। বস্তুত হযরত যায়েদ বিন হারেস (রা.) কে রাসূল (স.) পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে যায়েদ বিন হারেসার সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁরই আপন ফুফাত বোন যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে বিবাহ দেন। দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক রীতিতে যায়েদ বিন হারেস (রা.) এবং যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) এর মধ্যে সম্পর্কের অবনতির চূড়ান্ত পর্যায়ে যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে তালাক প্রদান করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স.) জাহেলী যুগের জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা সামাজিক প্রথা 'পালক পুত্র আপন পুত্রের মর্যাদা পায় এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারী অর্জন করে'-এই কু-প্রথা রহতি করে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স.) পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেস (রা.) এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে বিবাহ করে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করে নেন। কিন্তু রবার্ট রবার্টস বিদ্বেষমূলকভাবে ঐতিহাসিক সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে তার গ্রন্থে উক্তি করেন যে 'One occasion the prophet had seen (Joynab) unveiled, and whose charms had made a great impression upon him. On hearing this, Zaid at once decided to divorce her in favour of his benefactor'. অর্থাৎ কোন এক ঘটনা উপলক্ষে নবী (স.) যয়নাব বিন জাহাশকে ঘোমটাবিহীন অনাবৃত চেহারায় দেখে ফেলেন, তার রূপ-সৌন্দর্য নবী (স.) এর উপর ভীষণ ছাপ ফেলে। এ কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ যায়েদ (রা.) স্বীয় স্ত্রী যয়নাব বিন জাহাশ (রা.) কে মনিবের (নবী) কৃপা লাভের আশায় তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রবার্ট রবার্টস এই উক্তি ঐতিহাসিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্যের অপলাপ।

আলোচ্য গবেষণার জন্য নির্বাচিত আল-কুর'আনের সামাজিক আইনগুলোর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ অত্যন্ত জটিল কাজ। কারণ আল-কুর'আন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী। তাই কোন সৃষ্টির পক্ষে আল-কুর'আনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য গবেষণায় আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের নির্ধারিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, যুগোপযোগিতা এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভ প্রমাণ করেছে এই পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে, যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ আইন ও আইন বিজ্ঞান রয়েছে তার মধ্যে আল-কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক আইনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যুগোপযুগী। কারণ আল-কুর'আন যেমন শাশ্বত-তেমনি আল-কুর'আন হতে উৎসারিত বিধি-বিধান, আইন-কানুনও শাশ্বত এবং সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকতা, সুসামঞ্জস্যতা, মানব কল্যাণবর্তিতার ক্ষেত্রে এই বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য সকল আইনের উপর আল-কুর'আনে সামাজিক আইনের শক্তিমত্তা অবিসংবাদিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

উন্মুক্ত মন, নির্মহ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, যুক্তি নিরীক্ষণ ও গভীর দার্শনিক অনুধ্যান নিয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করলে আল-কুর'আনের সামাজিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব। আলোচ্য গবেষণার সার-নির্যাস পাঠ করে মুসলিম যুব সমাজ তথা মুসলিম মিল্লাত আল-কুর'আনে সামাজিক আইন যদি অনুসরণ করতে পারে তাহলে আশা করা যায় যে, তারা করে বস্তুবাদী পাশ্চাত্য ভোগ-বিলাস সর্বস্ব নাস্তিকতাবাদ ও পুঁজিবাদের বিপরীতে 'আদল ও ইনসাফভিত্তিক শোষণমুক্ত ধনী-গরীব পাহাড়সম বৈষম্যের অবলোপন ও সৃষ্টিকুলের প্রতি প্রেম ভালবাসায় সিক্ত অতি সমুন্নত ইহ-জাগতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে পরলৌকিক মুক্তি পাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুর’আন

২. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বোখারী (র.), *সহীহ বোখারী*, কলকাতা : দার আল-ইশায়াদ ইসলামীয়া, তা.বি

৩. ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহীহ আল-মুসলিম*, ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি

৪. আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.), *আবু দাউদ*, ঢাকা : মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ, তা.বি

৫. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), *সুনানে তিরমিযী*, ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামি কুতুব, তা.বি

৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৯০

৭. *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : কুয়েত সরকারের ওয়ক্‌ফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৬

৮. যায়নুদ্দিন ইব্‌ন নুজায়ম, *আল- বাহরুর রাইক*, করাচি : রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭

৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাযাহ আল-কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাযাহ* ঢাকা : মাকতাবাতি আল-ফাতহি বাংলাদেশ, তা.বি

১০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), *মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল*, কায়রো : আল- মাকতাবা আল-ইসলামিয়া, ১৯৩০হি.

১১. বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২

১২. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-খতিব আল-তিবরিযী, *মিশকাত আল-মাসাবীহ্*, ইউপিঃ মাকতাবাতে থানবী, তা.বি.

১৩. আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসিরে মাজহারী*, ইউপি : জাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি.

১৪. ইমাম মালেক (র.), *মুয়াত্তা*, অনু . মুহাম্মাদ রেজাউল করীম ইসলামবাদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ২০০৭

১৫. ইমাম আবু হানীফা (র.), *মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)*, অনু. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬

১৬. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীরে ফী যিলালিল কুর’আন*, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ঢাকা : আল-কুর'আন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮

১৭. ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর, *তাফসীর ইবনে কাসীর*, অনু. ড. মুহাম্মদ মজীবুর রহমান, ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২০১১

১৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা’আরেফুল কুর’আন*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

১৯. সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুর’আন*, অনু. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০

২০. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়েউল বায়ান তাফসীরে আয়াতিল আহকামি মিনাল কুর’আনে*, মিশর : দারুস সাবুনী, ২০০৭

২১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (র.), *কানযুল ঈমান ওয়া তাফ্‌সীর খাযাইনুল ইরফান*, অনু. আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, চট্টগ্রাম : গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, ২০১০

২২. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *ছাফওয়াতুত্ তাফাসীর*, মিশর : দারুল সাবুনি, ১৯৮৯

২৩. আল্লামা আবুল ফজল শিহাব উদ্দিন আস্ সাইয়্যেদ মাহমুদ আল-আলুসি, *তাফসীরে রুহুল মা’আনী*, মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৫

২৪. হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালি (র.), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, অনু. মাওলানা নূরুর রহমান, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ২০০২
২৫. আহমদ মোস্তফা আল-মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*, বৈরুত : দারুল ইহইয়াউ আত-তুরাস আল-আরাবি, তা.বি
২৬. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি, *তাফসিরে জালালাইন*, ইউপি : মাকতাবাতি ইসলামী কুতুব, তা.বি
২৭. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (র.), *তাফসীরুল কুরআনুল আজিমি*, মাকতাবাতুল ইলমে, মিশর : ২০০৪
২৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে তাবারী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪
২৯. আল্লামা ইউছুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনু. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৯
৩০. মাওলানা সাব্বির আহমেদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী*, অনু. মাওলানা আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৬
৩১. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য সংকলিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
৩২. মুহাম্মদ রশিদ রেজা, *তাফসীরুল মানার*, মিশর : দারুল মানার, ১৯৪৭
৩৩. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়েউল বায়ান তাফসীরে আয়াতিল আহকামি মিনাল কুর'আনে*, মিশর : দারুস সাবুনী, ২০০৭
৩৪. ইব্রাহিম মুস্তফা ও অন্যান্য, *মু'জামুল ওয়াসিত*, দিল্লি : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, তা.বি
৩৫. হাসান আইয়ুব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, অনু. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স
৩৬. মুহাম্মদ আসাদ, *দ্যা ম্যাসেজ অফ দ্যা কুর'আন*, জিব্রালটার: দার আল-আন্দালুস, ১৯৮০
৩৭. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, *বয়ানুল কুর'আন*, অনু. মাওলানা নূরুর রহমান, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৮৫
৩৮. সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্হুস সুন্নাহ*, অনু. আকরাম ফারুক ও অন্যান্য, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৫
৩৯. কামাল উদ্দিন ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৩৫৬ হি.
৪০. ইউনুছ আল-বাহুতী, *কাশশফুল কুনা আন মতনি আল- ইকনা*, বৈরূত : আলম আল-কুতুব, ১৪০৩ হি
৪১. ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী, *বদা'ই সানাই* , বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৭

৪২. ইবরাহীম আহমাদ আল-অকফী, *তিলকা হুদূদুল্লাহ*, পাকিস্তান: ইসলামাবাদ, দারুল ইলম, ১৯৮৩
৪৩. আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* , বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ১৯২৪
৪৪. আল-মুয়াক্ব ছালেহ আল আবী, আল-তাজ আল-ইকলীল, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি
৪৫. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কাশেমী, *মাহাসিনুল তা'বীল*, বৈরুত : দার ইহইয়াউল কুতুবুল আরাবিয়া, ১৯০৭
৪৬. ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, *নাইলুর আওতার*, বৈরূতঃ দার আল-ফিকর, ১৪০২ হি.
৪৭. আকরাম নিশাত ইব্রাহিম, *আল-হুদুদ আল কানুয়্যিাহ*, ইরাক : দারুল মাতবায়তু আল-শায়াব, ১৯৬৫
৪৮. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪
৫০. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অনান্য, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮
৫১. আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, অনু. মাওলানা রেজাউল করিম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩
৫২. আবু বকর আল- জাস্সাস, *আহকামুল কুর'আন*, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮
৫৩. ড. আনোয়ারুল উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
৫৪. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *নারী*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮
৫৫. কাজী জাহান মিয়া, *কুর'আন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২*, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭
৫৬.
৫৭. আল-হিদায়াহ, ইউপি : আশরাফি বুক ডিপো, তা.বি.
৫৮. মাহমুদ আল-নাসাফী, *আল কানজুল দাকাইক*, দিল্লী : মুজতাবাই প্রেস, তা.বি
৫৯. আল-শায়খ নিজাম বুরহানপুরী, *ফতুয়া আলমগীরী*, দেওবন্দ, তা.বি
৬০. ড. মোস্তফা কামাল, *মৌলিক সমস্যার সমাধানে ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৬
৬১. ড. তানজীল-উর-রহমান, *'অ্যা কোড অফ মুসলিম পারসোনাল ল'*, করাচি : হামদর্দ একাডেমী, ১৯৭৮
৬২. আবদুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫
৬৩. আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুর'আন*, বৈরুত : দারুল ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া, তা.বি
৬৪. আবুল কাশেম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ রাগেব ইস্ফাহানি, *মুফরাদাত*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি
৬৫. বদরুদ্দিন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আল-আইনি, *উমদাতুল ক্বারী*, বৈরুতঃ দার ইহইয়াউ আত-তুরাস-আর-আরাবী, ২০০৩
৬৬. ড. আব্দুল করিম আল-জাইদান, *আল-মুফাস্সাল ফি আহকামিল মার'আতি ও বায়তিল মুসলিম*, বৈরুত : রিসালাহ পাবলিশার্স, ২০০০
৬৭. বোরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল মুরগিনানী, *আল-হিদায়া*, ইউপিঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৪০১
৬৮. আবদুর রহমান আল-যাজারি, *কিতাব আল-ফিকহ্ আলাল-মাজাহিব আল-আরবায়া*, বৈরুতঃ দার ইহইয়াউ আল-তুরাস আল-ইসলামী, ১৯৭৩
৬৯. ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার *'আলাল দুররুল মুখতার'*, পাকিস্তান : করাচি এডুকেশনাল প্রেস, তা.বি
৭০. আবু-বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুর'আন*, মিশর : ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি
৭১. আবু বকর আহমাদ আল-জাস্সাস (র.), *আহকামুল কুর'আন*, বৈরূত : দার আল কিতাব আর আরাবী, ১৩৫৫ হি.
৭২. ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, *ফতহুল কাদির*, মিশর : দারুল হাদীস, ২০০৩
৭৩. আল্লামা শিবলি নু' মানী (র.) রচিত, এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্শী অনূদিত, *সীরাতুন নবী (স.)*, ঢাকা : দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৮

৭৪. মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, মীযান বিন হারুন অনূদিত, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, ঢাকাঃ দারুল হুদা কুতুবখানা, ২০১২
৭৫. শাইখ আবু আলী আল-ফজল বিন আল-হাসান আল-তিবরিসি, *মাজমাউল বয়ান*, বৈরুতঃ মানসুরাতে দারি মাখতাবাতুল হায়াত, ১৯৮০
৭৬. মওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০
৭৭. আফীফ আবব্দুল ফাত্তাহ্ তাব্‌বারা, মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত, *আল-খাতায়া ফি নজরিল ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩
৭৮. মুহাম্মদ বিন কুদামাহ্ আল-মুগনি, আল-রিয়াদ : মাকতাব আল-রিয়াদ, ১৪০১ হি
৭৯. শায়েখ আহমাদ মোল্লাজিউন, *তাফসিরাতি আহমাদীয়া*, ইউপি : আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি.
৮০. ড. হামীদুল্লাহ, *খুতবাতে বাহাওয়ালপুর*, পাকিস্তান : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৭ম সংস্করণ, ২০০১
৮১. শামছুদ্দিন আল-রামেলী, নেহায়েত আল-মহতাজ আলা-শারহিল মিনহাজ, মিশর : মুস্তফা আল-বাবী আল-হলবী লাইব্রেরি প্রেস, ১৩৮৭ হি.
৮২. ইউনুছ আল-বাহুতী, *কাশশফুল কুনা আন মতনি আল-ইকনা*, বৈরূত : আলম আল-কুতুব, ১৪০৩ হি.
৮৩. আল-মুয়াক্ব ছালেহ আল আবী, *আল-তাজ আল-ইকলীল*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি
৮৪. ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি ও আইন ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলাামিক সেন্টার, ২০০৯
৮৫. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা কর্তৃক অনুদিত, *পবিত্র বাইবেল*, পুরাতন ও নূতন, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১
৮৬. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান, 'ইসলামের দৃষ্টিতে দাসপ্রথা' *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১
৮৭. ইমাম আহমাদ, *সুনানে আহমাদ*, তুরস্ক : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, ১৯৮১
৮৮. ইবনে হিশাম, *সিরাতে ইবনে হিশাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪
৮৯. ড.ওসমান গনী, *মহানবি (সা)*, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬
৯০. আব্দুল মওদুদ, *হযরত ওমর (রা)*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৮
৯১. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *যুগ জিজ্ঞাসার জবাব*, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০২
৯২. আল্লামা আহমাদুল বান্না, *বুলুগুল আমানী*, দিল্লি : মাকতাবাতি ইশায়াতিল ইসলাম, তা.বি.
৯৩. সাইদ বিন আবী আল-রাজী, *মুখতার আল-ছিহাহ*, মিশর : বুলাকের আমেরিকা প্রেস, ১৯৮৩
৯৪. গাজী শামছুর রহমান, *দণ্ডবিধি*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৭
৯৫. আশ্-শাইখ আব্দুর রহমান তাজ, *তারীখুল তাশ্‌রীইল ইসলামী*, মিশর : মুস্তফা আল-বারী আল-হালাবী, ১৯৩৬
৯৬. ড. মোঃ শাহজাহান তপন, *থিসিস ও এ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*, ঢাকাঃ প্রতিভা প্রকাশনী, ১৯৯৩
৯৭. *গাজী শামছুর রহমান*, মুসলিম আইনের ভাষ্য, *ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ১৯৯৬*
৯৮. আলী আস- সাবুনী, *আল মাওয়ারিস ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যা* মিশর : দারুস সাবুনী, ১৯০৭
৯৯. ড. মাওলানা আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক ও অন্যান্য, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮
১০০. Fida Husain Malik, *Wives of Muhammad,* Lahore: Shaikh Ghulam Ali & Sons, 1952.

১০১. Jamil Farooqi, *Islamic Concept of sociology*, Journal of Objective Studies, New Delhi: Institute of Objecetive Studies

১০২. Shamsher Ali, Et all, *The Scientific Indications in the Holy Quran*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh

১০৩. Syed Ameer Ali, *The spirit of Islam,* London : Christophers, 1955

১০৪. A. P. Cowie, *Oxford Advanced Larners Dictonary of Current English*, Newyork : Muthim press. 1993

১০৫. Robert Roberts, *The social Laws of the Quran*, New Delhi : kitab Bhavan, 1977

১০৬. Anwnr Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence*, Lahore: Rashidia Laibry, 1968

১০৭. AUniversisaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, Delhi : Oxford ty Press 1974

১০৮. https//en.wikipedia. org-wiki/Battle of Uhud ,visited on 23/11/18

১০৯. Syed Amir Ali, *Commentaris on Mohammadan Law*, Allahabad: Hind Publishing House, 2012

১১০. Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran* , Pakistan : Sh. Muhammad Asraf, 1969